ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক

উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বার্ষিকের পাঠ্যপুথি

আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদের দ্বারা
প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকের আধারে

প্রথম প্রকাশ
মে' ২০১০, বৈশাখ ১৪১৭
পুনর মুদ্রণ ঃ ২০১৬

© আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১০

মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ ১৫০ জি এছ এম

পাঠ মুদ্রণ ঃ ৭০ জি এছ এম

আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা
সংসদের সচিবের দ্বারা প্রকাশিত
বামুনীমৈদাম, গৌহাটি - ৭৮১০২১

ডিটিপি, সেটিং, ছবি ঃ শিলচর সানগ্রাফিক্স
প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮০০১
কাছাড়, আসাম

মুদ্রক ঃ

আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ জন্যে
অরুনোদই প্রকাশন, পাণবজার, গৌহাটি-৭৮১ ০০১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

* প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার যে কোন অংশের ছাপানো কার্য, অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যম, যান্ত্রিক মাধ্যম, ফটো প্রতিলিপি, রেকর্ডিং কিংবা অন্য কোন উপায়ে পুনঃপদ্ধতির সাহায্যে এর সংগ্রহ করা বা সংবর্ধন করা নিষিদ্ধ।

* এই পুস্তকের বিক্রি এই চুক্তি সাপেক্ষে করা হয়েছে যে এই পুস্তক এর নিজস্ব প্রচ্ছদ, বাইণ্ডিং বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রকার ব্যবসা করতে, ভাড়া দিতে, পুনরায় বিক্রি করতে অথবা ধার দিতে পারবে না।

* পুস্তকটির উচিৎ মূল্য এই পৃষ্ঠায় ছাপাতে হবে।

রাবাররাবারের ষ্টাম্প, ষ্টিকার মারা বা অন্য কোনভাবে অঙ্কিত যে কোন সংশোধিত মূল্যই অশুদ্ধ হবে এবং বিবেচিত হবে না।

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Group for Textbooks in Social Science for the Secondary State.

Hari Vasudevan, Professor; Department of History, Calcutta University' Kolkata

Chief Advisor

Neladri Bhattacharya, Professor, Centre for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Advisor

Harayani Gupta, Professor (Retd), Department of History, Jamia Millia Islamia, New Delhi (Theme 10)

Members

Jairus Banaji, Visiting Professor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 3)

Arup Banerji, Professor, Department of History, Delhi University, Delhi (Theme 9)

Bhaskar Chakravarty, Professor Department of History, Calcuttav University, Kolkata (Theme 7)

Rajat Datta, Professor, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 6)

Najaf Haider, Associate Professor Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 4)

Sunil Kumar, Reader, Department of History, Delhi University, Delhi (Theme 5)

Shereen Ratnagar, Professor (Retd.), Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 2)

Anil Sethi, Professor DESSH, NCERT, New Delhi

Reetu Singh, Lecturer, DESSH, NCERT, New Delhi

Beeba Sobti, Sr. Teacher, Modern School, New Delhi

Chitra Srinivasan, Sr. Teacher, Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi

Lakshmi Subramanian, Professor, Centre for the Study of Social Sciences, Kolkata (Theme 8)

Brij Tankha, Professor, Department of East Asian Studies, Delhi University, Delhi (Theme 1l)

Supriya Verrma, Reader, Department of History, University of Hyderabad, Hyderabad (Theme l)

Member-Coordinator

Pratyusa Kumar Mandal, Reader, DESSH, NCERT, New Delhi.

PICTURE CREDITS

William A. Turrnbaugh, Robert Jurmain, Lynn Kilgore, Harry Nelson, Understanding Physical Anthropology and Archaeologg, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, 2002 (for visuals on pp. 1, 9, 11, 19 and 28)

J. Boardman, J.Griffin, O. Murray, Oxford History of the classical world, Oxford University Press, 1991 (for visuals on pp. 61, 63, 66 and 69)

Barbara Brend, Islamic Art, British Museum Press, 1991 (for visuals on pp. 80 and 96)

Bernard Lewis, Islam, Thames and Hudson, 1992 (for visuals on pp. 79, 91,92 and 97)

M. Hattstein and P. Delius (eds) Islam: Art and Architecture, Konemann, 2000 (for visuals on pp. 90, 95, 100, 101 , 121)

P. Gay and the Editors of Time-Life Books, Age of Enlightenment, Amsterdam, 1985 (for visuals on pp. 186 and 187)

P. B. Ebrey, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge University Press, 1996 (for visual on P' 244)

Jonathan D. Spence, The Search Jor Modern China', Century Hutchinson, 1990 (for visuals on pp. 247, 250 and 252)

J.Colton and the Editors of Time-Life Books, Twentieth Century' Amsterdam' 1985 (for visuals on pp. 186 and 187)

Library of Congress Prints and Photographs Division Washington D.C. (for visuals on pp. 224, 139)

National Geographic, December 1996, February 1997 (for visuals on pp. 108, 110, 113, 116, 121)

বাংলা অভিযোজনা (অনুবাদ) সমিতি

অনুবাদক ঃ

১। শ্রী কমলাক্ষ ভট্টাচার্য
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, নরসিং উচ্চতর বিদ্যালয়, শিলচর, কাছাড়

২। শ্রীমতী মন্দিরা দত্ত চৌধুরী
অধ্যাপিকা, মহিলা কলেজ, শিলচর, কাছাড়

৩। শ্রীমতী অসীমা রায়
অধ্যাপিকা, রাধামাধব কলেজ, শিলচর, কাছাড়

৪। শ্রীমতী বনানী নাথ ভৌমিক
অধ্যাপিকা, মহিলা কলেজ, হাইলাকান্দি

৫। ড০ অমলেন্দু নাগ
অধ্যাপক, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি

সম্পাদক ঃ

শ্রী নিরঞ্জন দত্ত
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, কাছাড়
আমন্ত্রিত অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, কাছাড়

সমন্বয়ক ঃ

শ্রী সমীর কুমার দাস
অধ্যক্ষ, নরসিং উচ্চতর বিদ্যালয়, শিলচর, কাছাড়

মুখ্য সমন্বয়ক ঃ

শ্রী জগদীশ চক্রবর্তী
অবসরপ্রাপ্ত বিষয় শিক্ষক, অধরচাঁন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলচর
সমন্বয়ক (শিক্ষা) রামানুজ গুপ্ত জুনিয়র কলেজ, শিলচর, কাছাড়

ভূমিকা

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিশ্বায়নের যুগ এবং এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটি অন্যটির সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। শুধু ব্যবসা বাণিজ্যতেই নয়, বিজ্ঞান, গবেষণা এবং সভ্যতার মূল্যবোধের প্রগতিতে সমগ্র বিশ্ব একটি গোলকীয় গ্রামে পরিণত হয়েছে এবং সমগ্র মানব সমাজের ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গাঁথা রয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিশ্বায়নের যুগের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য হচ্ছে, জ্ঞানের সীমারেখায় থেকে যাওয়া শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে যতটুকু পারা যায় দ্রুতভাবে অবতীর্ণ হওয়া এবং এর পরেও জ্ঞানের সীমারেখায় এই গতি অব্যাহত রাখা। নিত্যনতুন অধ্যয়নের ক্ষেত্র খোলার জন্য শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যক্রমের সমীক্ষা করার জন্য আমাদের দেশে এক বৃহৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগের লৈখিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জ্ঞানের সীমান্তকে পর্যালোচনা করা হয়েছে যাতে নতুন পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচি প্রবর্ত্তন করতে পারা যায়, যা ছাত্র সমাজকে উচ্চ মানদণ্ডে যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি অধিষ্ঠিত করবে এবং আগামী দশকগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে দ্রুতভাবে চলতে সহায়ক হবে।

অর্থনীতির বিশ্বায়ন, তথ্য প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর উৎপাদন প্রক্রিয়াতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ ২০০৫ বর্ষে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামো (National Curriculum Framework, 2005 বা NCF 2005) প্রস্তুত করে প্রকাশ করেছেন। এই কাঠামোটি উচিত উন্নয়নের বিষয় এবং অন্যান্য সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে রাজ্যসমূহের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষকের অভিযোজিত আদান প্রদান কৌশলের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধি করতে একটি আধার এগিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করা ছাড়াও নতুন পাঠ্যক্রম অনুস রণ করে পাঠ্যপুস্তকের লেখা মুদ্রণ এবং অন্যান্য অমুদ্রণ শিক্ষণ - শিখন সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন। আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এই সুবিধা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা এগিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে যুগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে শিক্ষা সংসদ সময়ে সময়ে এর পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যসূচির সংশোধন করে আসছে। সর্বভারতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা

এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ দ্বারা প্রস্তুত করা রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামোর আধারে (NCF 2005) আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যথেষ্ট পর্যালোচনার পর অবশেষে পাঠ্যক্রমের সংশোধন করেছে। বিশেষতঃ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সমিতির বৈঠকের পরামর্শ তথা সংসদের সভায় নেওয়া আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো 2005-এর আধারে প্রস্তুত করা ১২টি ঐচ্ছিক বিষয় এবং মূল ইংরাজী বিষয়ের পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক উচ্চতর খণ্ডে প্রবর্তন করতে নেওয়া হয়েছে। সেই মর্মে ইংরাজী মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তক সমূহ অসমীয়া এবং বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীর চাহিদা পূরণ করতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা অনুবাদ করানো হয়েছে। অনুবাদক তথা সম্পাদক সমিতির সদস্যগণ এবং সমন্বয়কগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। অক্ষর বিন্যাসক, প্রুফ পাঠক এবং ছাপাখানার কর্মী সকলকে ছাপার উপযোগী করে পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই কার্য সফল হবে তখনই যখন এতে ছাত্র সমাজের প্রভূত উপকার হবে। বিজ্ঞজনের গঠনমূলক পরামর্শ সাগ্রহে কামনা করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণ সমূহ উন্নতরূপে এগিয়ে দেওয়া যায়।

বামুনী মৈদাম

গুয়াহাটি - ২১

ড° উচ্চারণ ডেকা
সচিব
আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

কৃতজ্ঞতা

রাষ্ট্রীয় শৈখিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, নতুন দিল্লি এই পাঠ্যপুস্তকটি অনুবাদের জন্য তথা উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আসাম উচ্চতর শিক্ষা সংসদকে অনুমতি প্রদান করেছেন। আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

সচিব

সূচিপত্র

(Contents)

প্রাককথন _____

ভূমিকা _____

প্রথম অধ্যায় - প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা _____

ভূমিকা _____

সময়সূচী ১ (৬ MYA, Millions Years Ago, ১ BCE, (Before Christian Era)

প্রসঙ্গ ১: মানব সভ্যতার উষালগ্ন _____

প্রসঙ্গ ২: লিখন পদ্ধতি এবং নগর জীবন _____

দ্বিতীয় অধ্যায় সাম্রাজ্যসমূহ

ভূমিকা _____

সময়সূচী ২ (১০০ BCE— ১৩০০ CE] (Christian Era)

প্রসঙ্গ ৩ : তিনটি মহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্যের পত্তন

প্রসঙ্গ ৪: মধ্য ইসলামীয় ভূমি _____

প্রসঙ্গ ৫: যাযাবর সাম্রাজ্য _____

তৃতীয় অধ্যায় পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য

ভূমিকা _____

সময়সূচী ৩ (১৩০০C— ১৭০০C) _____

প্রসঙ্গ ৬: তিনটি শ্রেণী _____

প্রসঙ্গ ৭: পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য _____

প্রসঙ্গ — ৮: বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব

চতুর্থ অধ্যায় আধুনিকতার পথে

ভূমিকা _____

সময়সূচী — ৪ (১৭০০ C— ২০০০) _____

প্রসঙ্গ — ৯: শিল্প বিপ্লব _____

প্রসঙ্গ — ১০: দেশীয় লোকের স্থানচ্যুতি _____

প্রসঙ্গ— ১১: আধুনিকতার বিভিন্ন দিশা _____

উপসংহার —

Millions Years Ago - লক্ষাধিক বছর পূর্বে

Before Christian Era- খ্রিস্ট পূর্বাব্দ।

Christian Era- খ্রিস্টাব্দ।

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি; সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তুলে ব্যক্তির মর্যাদা গড়ে তোলে ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা

(Early Socities)

মানব সভ্যতার উষালগ্ন

লিখন পদ্ধতি ও নগর জীবন

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা

এই অধ্যায়ে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত দুটি প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রসঙ্গটিতে লক্ষাধিক বৎসর আগে সুদূর অতীতে মানবজাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। আমরা দেখতে পাব যে মানবজাতির প্রথম উন্মেষ ঘটল আফ্রিকাতে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মানবদেহের হাড় এবং তৎকালীন পাথরের সরঞ্জামের অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে গবেষণা করে মানবসভ্যতার প্রথম পর্য্যায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অংশে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

আদিম মানবের বাসস্থান, গাছপালা থেকে ও শিকারের মাধ্যমে আহরিত তাদের খাদ্যবস্তু, তাদের প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে পুরাতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন মানবসভ্যতার ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা করেছেন। আগুনের ও ভাষার ব্যবহার শিক্ষা ছিল সভ্যতা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সোপান। আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে আমরা দেখব যে আজও যারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করেন তাদের জীবনযাত্রা থেকে আমরা অতীত সম্বন্ধে কতটুকু জানতে পারি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গতে মেসোপটেমিয়ার মত কতগুলো প্রাচীন নগরী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দেবালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই নগরীগুলো হয়ে উঠেছিল দূর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। প্রাচীন জনবসতিগুলোর ধ্বংসাবশেষের মত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ ও লিখিত উপাদানের ভিত্তিতে সেখানে বসবাসকারী শিল্পী, কারিগর, লিপিকর, শ্রমিক, পুরোহিত, রাজা, রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির লোকের জীবনযাত্রার ইতিহাস জানা যায়। লক্ষ্য করা যাবে যে কয়েকটি নগরীতে পশুপালক গোষ্ঠীরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যদি লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন না হত, তবে এ সমস্ত নগরীতে বিভিন্ন ধরণের কার্য্যকলাপ সংঘটিত হতে পারত কি-না, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

লক্ষাধিক বছর ধরে জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় ও অন্যান্য অস্থায়ী আশ্রয়ে বসবাসকারীরা ঘটনাচক্রে গ্রামে বা শহরে বসবাস করতে শুরু করল। এ ইতিহাস দীর্ঘ। প্রথম অবস্থায় শহরগুলো গড়ে উঠবার আগেকার ৫০০০ বছর ব্যাপী সময়ে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শহরের পত্তন হয়।

আনুমানিক ১০,০০০ বছর আগে যাযাবর জীবন থেকে সুস্থিত কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় প্রবেশ মানব ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথম প্রসঙ্গে দেখা যাবে যে কৃষিকাজ শুরু করবার আগে মানুষ গাছপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। ধীরে ধীরে, এ সমস্ত গাছপালা সম্বন্ধে তারা বিশদভাবে জানতে পারে। কোন পরিবেশ এদের উপযুক্ত, কোন সময়ে কোন গাছ ফলবান হয়— ইত্যাদি। ক্রমে মানুষ গাছ লাগাতে শিখল। পশ্চিম এশিয়াতে গম, বার্লি, মটরশুটী এবং নানা ধরণের ডাল উৎপন্ন হত। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে জোয়ার ও ধান সহজে উৎপন্ন হয়। জোয়ার আফ্রিকাতেও উৎপন্ন হত। একই সময়ে মানুষ ভেড়া, ছাগল, গরু, শুয়োর ও গাধার মত পশুকে পালন করতে শিখল। তুলো ও শণ গাছ থেকে কাপড় ও পশুর লোম থেকে পশম তৈরী হল। আরও কিছুদিন পর কৃষিকাজে গরু ও গাধার মত গৃহপালিত পশুর ব্যবহার শুরু হল।

একটি পরিবর্তনের সূত্র ধরে অন্যান্য পরিবর্তন দেখা দেয়। শষ্য রোপন করবার পর শষ্য পেকে

যাওয়া পর্যন্ত গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এক জায়গায় থাকতে বাধ্য হল। সুতরাং ধীরে ধীরে স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে উঠল। তার পাশাপাশি বসবাসের উপযোগী স্থায়ী আশ্রয়স্থলও তৈরী হল।

একই সময়ে কয়েকটি গোষ্ঠী মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশলও আয়ত্ব করল। এই পাত্রগুলোতে উৎপাদিত শষ্য মজুত করে রাখা যেত, আবার সেই শষ্য থেকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করবার কাজেও এগুলো ব্যবহৃত হত। এ পর্য্যায়ে খাদ্যের সহজ পাচ্যতা ও স্বাদবৈচিত্রও মানুষকে আকর্ষণ করল।

পাথর দিয়ে হাতিয়ার নির্মাণের ধরণেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাথর মসৃণতর করে উন্নতর হাতিয়ার তৈরী হতে লাগল। শষ্য প্রস্তুত করবার জন্য হামানদিস্তা ও কৃষিকাজের জন্য পাথরের কুঠার ও কোদালের ব্যবহারের প্রচলন হল।

কিছু কিছু অঞ্চলে মানুষ তামা ও টিনের মত খনিজ পদার্থের আকর আহরণ করতে শিখল। তামার আকর সংগ্রহ করে সেগুলোর নীলাভ-সবুজ রং নানা কাজে ব্যবহার করা হত। এভাবে অলংকার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে খনিজ পদার্থের বহুল ব্যবহারের পথ খুলে যায়।

দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে কাঠ, দুর্মূল্য ও প্রায় দুর্মূল্য পাথর, ধাতু প্রস্তুরীভূত লাভা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লোকজনের চলাচল ছিল — যার ফলে জিনিষপত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ধারণাও ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্য, গ্রাম ও শহরের সংখ্যাবৃদ্ধি, লোকজনের চলাচল ইত্যাদির ফলে আদিম মানবের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর জায়গায় এখন ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে উঠল। এই পরিবর্তনগুলো হাজার বছরের পরিসরে সংঘটিত হলেও প্রথম পর্য্যায়ের নগরীগুলো গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের ধারাও দ্রুততর হল। অবশ্যই এই পরিবর্তনের সূদূর প্রসারী ফলাফলও ছিল। জনজীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ধারাকে অনেক পণ্ডিতেরা বিপ্লব বলে বর্ণনা করেছেন। ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের মত দুটি বিপরীত ধর্মী প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমরা প্রাচীন সমাজের শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছি। কৃষি ভিত্তিক সমাজ ও পশুপালক সমাজ ছাড়াও আরও নানা ধরণের সমাজ গড়ে উঠেছিল। শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজের পাশে নাগরিক সমাজেরও অবস্থান ছিল।

সময়সূচী পাঠের পদ্ধতি

প্রতিপরিচ্ছেদে একটি সময়সূচী দেওয়া হয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে পৃথিবীর ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সময় সূচী পাঠের সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিৎ—

- সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নিরূপণ করবার চাইতে ইতিহাস গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের সময় নিরূপণ করা কঠিনতর।
- কয়েকটি বিশেষ তারিখ একটি প্রক্রিয়ার আরম্ভ বা তার পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময় নির্দেশ করতে পারে।
- ঐতিহাসিকেরা নতুন প্রমাণের ভিত্তিতে অথবা নতুন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরণো তথ্য বিশ্লেষণ করে সময় নির্দেশিকার পরিবর্তন করে চলেছেন।
- আলোচনার সুবিধার জন্য সময়সূচীকে ভৌগলিক বিভাজনের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা যায় না।
- তাছাড়া ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সময় নির্দ্ধারণও কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না।
- মানব ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যবহৃত বিশেষ প্রক্রিয়াগুলো আলোচ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেক প্রসঙ্গতে পৃথক সময়সূচী উল্লিখিত আছে।
- চিহ্ন নির্দেশিত স্থানে প্রাসঙ্গিক সময় অনুসারে চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।
- বিশেষ স্থানগুলো শূন্য রাখবার অর্থ এই নয় যে এ সময়ে কোন ঘটনা ঘটে নি। হয়তো তখনকার ঘটনা আজও আমাদের অজ্ঞাত।
- আগামী বছর ব্যাপকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করা হবে। দক্ষিণ এশিয়ার সূত্রে উল্লিখিত তারিখগুলো উপমহাদেশের কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।

সময়সূচী-১

৬ লক্ষাধিক বছরপূর্ব (Millions of years Ago MYA—) খ্রিঃ পূঃ

এই সময়পথটি পৃথিবীতে মানুষের আগমণের সময় থেকে শুরু করে পশুপালন ও কৃষি উৎপাদন শুরুর সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকৌশলগত পরিবর্তন, যেমন আগুন, ধাতু, লাঙ্গল ভিত্তিক চাষ ও চাকার ব্যবহার ইত্যাদি এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রক্রিয়ার মধ্যে নগরীর ও লিখন পদ্ধতির উদ্ভবেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের কথা এখানে উল্লিখিত হলেও এগুলোকে সময়সূচী - ২ এ যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
৬mya - ৫০০,০০০BP	দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রাপ্ত প্রথম জীবাশ্ম আগুন ব্যবহারের প্রমাণ	
৫০০,০০০-১৫০,০০০BP	মানব জীবাশ্ম	আগুন ব্যবহারের প্রমাণ
১৫০,০০০-৫০,০০০BP		
৫০,০০০-৩০,০০০		মানব জীবাশ্ম
৩০,০০০-১০,০০০	গুহা বা পাথরের প্রাচীরের গায়ে চিত্র	গুহা বা পাথরের প্রাচীরের গায়ে চিত্র (বিশেষভাবে ফ্রান্স ও স্পেনে)
৮০০০-৭০০০ খ্রি: পূ:		
৭০০০-৬০০০	গরু ও কুকুর পালন	
৬০০০-৫০০০		গম ও বার্লির চাষ (গ্রীস)
৫০০০-৪০০০		
৪০০০-৩০০০	গাধা পালন, জোয়ারের চাষ, তামার ব্যবহার	তামার ব্যবহার (ক্রীট)
৩০০০-২০০০	লাঙ্গলভিত্তিক চাষ, রাজ্য স্থাপন, নগর, পিরামিড, ক্যালেণ্ডার, চিত্রাক্ষর, প্যাপিরাসে লিখন	ঘোড়া পালন (পূর্ব ইউরোপ)
২০০০-১৯০০		নগর, প্রসাদ, তামার ব্যবহার, কুমাড়ের চাকা ব্যবসার বিস্তার (ক্রীট)
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		অক্ষরের উদ্ভাবন (ক্রীট)
১৬০০-১৫০০		
১৫০০-১৪০০	কাচের বোতলের ব্যবহার (মিশর)	
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০		
১১০০-১০০০		লোহার ব্যবহার
১০০০-৯০০		
৯০০-৮০০	পশ্চিম এশিয়ার ফোয়েনিশিয়ানদের দ্বারা উত্তর আফ্রিকাতে কার্থেজ নগরী স্থাপন; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসার বিস্তার	
৮০০-৭০০	লোহার ব্যবহার (সুদান)	প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া (গ্রীস ৭৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)
৭০০-৬০০	লোহার ব্যবহার (মিশর)	
৬০০-৫০০		মুদ্রার ব্যবহার (গ্রীস); রোমান প্রজাতন্ত্র স্থাপন (৫১০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)
৫০০-৪০০	পার্সিয়ানদের মিশর আক্রমণ	আথেন্সে (গ্রীস) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
৪০০-৩০০	পরবর্তীতে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত আলেকজান্ড্রিয়া নগরীস্থাপন, মিশর (৩৩২ খ্রী:পূ:)	ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার কিছু অংশ জয় করেন (৩৩৬-৩২৩ খ্রি:পূ:)
৩০০-২০০		
২০০-১০০		
১০০-১ খ্রি:পূ:		

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
৬mya -৫০০,০০০BP	আগুনের ব্যবহার	পাকিস্তানের রেওয়াটে প্রস্তর যুগীয় ভূমিখণ্ড
৫০০,০০০-১৫০,০০০BP		
১৫০,০০০-৫০,০০০BP	মানব জীবাশ্ম	
৫০,০০০-৩০,০০০BP		
৩০,০০০-১০,০০০BP	কুকুর পালন (১৪০০ পশ্চিম এশিয়া)	ভীমবেটকার (মধ্য প্রদেশ) গুহাচিত্র। শিলা
৮০০০-৭০০০ খ্রি: পূ:	ভেড়া ও ছাগল পালন, গম এবং বার্লির চাষ (পশ্চিম এশিয়া)	
৭০০০-৬০০০	শুকর ও গরু পালন (পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া)	প্রাচীন কৃষিভিত্তিক বসতি (বালুচিস্তান)
৬০০০-৫০০০	মুরগীপালন, জোয়ার ও মিষ্টি আলুর চাষ (পূর্ব এশিয়া)	
৫০০০-৪০০০	তুলো চাষ (দক্ষিণ এশিয়া) তামার ব্যবহার (পশ্চিম এশিয়া)	
৪০০০-৩০০০	কুমাড়ের চাকা, যাতায়াতের জন্য চাকা (৩৬০০খ্রি:পূ:), লিখন পদ্ধতি (৩২০০ খ্রি:পূ:) মেসোপটেমিয়া), ব্রোঞ্জের ব্যবহার	তামার ব্যবহার
৩০০০-২০০০	লাঙ্গলভিত্তিককৃষি, নগরী (মেসোপটেমিয়া) রেশম তৈরী (চীন) ঘোড়া পালন (মধ্য এশিয়া) ধান চাষ (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া)	হরপ্পা সভ্যতা, লিপির ব্যবহার (২৭০০ খ্রি:পূ:)
২০০০-১৯০০	মহিষ পালন (পূর্ব এশিয়া)	
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		
১৬০০-১৫০০	নগরী, লিখন পদ্ধতি, রাজ্য স্থাপন (শেং বংশ), ব্রোঞ্জের ব্যবহার (চীন)	
১৫০০-১৪০০	লোহার ব্যবহার (পশ্চিম এশিয়া)	ঋকবেদ্ রচনা
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০		লোহার ব্যবহার,
১১০০-১০০০	একটি কুজ বিশিষ্ট উট পালন (আরব)	
১০০০-৯০০		
৯০০-৮০০		
৮০০-৭০০		
৭০০-৬০০		
৬০০-৫০০	মুদ্রার ব্যবহার (তুরস্ক) রাজধানী পার্সিপোলিস সহ পারসিক সাম্রাজ্য (৫৪৬ খ্রি:পূ:; চীনদেশীয় চিন্তাবিদ্ কনফুসিয়াস (৫৫১ খ্রি:পূ:)	বিভিন্ন এলাকায় নগরী ও রাষ্ট্র, প্রথম মুদ্রা, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার
৫০০-৪০০		
৪০০-৩০০		মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন ৩২১ খ্রি:পূ:
৩০০-২০০	চীনদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন (২২১খ্রি: পূ:) চীনের প্রাচীর তৈরীর কাজ শুরু	
২০০-১০০		
১০০-১ খ্রি:পূ:		

তারিখ	আমেরিকা	অষ্ট্রেলিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
৬ mya- ৫০০,০০০BP		
৫০০,০০০-১৫০,০০০BP		
১৫০,০০০-৫০,০০০BP		
৫০,০০০-৩০,০০০BP		শিলা
৩০,০০০-১০,০০০myaBP	মানব জীবাশ্ম	চিত্রাঙ্কন
৮০০০-৭০০০ খ্রি: পূ:		
৭০০০-৬০০০	স্কোয়াশ চাষ	
৬০০০-৫০০০		
৫০০০-৪০০০	ফরাস চাষ	
৪০০০-৩০০০	তুলো ও লাউ চাষ	
৩০০০-২০০০	বিশেষ ধরণের শূকর ও মুরগী পালন, ভূট্টার চাষ	
২০০০-১৯০০	আলু, লঙ্কা মটরশুটী,বাদাম ও কাসাভার চাষীলামা ও আলপাকা পালন	
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		
১৬০০-১৫০০		
১৫০০-১৪০০		
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০	ম্যাক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলে ওলম্যাক বসতি, প্রাচীন মন্দিরও ভাস্কর্য	পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়াতে বসতি।
১১০০-১০০০		
১০০০-৯০০	চিত্ররেখার উদ্ভাবন	
৯০০-৮০০		
৮০০-৭০০		
৭০০-৬০০		
৬০০-৫০০		
৫০০-৪০০		
৪০০-৩০০		
৩০০-২০০		
২০০-১০০		
১০০-১ খ্রি:পূ:		

অনুশীলন

ছ'টি সরণির প্রত্যেকটি থেকে একটি করে সময় নির্দেশ কর। কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে সে সময় সে অঞ্চলে মানুষের বসবাস সম্ভব হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর।

প্রসঙ্গ ১

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন

এই অধ্যায়ে আমরা মানব জাতির অস্তিত্বের শুরুর কথা আলোচনা করব। প্রায় ৫.৬ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে (mya তে যা লিখা আছে) প্রথম মানব সদৃশ প্রাণী পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হয়। এর পর বিভিন্ন ধরনের মানুষের সৃষ্টি হয় এবং পরে তারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। প্রায় ১৬০০০০ বৎসর পূর্বে আমাদের মত মানুষের, যাদের আধুনিক মানুষ বলা হয়, তাদের সৃষ্টি হয়েছিল। মানব জীবনের এই দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষ গাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করত। শিকারের দ্বারা তারা খাদ্য সংগ্রহ করত। তারা আরও শিখেছিল কীভাবে পাথরের হাতিয়ার তৈরী করা যায় এবং একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

পরবর্তী সময়ে শিকার ছাড়াও খাদ্য সংগ্রহের অন্যান্য উপায় তারা রপ্ত করেছিল। বর্তমানেও শিকারী সমাজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। বর্তমানে যারা শিকার করে জীবন নির্বাহ করে তাদের জীবন যাপন প্রণালী আমাদেরকে অতীত সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে কিনা, তা আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন।

Fossils are the remains or impressions of a very old plant, animal or human which have turned into stone. These are often embedded in rock, and are thus preserved for millions of years.

মানুষের জীবাশ্ম, পাথরের তৈরী হাতিয়ার এবং গুহাচিত্রের আবিষ্কার আমাদেরকে প্রাচীন মানব ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। প্রত্যেক আবিষ্কারের পেছনেই তার নিজস্ব কিছু ইতিহাস আছে। প্রথম যখন মানব জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় তখন পণ্ডিতেরা ঐগুলি মানুষের জীবাশ্ম বলে মানতে নারাজ ছিলেন। প্রাচীন মানুষের পক্ষে হাতিয়ার তৈরী করা এবং গুহাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর ছিল না, এ ব্যাপারে ও তারা সন্দিহান ছিলেন। এই আবিষ্কারগুলোর গুরুত্ব উদঘাটিত হল। অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানব প্রজাতির জীবাশ্ম মানুষের ক্রমবিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা জীবাশ্মের সময় নির্ণয় করা যায়। অথবা যে সমস্ত পাথরে জীবাশ্মগুলো প্রোথিত আছে তাদের সময় নির্ণয় করে পরোক্ষভাবে জীবাশ্মর সময় নির্ণয় করা যেতে পারে। জীবাশ্মের দিনক্ষণ নির্ণয় করার মাধ্যমেই মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়।

প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করতে পণ্ডিতরা অস্বীকার করেছিলেন। তার কারণ ছিল সে সময় বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টকে অনুসরণ করে তারা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন ঈশ্বর।

প্রজাতি (species) *হল একদল জীব যারা সন্তান প্রসব করে বংশ বৃদ্ধি করে। তবে বংশ বৃদ্ধির জন্য এক প্রজাতির সদস্য অন্য প্রজাতির সদস্যের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।*

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসে জার্মানীর ডুসেল ডর্ফ্ (Dusseldorf) শহরের পাশে নিয়েনদার উপত্যকার গিরিখাতে (Neander Valley) (মানচিত্র-২) চুনাপাথর উত্তোলনের সময় কয়েকজন শ্রমিক একটি মাথার খুলি এবং কিছু কংকালের টুকরো পায়। কার্ল ফুলরত (carl Fuhlrott) নামক একজন স্কুল শিক্ষক এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসবিদের কাছে এগুলি তারা সমঝে দেয়। তার মতে এগুলো যে আধুনিক কালের মানুষের নয় তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তখন চুন, বালি ও জল দ্বারা মণ্ড (লেই) তৈরি করে খুলিটিকে ঐ মণ্ডে দিয়ে মাথার একটি ছাঁচ তৈরি করে (Plaster cust) বন বিশ্ববিদ্যালয়ের শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপক Herman Schaaffausen এর কাছে পাঠিয়ে দেন। পরের বৎসর তারা যুগ্মভাবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে

বলেন যে, এই খুলিটা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানব প্রজাতির একজনের মাথায় খুলি। ঐসময়ে পণ্ডিতরা তাদের ঐ কথাটি মানতে রাজি ছিলেন না বরং তারা মত প্রকাশ করেন যে এটি আরও পরবর্তী সময়ের মানুষের মাথার খুলি।

জীবাশ্ম উদ্ধার

একটি কষ্টদায়ক প্রক্রিয়া। যথাযথ প্রাপ্তিস্থান সময় নির্ণয় করার জন্য জীবাশ্মের সঠিক প্রাপ্তি স্থান জানা গুরুত্বপূর্ণ

স্থান নির্ধারনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ববিদের বাম দিকের ফ্রেমটি একটি ঝাঁঝরি যা ১০ সে:মি: বর্গাকারে ভাগ করে অনুভূমিক অবস্থায় রাখা হয়েছে। ডানদিকের ত্রিভুজ আকৃতির যন্ত্রটি উল্লম্ব অবস্থা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবাশ্ম কীভাবে পাথর থেকে বের করা হয় তা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে জীবাশ্ম চুনাপাথরের মধ্যে প্রথিত কতটুকু। এই অন্বেষণ কাজে দক্ষতাও ধৈর্যের প্রয়োজন তা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর, প্রকাশিত চার্লস ডারউইনের (Charles Darwin) মানুষের বিবর্তনের বিষয়ে গবেষণা এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। "On the origin of species" নামক বইটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে প্রথম দিনে ১২৫০ টি কপি বিক্রি হয়ে যায়। ডারউইনের মতে, প্রাচীনকালে পশু থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়।

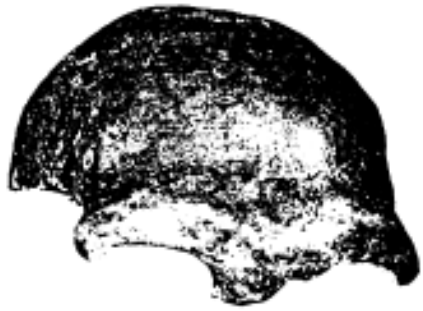

চিত্র - নিয়েনদার থাল [Neanderthal] মানুষের একটি মাথার খুলি। যারা আদিম মানুষের মাথার খুলি বলে স্বীকার করেন নি তারা এটাকে 'নির্বোধ' বা 'নিদান-শাস্ত্রীয় বোকা' বলে অভিহিত করতেন।

কার্যক্রম - ১ মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রায় সব ধর্মেই যেসব গল্প আছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই ধরনের কয়েকটি গল্প বের কর এবং এই অধ্যায়ে আলোচিত মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের গল্প
(a) আধুনিক মানবজাতির অগ্রদূতগণ

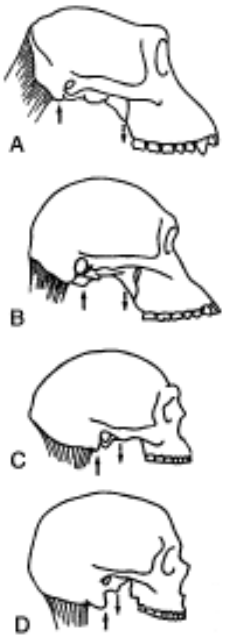

এই চারটি খুলির দিকে তাঁকাও —

A 1 নং খুলির চিত্র A বানরের অংশভুক্ত

B 2 নং খুলির চিত্র B অষ্ট্রোলপিথেকাসে অন্তর্ভূক্ত

C 3 নং খুলির চিত্র C হম ইরেক্টাস

D 4 নং খুলির চিত্র D হম সেপিয়ান (জ্ঞানী বা বিজ্ঞ মানুষ)

(বর্তমানের সমস্ত মানুষ এইবর্গের অন্তর্গত)

এদের মধ্যে অনেক মিল ও অমিল আছে। এদের মস্তিক, দাঁত ও চোয়াল ভাল করে দেখে আমরা একটি তালিকা তৈরি করতে পারি। পাশের চিত্রে মাথার খুলির যে পার্থক্য তোমরা দেখেছ, তা মানুষের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হতে থাকে। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস দীর্ঘ ও কিছুটা জটিল। এখানে অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর দেওয়া কঠিন, আবার নতুন নতুন তথ্য পুরানো বিশ্বাসে পরিবর্তন আনে। এখন আমরা তথ্যগত পরিবর্তন ও তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব।

যদি আমরা ৩৬ থেকে ৩৪ mya এর দিকে তাকাই তবেই এইসব পরিবর্তন আমরা চিহ্নিত করতে পারবো। কখনও কখনও এই দীর্ঘ সময়ের যে পরিবর্তন তার সম্পর্কে ধারণা করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। তুমি যদি মনে কর তোমার বই এর-একপাতা ১০০০০ বৎসর, ১০ পাতা ১০০০০০ বৎসর এবং ১০০ পাতার এক মিলিয়ন বৎসরের (দশ লক্ষবৎসরের) ইতিহাস তুলে ধরে তবে তুমি ধারণা করতে পার যে ৩৬ মিলিয়ন বৎসরের কথা লিখতে ৩৬০০ পাতার প্রয়োজন। যখন প্রাচীন মানুষেরা একধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল তখন এশিয়া, আফ্রিকাতে তাদেরকে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রায় ২৪ mya তে প্রাচীন মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ অংশকে বলা হয় হমিনয়েড্ (Hominoid), এগুলির মধ্যেই ছিল বানর (ape) এবং অনেক পরে প্রায় ৫.৬ mya তে আমরা প্রথম মানুষের হমিনিডস্ (hominids) এর নিদর্শন পাই।

যখন হমিনিডস্ (hominids) অর্থাৎ মানুষ হমিনয়েডস্ (hominoids) থেকে আবির্ভূত হয় কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে, তখনও তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। Hominoids এর ব্রেন Hominids থেকে ছোট। তারা চতুষ্পদ জন্তু, চারিটি পা দিয়েই তারা হাঁটতো কিন্তু তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রয়োজনে নড়াচড়া করতে পারত। Hominidsদের মধ্যে আবার পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে একদল দুপায়ে হাঁটতো। হাত দ্বারা তারা বিভিন্ন ধরনের ছোট হাতিয়ার তৈরী করত। আমরা দেখবো তারা কী ধরনের হাতিয়ার তৈরী করত এবং পরবর্তীতে তাদের কী গুরুত্ব ছিল।

হমিনিডস্দের উৎপত্তি প্রথমে যে আফ্রিকাতে হয় এই সম্পর্কে (Hominids) দুটি প্রমাণ আছে। প্রথমত: আফ্রিকান বানরের Hominids একটি দল এর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত: ৫.৬ mya এর পূর্বে আফ্রিকাতে যে প্রাচীন জীবাশ্ম পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তারা অষ্ট্রোলপিথেকাস (Austrolopithecus) জাতির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, আফ্রিকার বাইরে যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা ১.৮ মিলিয়ন বৎসর থেকে পুরাতন নয়।

Primates are a subgroup of a larger group of mammals. They include monkeys, apes and humans. They have body hair, a relatively long gestation period following birth, mammary glands, different types of teeth, and the ability to maintain a constant body temperature.

হাতের বিবর্তন

A. শিম্পাঞ্জির (এক ধরনের বানর বিশিষ্ট) যথার্থ দৃঢ়মুষ্টি ধারণ দেখাচ্ছে।
B Hominids এর দৃঢ় মুষ্টি ধারণ দেখাচ্ছে।
C মানুষের হাতের ঠিক ঠিক দৃঢ় মুষ্টি ধারণ দেখাচ্ছে। শিম্পাঞ্জির দৃঢ়মুষ্টি ও মানুষের হাতের মুষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

যথার্থ দৃঢ় মুষ্টি ধারণ করে কী কর তার একটি তালিকা তৈরী কর।

শক্তিশালী দৃঢ় মুষ্টি ধারণ করে তুমি কী কর তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

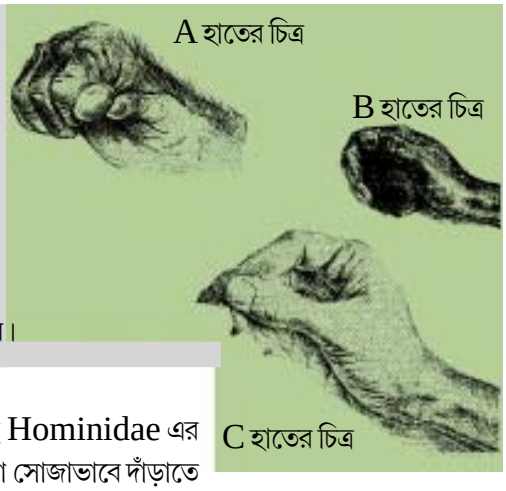

Hominids, Hominidae পরিবারের অন্তর্গত এবং সমস্ত মানবজাতি এই Hominidae এর অন্তর্গত। Hominids এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের মস্তিষ্ক আয়তনে বড়, তারা সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে। এরা দ্বিপদবিশিষ্ট এবং তাদের হাতের ও বিশেষত্ব আছে।

Hominids আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যেমন মহাজাতি (genus) যাদের মধ্যে অষ্ট্রোলপিথেকাস (Australopithecus) এবং মানুষ (Homo) এরাই প্রধান। এদের প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি প্রজাতিতে বিভক্ত। Australopi thecus এবং Homo এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ব্রেন বা মাথার আয়তন, দাঁত ও চোয়াল এ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটির ব্রেন আয়তনে ছোট, চোয়াল ভারী এবং দাঁত (Homo) হোমো থেকে বড়।

বিজ্ঞানীরা প্রজাতিগুলোর যে সকল নাম দিয়েছেন সেগুলি ল্যাটিন ও গ্রীক শব্দ থেকে আহরিত। উদাহরণস্বরূপ 'Australopithecus' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Austral' অর্থাৎ দক্ষিণ এবং একটি গ্রীক শব্দ 'Pithekos' অর্থাৎ "বানর" হতে এসেছে। এই নাম দেওয়ার কারণ, প্রাচীনকালে মানুষ ও বানরের মধ্যে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন মানুষের থেকে তাদের মস্তিষ্ক ছোট, পিছনের লম্বা দাঁত এবং হাতের ক্ষমতা কম ছিল। যেহেতু তাদের বেশীর ভাগ সময় গাছে কাটাতে হত, তাই তাদের হাটা-চলা কম ছিল। তাছাড়া তাদের আরও অনেক মানবিক চরিত্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তাদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল

Hominoids হল ভিন্ন ধরনের বানর যাদের শরীর ছিল অধিকতর লম্বা এবং লেজ ছিল না। তাছাড়া দীর্ঘ সময় ব্যাপি তাদের পরস্পরের মধ্যে নির্ভরশীলতা ছিল।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র

উপরের এই দৃশ্যটি পূর্ব আফ্রিকার রিপ্ট উপত্যকার ওল্ডুভাই (Olduvai) জর্জ (George) এর।
(১৪ নং মানচিত্র দেখ)

এটা এমন একটি স্থান যেখানে প্রাচীন মানব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফটোর মধ্যভাগে দেখা যাচ্ছে অসম ভূমি এর প্রত্যেক ভাগে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে তার ভূতত্ত্ববিষয়ক ক্রমোন্নতির দৃশ্য।

যেমন— সামনের পাগুলি বাকানো, বাকানো হাত, পায়ের হাড় ও পায়ের গোছা সহজে পরিবর্তনশীল) যার দ্বারা গাছে চড়া সুবিধাজনক ছিল। পরবর্তী সময়ে যন্ত্র তৈরী এবং দীর্ঘ সময় ব্যাপি হাঁটা বৃদ্ধি পায়। অনেক মানবিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের মধ্যে দেখা যায়।

অষ্ট্রোলপিথেকাস, ওল্ডুভাই জর্জ এর আবিষ্কার ১৭ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিঃ

একজন জার্মান প্রজাপতি সংগ্রহকারী বিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে দি ওণ্ডুভাই জর্জ (The olduvai George) আবিষ্কার করেন। মেরী (Mary) এবং লুই লেকি (Louis Leakey) যারা ৪০বৎসর এখানে

কাজ করেছিলেন তাদের থেকে এই Olduvai কে চিহ্নিত করা হয়। মেরী এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য করার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন ফলে তিনি অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার ও করেছিলেন। এটাই Louis Leakey লিখেছিলেন তাদের এক স্মরণীয় আবিষ্কারের ব্যাপারে। 'ঐ দিন সকালবেলা আমি একটু মাথায় ব্যাথা ও জ্বর নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ঐ দিন ক্যাম্পে কাটানোর জন্য রাজি হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গের একজন। মেরী খনন কার্য্যের জন্য রওয়ানা হল। Land Rover (জিপ গাড়ির মত) গাড়িতে মেরীর সঙ্গে ছিল সেল্লি ও টুট্স নামে দুটো কুকুর আমি ঐ দিনটি বিশ্রাম হীন অবস্থায় কাটিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম ল্যাণ্ড রবার (Land Rover) দ্রুত ক্যাম্পের দিকে আসছে। দেখলাম তীব্র যন্ত্রনা নিয়ে একটি লোক মেরীর সঙ্গে আসছে। মনে হল তাকে বৃশ্চিক বা সাপ কামড় দিয়েছে। জীপটি থামল এবং আমি শুনলাম মেরী চিৎকার করে বলছে, 'আমি তাকে পেয়েছি, আমি তাকে পেয়েছি'। আমি বললাম সে কী পেয়েছ?' মেরী বলল, 'আমরা ২৩ বৎসর যাবৎ যাকে খুঁজছি, তাড়াতাড়ি এসো, আমি তার দাঁত পেয়েছি।'

প্রাচীনকালে মানুষের শরীরের যে অংশ (খুলি, হাঁড় ইত্যাদি) পাওয়া গেছে তা দেখে মানুষকে বিভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ করা যায়। তাদের বিভিন্ন ধরণের হাড়ের গঠনে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদারণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রাচীন মানুষের খুলির আয়তন ও চোয়াল দ্বারা পার্থক্য বুঝা যায়। এই সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

ইতিবাচক প্রত্যাগত কৌশল

তীর দ্বারা বাক্সের দিকে দেখানো হয়েছে যে বিশেষ কোন উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে অন্যের উপর প্রভাব কীভাবে বিস্তার করে।

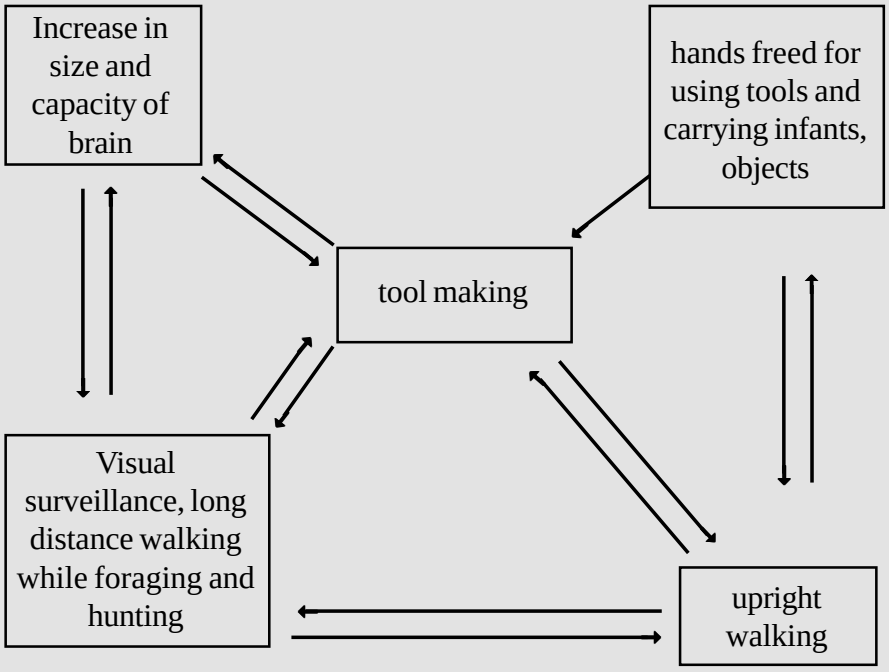

The arrows pointing away from a box indicate how developments mentioned in the box influenced other processes.

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে দুপায়ে হাঁটার ফলে মানুষ হাত দিয়ে শিশু অথবা যে কোন জিনিস বহন করতে পারত। যেহেতু হাত অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় তাই সোজা হয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ অধিক কর্মক্ষম হয়। হাত বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় হাটায় কম শক্তি ব্যয় হয় তাই চতুষ্পদী জীবের চেয়ে মানুষের চলাফেরা সহজ হয়। দ্বিপদ মানুষের হেটে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় ৩.৬ mya তে। তানজিনিয়ার লেকটলিতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের পদচিহ্নে ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাডার, ইথিওপিয়ার জীবাশ্ম থেকে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে ও মানুষের দুপায়ে হাটার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২.৫ mya নাগাদ তুষার যুগের শুরুতে যখন পৃথিবীর বিশাল অংশ বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন জলবায়ু ও উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে পরিবর্তন আসে। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত কমার ফলে তৃণভূমির আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ঘন জঙ্গলের আয়তন কমে আসে। পূর্বেকার অষ্ট্রোলথেপিকাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে অন্যান্য প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে যারা শুষ্ক পরিবেশে ও মানিয়ে নিতে পারে। তাদের মধ্যে থেকে হোমো প্রজাতির উন্মেষ ঘটে। হোমো একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ মানুষ মহিলা ও পুরুষ। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেন। এই সকল বিভিন্ন প্রজাতির নাম এসেছে তাদের নানা ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর অনুযায়ী । সুতরাং জীবাশ্মকে ভাগ করা যায় এভাবে— যন্ত্র তৈরী কারক (Homo habilis), সোজা হয়ে চলা মানুষ (Homo erectus), জ্ঞানী অথবা চিন্তাশীল

মানুষ (Homo Sapiens)। তানজানানিয়ার (Tanzania) অল্ডুভাই জর্জ (Olduvai George) এবং ইথিওপিয়ার (Ethiopia) ওমো (Omo) ইত্যাদি স্থানে যন্ত্র তৈরী কারক মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকা উভয় মহাদেশেই প্রাচীনতম জীবাশ্ম থেকে সোজা হয়ে হাঁটা মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন কোবি ফোরা (Koobi Fora) পশ্চিম তুর্কানা, কেনিয়া, মজকেরত (Modjokerto) সাংগিরান (Sangiran) জাভা ইত্যাদি অঞ্চলে এটা আবিষ্কৃত হয়। আফ্রিকার পরে এশিয়াতেও তা আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবত Hominids রা (বাদরের মত) ছিল।

পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ও উত্তর আফ্রিকায় এবং উত্তর পূর্ব এশিয়ায় এবং সম্ভবত ইউরোপে এসেছিল দুই এবং ১.৫ mya এর মধ্যে।

এই প্রজাতি প্রায় মিলিয়ন (১০ লক্ষ) বৎসর বেঁচেছিল।

মানচিত্র নং - ১ (ক)
আফ্রিকা

মানচিত্র নং - ১ (খ)
পূর্ব আফ্রিকার রিফ্‌ট উপত্যকা

অনেক ক্ষেত্রে, এক বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম যে সকল অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল সেই সকল অঞ্চলের নাম অনুসারে তাদের নাম দেওয়া হয়। জার্মানীর একটি নগর হেইডেল বার্গে (Heidelberg) যে জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় (Home heidelbergensis) হোমো হেইডেলবার্গজেনসিস, যখন এই জীবাশ্ম পাওয়া গেল নিয়েনদার (Neander Velley) উপত্যকায় তখন এর নাম দেওয়া হয়েছিল হোমো নিয়েনদার থালেনসিস (Neanderthalensis)।

ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন জীবাশ্ম হল হেইডেল বার্গ জেনেসিস এবং নিয়েনদারথেলনসিস। উভয়ই পুরাতন হোমো সেপিয়েনস (Homo Sapiens) এর অন্তর্গত। হেইডেল বার্গরজেনোসিস জীবাশ্ম (০.৮ mya) আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে ছিল। নিয়েনদার থালেয়নসিস (Neanderthalensis) ১৩০০০০ থেকে ৩৫০০০ বৎসর পূর্বে পশ্চিম ইউরোপ থেকে আকস্মিক ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়।

Australopithecus এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় মানুষের (Homo) মস্তিষ্ক ছিল অধিকতর বড়, চোয়ালের বাহিরের দিক ছোট, দাঁতগুলি আগের থেকে ছোট।

মস্কিষ্কের বৃদ্ধির জন্য তারা অধিক স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ছিল। চোয়াল ও দাঁতের পরিবর্তনে সম্ভবত তাদের খাদ্য অভ্যাসে ও পরিবর্তন আসে।

পৃথিবীর মানুষ

কখন	কোথায়	কারা
৫-১mya	আফ্রিকার সাহারার কিছু অঞ্চলে	অষ্টোলপেথিকাস প্রাচীন মানুষ, সোজা হয়ে চলা মানুষ
১mya হইতে ৪০০০০ বৎসর পূর্বে	আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্য অক্ষাংশে	সোজা (খাড়া) হয়ে হাঁটা মানুষ প্রাচীন হোমো সেপিয়ান, নিয়েনদারবেল এবং হেমো সেপিয়ান আধুনিক মানুষ।
৪৫০০০	অষ্ট্রেলিয়া	আধুনিক মানব
৪০০০০ বৎ আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	ইউরোপের উচ্চ অক্ষাংশের এশিয়ার মহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমি অঞ্চলে, বৃষ্টিপাত হওয়া (স্থানে) বন জঙ্গলে।	পরবর্তী নিয়েনদাথলের এবং আধুনিক মানুষ

কার্যক্রম -২

পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন করে উপরের তালিকায় যে পরিবর্তন দেখানো হয়েছে তা দেখাও। চারটি সময়সীমা বিভিন্ন রং এর সাহায্যে দেখাও । মহাদেশের একটি তালিকা করে এবং তাতে রং ব্যবহার করবে (১) একটি রং (২) ২টি রং (৩) দুই এর অধিক রং।

মানুষের বিবর্তনের গল্প
(b) আধুনিক যুগের মানুষ

আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্ম

কোথায়	**কখন (**বৎসর পূর্বে)
ইথিওপিয়া ওমো কিবিশ	১৯৫,০০০-১৬০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ডার কেভ্ (Border Cava) ডাই কেলডারস্ (Die Kelders) ক্লাসিস রিভার মাউথ (Klasies River Mouth)	১২০,০০০-৫০,০০০ বৎসর পূর্বে
মরক্কো ডার এস সলতন Dar es-Soltan	৭০,০০০-৫০,০০০ বৎসর পূর্বে
ইজরায়েল কোয়াফজে সোকল	১০০,০০০-৮০,০০০ বৎসর পূর্বে
অষ্ট্রেলিয়া লেইক মুঙ্গ Lake Mungo	৪৫,০০০-৩৫,০০০ বৎসর পূর্বে
বর্ণিও (Borneo) নিয়া কেইভ (Niah cave)	৪০,০০০ বৎসর পূর্বে
ফ্রান্স ক্রো-মাগনন নিয়ার লা ইজিয়েঁ Cor-Magnon near les Eyzies	৩৫,০০০ বৎসর পূর্বে

তোমরা যদি উপরের এই তালিকার দিকে তাকাও, তবে দেখবে যে আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে হোমো সেপিয়েন্স এর প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া যায়। এই তালিকা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দেয় যে মানুষের উৎপত্তি স্থল একটি না কয়েকটি।

মানুষের উৎপত্তি স্থল কোথায় তা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এখানে দুটি ভিন্ন মত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি মতানুসারে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানে মানুষের উৎপত্তি হয় এবং অন্য মত অনুসারে আফ্রিকাই একমাত্র মানুষের উৎপত্তি স্থল।

যারা মানুষের উৎপত্তি স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেন, তাদের মতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন হোমোসেপিয়ান রাই বর্তমান যুগের মানুষ, এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চেহারাতে প্রথম দৃষ্টিতেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান কালে মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্যই হয়। এধরনের মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণা হল হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো হেইডেলবার্গ জেনসিসদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকার ফলে চেহারাতে পার্থক্য দেখা যায়।

The Replacement and Regional Continuity Models

পুন:স্থাপন ও আঞ্চলিক অবিচ্ছিন্নতার আদর্শ

এই আদর্শে দেখা যায় যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন মানুষের স্থলে আধুনিক মানুষের পুন:স্থাপন হয়েছে। আধুনিক মানুষের উৎপত্তি এবং দৈহিক গঠনের সমসা বা মিল-এর প্রমাণই এই মতবাদকে সুদৃঢ় করে। অনেকে এই মতবাদ পোষণ করেন যে, মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলে ও তাদের চেহারায় অনেক মিল (সঙ্গতি) থাকার কারণ হল— মানুষের উৎপত্তি স্থল একটি, অর্থাৎ আফ্রিকাই মানুষের উৎপত্তিস্থল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্ম এই পুন:স্থাপনের আদর্শকেই সমর্থন (সুপ্রমাণ) করে। পণ্ডিতদের মতে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করায় তাদের শারীরিক গঠনে পার্থক্য দেখা যায়।

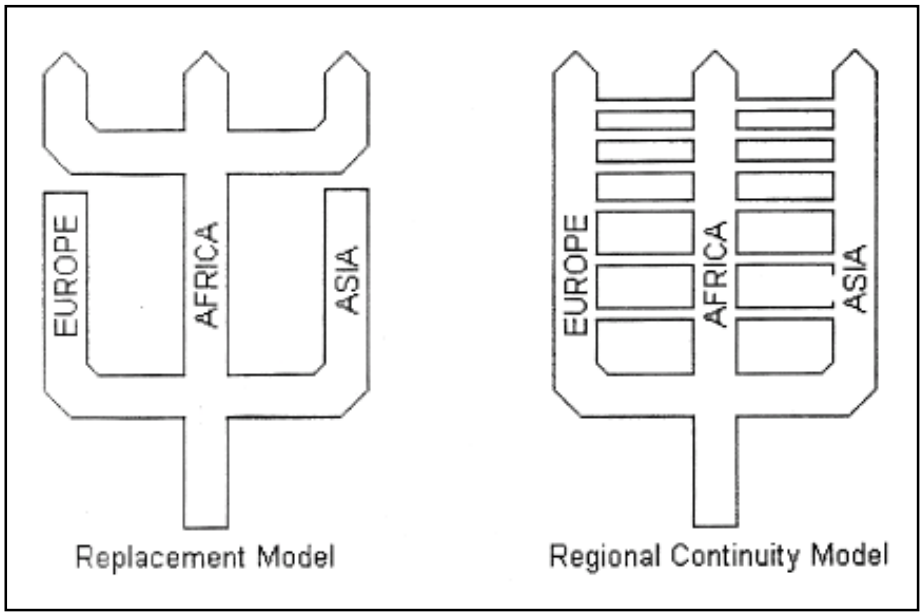

প্রাচীন মানব : খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

মানব কঙ্কালের অবশিষ্টাংশকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বিশেষত: বিভিন্ন মহাদেশে মানুষের চলাচল বা যোগাযোগের যে ব্যবস্থা তার ইতিহাস রচনা করতে এই কঙ্কাল আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাছাড়া ও মানুষের জীবনে আরও যে বিভিন্ন দিক আছে সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করতে পারি।

প্রাচীনকালের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করত। যেমন— শিকার, মাছধরা ইত্যাদি। তারা গাছ থেকে ফল, বীজ, সুপারি বা বাদাম, রসযুক্ত ফল, কন্দ ইত্যাদি সংগ্রহ করত। কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র। আমরা যথেষ্ট পরিমানে হাড়ের জীবাশ্ম পেলেও সেই অনুপাতে গাছের জীবাশ্ম খুব কম পাওয়া যায়। গাছের ব্যাপারে জানার আর একটি উপায় হল, যখন গাছগুলো কোন কারণে পুড়ে যায় তখন কার্বন তৈরী হয়, এই জৈব পদার্থ দীর্ঘদিন থাকে তার থেকেই গাছের বিষয়ে অনেককিছু জানা যায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীনকালের ইতিহাস লিখার জন্য যথেষ্ট পরিমানে কার্বনযুক্ত বীজের সন্ধান পাননি।

বর্তমানে পণ্ডিতরা শিকার শব্দটি নিয়ে অধিক আলোচনা করেন। তাতে অনুমান করা হয়, প্রাচীন মানুষেরা খাদ্যের (মাংস ও মজ্জার) অন্বেষনে বের হয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে মৃত বা শিকারীর হাতে মৃত-পশুপক্ষীর মাংস সংগ্রহ করত। প্রাচীনকালের মানুষেরা বিভিন্ন ছোটছোট প্রাণী যেমন-স্তন্যপায়ী জীব, ইঁদুর, পাখী ও তার ডিম, পোকা-মাকড় ইত্যাদি খেত।

*Foraging means to search for food.

শিকার আরম্ভ হয় প্রায় ৫,০০,০০০ বৎসর পূর্বে। পরিকল্পনা করে শিকার এবং নিষ্ঠুর ভাবে বড় স্তন্যপায়ী জীব হত্যা করা শুরু হয়েছিল দুই দিক থেকে ঃ- দক্ষিণ ইংলণ্ডের বক্সগ্রোভ (Boxgrove) এ প্রায় ৫০,০০০০ বৎসর আগে এবং জার্মানীর স্কনিংজেনে (Schoningen) প্রায় ৪০০০০০ বৎসর পূর্বে। মাছধরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে মাছের হাড় আবিষ্কারের পর।

মানচিত্র নং - ২ : **ইউরোপ**

প্রায় ৩৫০০০ বৎসর পূর্বে পরিকল্পিত শিকারের দৃষ্টান্ত ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। যেমন চেক প্রজাতন্ত্রের দলনি ভেষ্টলাইস (Dwlni Vestonise), নদীতীরবর্তী এই স্থানটি প্রাচীন মানুষ শিকারের জন্য বেছে নিয়েছিল। শরৎ ও বসন্তকালে যখন অধিক সংখ্যক হরিণ ও ঘোড়া নদীপার হয়ে অন্য যায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করত তখন বেশীর ভাগ মানুষের হাতে মারা পড়ত। ঐ সকল স্থান চিহ্নিত করতে পারায় বুঝা যায় যে তখনকার মানুষ ঐ সকল প্রাণীর গতিবিধি জানত এবং তাড়াতাড়ি অধিক সংখ্যক প্রাণী হত্যা করার প্রক্রিয়াও তাদের জানা ছিল। স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে শিকার, খাদ্য আহরণ, পাখি ও, মাছ ধরার ক্ষেত্রে কি পৃথক ভূমিকা ছিল? সেটা আমাদের জানা নেই। বর্তমান মানব সমাজে যারা শিকার করে বা খাদ্য সংগ্রহ করে তাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকে। এই বিষয়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্ত পৌছানো সব সময় সম্ভব হয় না— পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হবে।

প্রাচীন মানব

গাছ থেকে গুহা ও খোলা আকাশের নীচে

বিভিন্ন ধরনের বাসস্থানগুলো ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটি ইতিহাস লিখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। আরও একটি পদ্ধতি হল মানুষের তৈরী জিনিষগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সাজিয়ে রেখে তা থেকে ও মানুষের ইতিহাস বের করে আনা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেনিয়ার (Kenya) কিলম্বে (Kilombe) এবং ওলরগেসাইলি (Olorgesaile) তে খননকার্য্য দ্বারা ৭০,০০০০ এবং ৫০,০০০০ বৎসরের পুরাতন প্রায় হাজারো কুড়াল ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

চিত্র

Left : The siteof Olorgesailie. The excavators, Mary and Louis Leakey, had a catwalk built around the site for observers. Above : A close-up of tools found at the site, including hand axes.

কীভাবে যন্ত্রাদি একটি জায়গায় জড়ো হয়েছিল? এটা সম্ভব হয় এইভাবে কিছু কিছু স্থানে, যেখানে খাদ্যবস্তু যথেষ্টপরিমানে ছিল সেখানে মানুষ বারবার যেত। এই সব মানুষের তৈরী জিনিসপত্রের দ্বারাই তাদের উপস্থিতি ও কাজকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের জিনিসগুলি আবার স্থলভাগের উপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যেত। যে সব জায়গায় মানুষের যাওয়া যাওয়া আসা কম ছিল সেই সব স্থানে তাদের জিনিষপত্র ও কম থাকতো।

এটা মনে রাখা দরকার যে একই স্থানে হমিনিডস্ (Hominids), বানর ও মাংসাশী প্রাণীদের দেখা যেত। কীভাবে সেটা সম্ভব হত তা নীচের চিত্রে দেখানো হল—

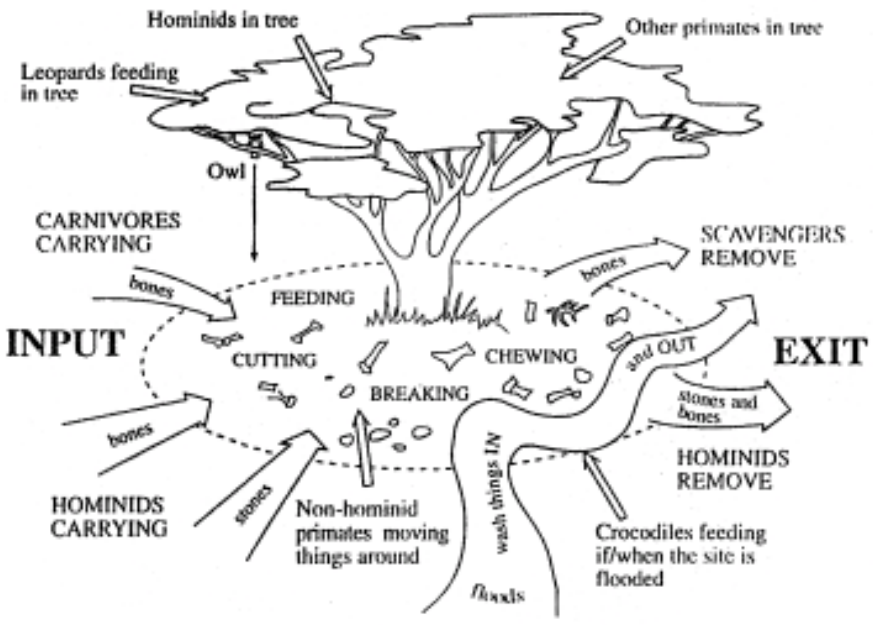

প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে প্রাচীন মানবেরা বিশেষ করে Homo habilis রা সম্ভবত যা পেত, তাই খেত। তারা বিভিন্ন স্থানে শুয়ে থাকত এবং বেশীর ভাগ সময়ই গাছে থাকত। কীভাবে হাঁড় ঐ সকল স্থানে পৌছায়? কীভাবে পাথরগুলো এলো? হাঁড়গুলি কি অক্ষত থাকেছে?

Artefacts are objects that are made by human beings. The term can refer to a wide range of things – tools, paintings, sculpture, engravings.

কুড়ে ঘরের চিত্র

৪০০০০০ থেকে ১২৫০০০ বৎসর পূর্বে গুহা এবং খোলা আকাশের নীচ মানুষ ব্যবহার করত। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দক্ষিণ ফ্রান্সের Lazaret গুহাটি (গুহার দেওয়ালের বিপরীতে) তৈরী করা হয়েছিল যার আয়তন ছিল ১২x৪ মিটার। এর ভিতরে দুটি অগ্নিকুণ্ড এবং অনেক ধরনের খাদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন— জল, ফল, শবজি, বীজ, বাদাম, পাখীর ডিম, মাছ ট্রাউট (Trout) পারছ (Perch) ইত্যাদি।

দক্ষিণ ফ্রান্সের তেরা আমাটা (Terra Amata) নামক উপকূলে বিভিন্ন ঋতুতে স্বল্পকাল থাকার জন্য ঘাস ও কাঠ দিয়ে সাধারণ বাসস্থান তৈরী করা হত।

তেরা আমাটা (Terra Amata) একটি পুন:নবীকরণ করা কুড়েঘর। ঘরটির ভার বহন করার জন্য বড় বড় বোল্ডার ব্যবহার করা হয়েছে। ছোটপাথর মেঝেতে রাখা হয়, যেখানে মানুষ পাথর দ্বারা যন্ত্র তৈরী করত। পিছন দিকে একটি তীরের মত দাগ করে দেখানো হয়েছে যে এখানে একটি অগ্নিকুণ্ড আছে। গাছে যারা বাস করত তাদের থেকে যারা ঐ সকল কুড়েঘরে বাস করত তাদের জীবনের কী পার্থক্য তুমি লক্ষ্য কর?

কেনিয়ার, চেসোওয়ানজাতে (Chesowanja) দক্ষিণ আফ্রিকার, Swartkran তে ১.৪ এবং ১ mya সময়ের মধ্যে কাঁদামাটি এবং পোড়া হাড়ের সঙ্গে পাথরের যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়েছে। সেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নিউৎপাতের জন্য, না জঙ্গলে আগুন লাগার জন্য এগুলো ঘটে ছিল, অথবা উদ্দেশ্য মূলকভাবে তারা কি জঙ্গলে আগুন দিত তা আমরা সঠিকভাবে জানি না।

অন্যদিকে অগ্নিকুণ্ডের আগুনকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। এতে অনেক সুবিধাও ছিল। আগুন গুহার মধ্যে আলো দিত, গুহা গরম রাখত এবং রান্নার কাজেও ব্যবহার করা হত। তাছাড়া বল্লমের অগ্রভাগে কাঠ লাগানোর সময়ও আগুনের ব্যবহার হত। যন্ত্রাদি, অস্ত্রসস্ত্র তৈরী করতেও আগুনের প্রয়োজন হত, তাছাড়া ভয়ানক পশুদের ভয় দেখিয়ে বিতাড়নের সময় ও আগুনের ব্যবহার করা হত।

প্রাচীন মানব ঃ তাদের তৈরী যন্ত্রাদি

এটা স্মরণ করা প্রয়োজন যে যন্ত্রাদির ব্যবহার এবং তৈরী করা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাখিরাও বিভিন্ন জিনিস তৈরী করতে জানত এবং এগুলি তাদের খাওয়ার সময় সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তাদেরকে সাহায্য করত। শিম্পাজিরা যখন খাদ্যের অন্বেষণ করত তখনও তারা নিজেদের তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করত।

কিন্তু মানুষের অস্ত্র তৈরীর কৌশল বানরের জানা ছিল না। দেখা যায় কিছু সংখ্যক শব বিজ্ঞানী ও শিরা বিষয়ক বিজ্ঞানী শিরাগুলিকে কর্মক্ষম ও উপযোগী করার সময় দক্ষ হাতের ব্যবহার করতেন। সেই সময়ে মানুষের দক্ষতা ও স্মরণশক্তি ছিল বলেই মানুষ অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারতো। মানুষের এই দুটি বিশেষ গুণ বানরের মধ্যে ছিল না।

কেনিয়া ও ইথিওপিয়ায় এই সব পাথরের যন্ত্রাদির তৈরী ও ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অষ্ট্রোসপিথেকাথ প্রাচীনতম অস্ত্র তৈরী করেছিল। কিন্তু অস্ত্র তৈরীতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে অংশ গ্রহণ করত কি না তা সঠিকভাবে আমরা জানি না। স্ত্রী লোকেরা নিজের খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য, স্তন্যপান ছেড়ে দেওয়ার পর শিশুদের খাদ্য জোগানের জন্য যন্ত্রাদি তৈরী করে তা ব্যবহার করত।

প্রায় ৩৪০০০ বৎসর পূর্বে নূতন ধরনের অস্ত্রের আবিষ্কারের ফলে জীবজন্তু হত্যার কৌশলে ও পরিবর্তন আসে। এই নূতন ধরনের অস্ত্রাদি হল বর্শা, তীর, ধনুক ইত্যাদি। মাংস থেকে হাড় বের করে ধোঁয়া দিয়ে শুকিয়ে সংরক্ষিত হত, পরবর্তী সময়ে খাওয়ার জন্য এই পদ্ধতিতেই সঞ্চয় করে রাখা হত।

সেই সময় অন্যান্য কিছু পরিবর্তন ও এসেছিল। যেমন— পশুর চামড়া কাপড় হিসাবে ব্যবহার করা, সেলাই এর জন্য সূচ আবিষ্কার ইত্যাদি। ২১০০০ বৎসর পূর্বে সেলাই করা কাপড় আবিষ্কৃত হয় বলে দৃষ্টান্ত আছে। অধিকন্তু ছাপ মারার যন্ত্র প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বাটালী ও তৈরী হয়। ফলে হাড়ের উপর, হাতীর দাঁত বা কাঠের উপর খোদাই করা সম্ভব হয়েছিল।

একজন বল্লমধারী। তার বল্লমের বাঁকা হাতলের দিকে তাকাও। একটি বল্লম দ্বারা দূর থেকে একজন শিকারী শিকার করতে পারে। ইহা ব্যবহারে সুবিধার ব্যাপারে তুমি কি কোন পরামর্শ দিতে পার?

THE PUNCH BKLADE TECHNIQUE

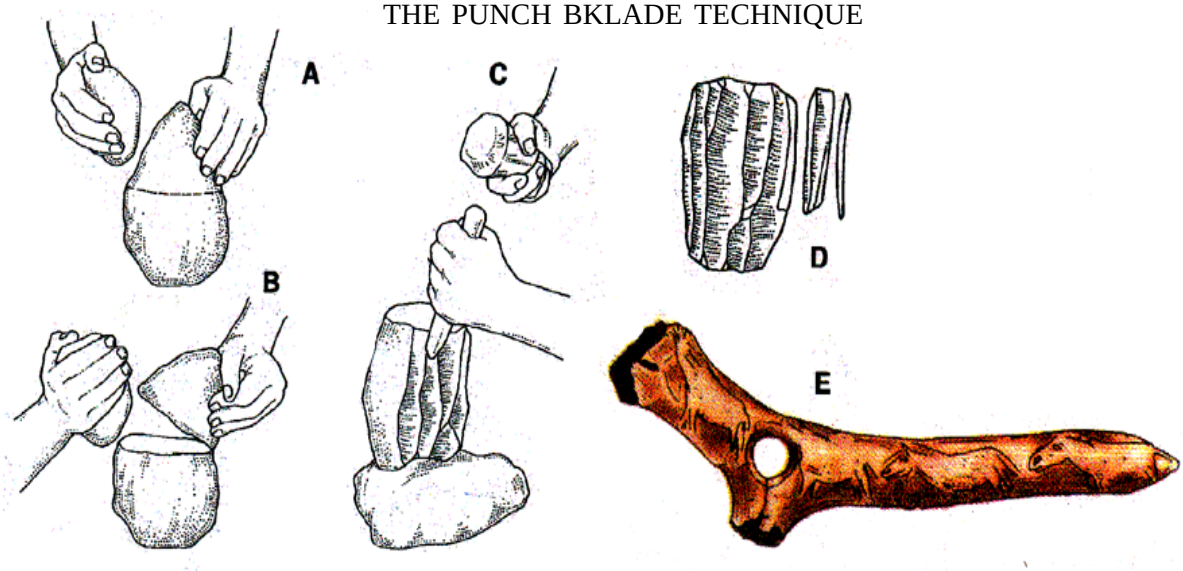

(a) The top of a large pebble is removed using a hammer stone.
(b) This produces a flat surface called the striking platform.
(c) This is then struck using a hammer and a punch, made of bone or antler.
(d) This leads to the production of blades that can be used as knives, or modified to serve as chisels or burins which could be used to engrave hone, antler, ivory or wood.
(e) An example of engraving on bone. Note the drawings of animals on it.

যোগাযোগের মাধ্যম : ভাষা ও চিত্রকলা

জীবিত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষের ভাষা আছে। ভাষার উন্নতির ব্যাপারে বিভিন্ন মতবাদ আছে— (১) হমিনিড ভাষা হস্ত চলানা এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্যে ছিল। (২) কথা বলার পদ্ধতি প্রচলন হওয়ার পূর্বে গুনগুনানিতে এবং গানের মধ্যেই ভাষা সীমিত ছিল। (৩) মানুষের কথা বলা সম্ভবতঃ আরম্ভ হয়েছিল ডাক থেকে, যেটা অন্যান্য মানুষ খেয়াল করত। মানুষ সম্ভবতঃ কম শব্দ দ্বারা প্রথমদিকে কথা বলত। ক্রমশঃ এগুলি ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

এবার আলোচনা করব কথা বলার প্রচলনের বিষয়ে। এতে বলা হয়েছে মানুষের (Homo habilies) সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্যে তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং ভাষার উন্নতি হয়েছে ২ mya তে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে স্বর সম্বন্ধীয় ক্রমবিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তনগুলো প্রায় ২০০০০০ বৎসর পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। সুদীর্ঘ বৎসর ধরে মানুষের ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হয় এবং তারই ফলশ্রুতি আধুনিক মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি।

ভাষা ও চিত্রকলার উন্নতি প্রায় একই সাথে ঘটে। এটা প্রায় ৪০০০০—৩৫০০০ বৎসর পূর্বে ঘটেছিল।

ভাষার সাথে কলা কৌশলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যেহেতু উভয়ই যোগাযোগের মাধ্যম।

আলতামিরার গুহার চিত্র

Cave Painting at Altamira

স্পেনের একটি গুহাচিত্র আলতামিরা। গুহার ছাঁদের ভিতরের দিকের চিত্রটি প্রথম এক শিশুর নজরে আসে, সে মার্সেলিনো সানজ্‌দে দি সউতুলা (Marcelino Sanzde Sautuola) নামক একজন স্থানীয় জমিদার এবং একজন পেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিকের কন্যা। ১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন তিনি গুহার মেঝেতে একটি গর্ত খনন করছিলেন। তখন মেয়েটি এদিক ওদিক খেলে বেড়াচ্ছিল। হঁঠাৎ মেয়েটি ছাঁদের উপর কিছুটা চিত্রাঙ্কন দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে বাবাকে বলে, 'বাবা দেখ 'ষাঁড়'। তার কথা শুনে প্রথমে তারা বাবা হেঁসেছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন যে এখানে চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রং এর পরিবর্তে এক ধরনের আঠা লাগানো আছে। পরের বৎসর তিনি একখানা পুস্তিকা বের করেন। কিন্তু প্রায় দুই দশকের মধ্যেই তার সমস্ত বিষয় (Findings) ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাতিল করে দেন এই বলে যে এগুলি খুব পুরাতন নয়।

৩০০০০ থেকে ১২০০০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের লাসকো ও সৌভেত এর চৌডেট এবং স্পেনের আলতামিরায় শত শত জন্তুর চিত্র আবিষ্কৃত হয়। এইগুলির মধ্যে ছিল ঘোড়া, বন্য ছাগল, গণ্ডার, সিংহ, ছাগল, চিতাবাঘ, হায়েনা, বাইসন, পেঁচা ইত্যাদি।

এই সকল চিত্রাঙ্কনের বিষয়ে অনেক প্রশ্নই জাগে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— কেন গুহার কিছু অংশে চিত্রাঙ্কন আছে আবার কিছু অংশে নেই? কেন কিছু সংখ্যক জন্তুর চিত্র আঁকা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের হয়নি? কেন মানুষকে একাকি বা দলবদ্ধভাবে আঁকা হয়েছে অথচ স্ত্রীলোকের শুধু দলবদ্ধ চিত্র আঁকা হয়েছে? মানুষদের জন্তুর পাশে আঁকা হয়েছে কিন্তু স্ত্রীলোককে নয় কেন? যেখানে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় সেখানেই কেন দলবদ্ধভাবে জন্তুর চিত্র আঁকা হয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর কিছুটা ব্যাখ্যা ও দেওয়া হয়েছে। তার একটি বড় কারণ শিকারের উপর গুরুত্ব দেওয়া। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও যাদুবিদ্যা পশু চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে জড়িত ছিল। পশু শিকারে কৃতকার্য হওয়ার জন্য শিকারীরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করত। একটি কুড়েঘরকে সুন্দর করতে এ ধরনের অঙ্কন করা হত। আবার এরকম ব্যাখ্যা ও করা হয় যে মানুষের বিভিন্ন দল এই গুহাগুলোকে সভাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করত। এই দলগুলো তাদের শিকারের কৌশল ও জ্ঞান পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করত। এই চিত্রগুলি ও নক্সা খোদাইয়ের দ্বারা তারা পরবর্তী প্রজন্মকে শিকার বিষয়ক কলা কৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান দান করত। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন মানব সমাজের বিষয়ে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়। তবে আমরা অনেককিছু এখনও পরিষ্কার ভাবে জানি না। এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে যে শিকারি মানবের কথা আলোচনা করা হয়েছে তারা বর্তমান দিনেও আছে। বর্তমান দিনের শিকারি মানব থেকে তোমরা কি কিছু জানতে পার? এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

আফ্রিকার প্রাচীন শিকারী — সংগ্রহকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

Early Encounters with Hunter Gatherers in Africa

১৮৭০ খৃঃ কালাহারী (Kalahari) মরুভূমিতে বসবাসকারী শিকারি মানবের সঙ্গে আফ্রিকান গ্রামের Kung Sam নামক এক মেষ পালকের প্রাথমিক সাক্ষাতের বিবরণটি নিম্নে দেওয়া হল—

'আমরা যখন এই অঞ্চলে প্রথম আসি তখন কিছু বিস্ময়কর পদচিহ্ন বালুর মধ্যে দেখতে পাই। এরা কী ধরনের মানুষ, এটা ভেবে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে দেখে খুবই ভয় পায় এবং আমরা আসার সাথে সাথে তারা লুকিয়ে পড়ে। আমরা তাদের গ্রামগুলি দেখতে পাই, তবে এগুলি সর্বদা খালি ছিল। কারণ যখন কোন অপরিচিত বিদেশীকে তারা দেখতো তখনই ভয় পেয়ে কোন ঝোপে তারা লুকিয়ে থাকতো। আমরা বলেছিলাম, ভাল হয়েছে, এই লোকগুলো আমাদেরকে ভয় পায়, তারা দুর্বল এবং আমরা সহজে তাদের উপর আধিপত্য কায়েম করতে পারবো। সুতরাং, আমরা শুধু ওদের শাসন করবো। এখানে কোন যুদ্ধ বা হত্যা হবে না।

তোমরা ৮ এবং ১০ নং প্রসঙ্গে শিকার সংগ্রহকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়ে আর ও বেশী জানবে।

হাডজা (The Hadza)

হাডজা একটি ছোট শিকার সংগ্রহকারী দল তারা রিপ্ট উপত্যকার ইয়াসির নামক লবনাক্ত হ্রদের নিকটে বাস করত। পূর্বে হাডজা নামক দেশটি ছিল শুষ্ক, শিলাযুক্ত, কন্টাকাকীর্ণ ঝোপ ও একাশিয়া গাছে এবং বন্য ফলমূলে পরিপূর্ণ একটি উন্নত অঞ্চল। শতাব্দির প্রথমদিকে যেখানে হাতি, গণ্ডার, মহিষ, জিরাফ, গেজেল, মৃগ, বানর, চিতাবাঘ ও হায়না ছাড়াও কিছু ছোট জীবজন্তু যেমন শজারু, খরগোশ, শৃগাল, কচ্ছপ ইত্যাদি ছিল। হাতি ছাড়া সকল জীবজন্তুই শিকার করে তারা খেত। তারা পরিমিত মাংস খেত যাতে ভবিষ্যতে মাংস খাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। এই চিন্তা ভাবনা পৃথিবীর কোন প্রাচীন শিকার সংগ্রহকারী বা বর্তমান শিকার সংগ্রহকারী করত না।

নিরামিশ খাদ্য— গাছের মূল, রসাল ফল ইত্যাদি ছিল যথেষ্ট পরিমানে ও সেগুলির খরার বৎসরে ও অভাব হত না। বৎসরের শুকনো মরশুমে, বৃষ্টির দিনেও যথেষ্ট খাদ্য থাকতো। তবে বিভিন্ন ঋতুতে এবং ভিন্ন বৎসরে এ সমস্ত খাদ্য বস্তুর যোগানের পরিমাণে পার্থক্য দেখা দিত।

জলের উৎস দেশের সর্বত্র সমান ছিল। শীতের মরশুমে একটু কম থাকত। মানুষ বিশ্বাস করত যে সর্বাধিক ৫ থেকে ৬ কিঃমিঃ জল বহন করে নেওয়া সম্ভব। তবে প্রায় ১ কিঃমিঃ মধ্যেই জল ছিল।

সেখানে খোলা ঘাসযুক্ত সমতল অঞ্চল ছিল। কিন্তু ঐ সকল স্থানে লোক বসবাস করতনা। গাছ বা শিলার পাশে তারা বাস করত।

পূর্ব হাডজাতে জমি ও সম্পত্তির উপর তাদের কোন অধিকার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। যে কোন লোক যে কোন স্থানে বাস করতে পারতো, পশু শিকার করতে পারতো। কোন বাধা ছাড়াই ফলমূল, মধু ও জল তারা সংগ্রহ করতে পারত।

তাদের অঞ্চলে যথেষ্ট জন্তু জানোয়ার থাকা সত্ত্বেও তারা শাকসবজি খেতেই ভালবাসত। তাদের খাদ্যে ৮০% ছিল শাকসবজি এবং বাকি ২০% ছিল মাংস ও মধু।

যদি ও তাবুগুলি ছিল ছোট তবু ও গরমের দিনে সেগুলি থাকত চারিদিকে ছড়ানো। শুকনো দিনে জলের ব্যবস্থা থাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তারা বাস করত। শুকনো দিনেও তাদের খাদ্যের অভাব থাকত না।

উপরের অংশটি জেমস্ উডবার্ণ (১৯৬০ সালে) নামক একজন নৃতত্ত্ববিদ এর লিখা।

শিকারী সংগ্রহকারী সমাজ
অতীত থেকে বর্তমান

নৃতত্ত্ব বিষয়ে পড়ে আমরা আমাদের বর্তমান জগতের শিকারী ও সংগ্রহকারীদের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারি। একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে অতীত সমাজকে বুঝতে বর্তমান

শিকারী ও সংগ্রহকারী সমাজকে ব্যবহার করা যায় কি? এই ব্যাপারে দুটি পরস্পর বিরোধী মত আছে।

একদিকে আমাদের পণ্ডিতরা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানের শিকারী ও সংগ্রহকারী সমাজের উপর নির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োগ করে। অতীতের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। যেমন— একদল প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে দুই ২ mya তে হমিনিডদের শুষ্ক দিনের বাসস্থান ছিল লেইক তুর্কানা। কারণ হাড্ডা ও কুংসান (Kung San) এর মধ্যে ও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আর একদল প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে বর্তমান মানবজাতির বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ প্রাচীন সমাজকে বুঝতে ব্যবহার করা যায় না কারণ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বর্তমান সময়ের শিকারী ও সংগ্রহকারী সমাজ শিকার সংগ্রহ ছাড়াও অন্যান্য অর্থকরী কাজকর্ম ও করে। যেমন— পণ্য আদান প্রদান, ছোট ছোট ব্যবসা বাণিজ্য, পার্শ্ববর্তী কৃষকের জমিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করা। এই সমাজগুলো ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অনুন্নত ছিল। বর্তমান সময়ে তারা যে অবস্থায় বাস করছে তার সঙ্গে প্রাচীন মানুষের জীবনধারার খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর একটি সমস্যা হল বর্তমানের শিকারী ও সংগ্রহকারী সমাজের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত তাদের দলের আয়তন, একস্থান থেকে থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার প্রবণতা, শিকারী ও সংগ্রহ এই সব বিষয়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ও ভিন্নতা দেখা যায়।

Ethnograsphy is the study of contemporary ethnic groups. It includes an examination of their modes of livelihood, technology, gender roles, rituals, political institutions and social customs.

খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে শ্রম বিভাজন সম্পর্কে মতানৈক্য ছিল না। যদি ও বর্তমানে স্ত্রীলোকেরা খাদ্য সংগ্রহ এবং পুরুষেরা শিকার করে তবে অনেক সমাজ আছে যেখানে স্ত্রীপুরুষ উভয়ই খাদ্য সংগ্রহ, শিকার ও হাতিয়ার তৈরী করত। আবার অনেক সমাজে স্ত্রীলোকেরা যে খাদ্যের যোগান দেয় তার গুরুত্ব ও অস্বীকার করা যায় না। যদি ও কিছু ব্যতিক্রম আছে তবু ও বর্তমান শিকারী ও সংগ্রহকারী স্ত্রী এবং পুরুষ সমানভাবে দায়িত্ব পালন করে। যখন এটা বর্তমান যুগের বিষয় এবং তা থেকে অতীতের ব্যাপারে অনুমান করা খুবই কঠিন।

উপসংহার

লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ মানুষ বন্যপশু শিকার করে এবং বন্য শাকসবজি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ১০০০০—৪৫০০ বৎসর পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে শুরু করে। এইভাবেই কৃষি এবং পশুপালন মানুষের জীবিকা হয়ে উঠে। খাদ্য অন্বেষণ থেকে চাষের কাজে নিয়োজিত হওয়াই মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ সময়ে এই পরিবর্তন কেন ঘটলো?

Activity 4

What do you think are the advantages and disadvantages of using ethnographic accounts to reconstruct the lives of the earliest peoples?

১৩০০০ বৎসর পূর্বে বরফ যুগের সমাপ্তি ঘটে তখন এই সব অঞ্চল আর্দ্র ও গরম হয়ে উঠে। যার ফলে ঐ সব অঞ্চলে ঘাস, বন্য বার্লি, গম চাষের উপযোগী হয়ে উঠে। একই সময় ঘাস ও জঙ্গলের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বন্য ভেড়া, ছাগল, গরু, শুকর ও বানরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যেখানে ঘাসের প্রাচুর্য্য ও জন্তু জানোয়ারের সংখ্যা বেশী সেখানেই মানুষ বসবাস করতে পছন্দ করত। সংখ্যাগরিষ্ঠ, স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষ ঐ সব অঞ্চলে নিজেদের দখলে রাখত। জনবসতি বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা ও বেড়ে যায়। ফলে বাড়ীতে বৃক্ষরোপণ ও পশুপালন আরম্ভ করে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, জলবায়ুর চাপ এইসব উপাদানের জন্য মানুষ গম, বার্লি, ধান, জোয়ার ইত্যাদি চাষ শুরু করে এবং ভেড়া, ছাগল, গরু, গাঁধা, শূকর ইত্যাদি পালন আরম্ভ করে। সেখানে প্রায় ১০,০০০ বৎসর পূর্বে

চাষাবাদ শুরু হয়। চাষাবাদ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থায়ীভাবে একই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা ঐ গ্রামগুলোর কথা জানতেন। চাষাবাদ ও পশুপালন সমাজে অনেক পরিবর্তন আনে। যেমন, মানুষ নানা রকমের পাত্র তৈরি করে শস্য এবং অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য ও রান্না করা খাওয়ার রাখতে আরম্ভ করে। নূতন ধরনের পাথরের তৈরী হাতিয়ার যেমন কৃষিকার্য্যে লাঙ্গলের ব্যবহার এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও পাত্র তৈরীর কাজে চাকার ব্যবহার আরম্ভ হয়। ক্রমশ ধাতু যেমন তামা ও টিনের ব্যবহার শুরু হয়। শহরে অধিকসংখ্যক লোকের বসবাস প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়। এটা কেন ঘটলো? নগর ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য কি ছিল? এগুলোর উত্তর ও অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গ দুই তে দেখ।

সময় সূচি -১ (mya)	
২৪ mya	প্রাইমেইটস্ এশিয়া ও আফ্রিকাতে বানর সমূহ—
২৪ mya	(Super family) হমিনয়েড, গিব্বনস্, এশিয়ান অরাং উটন এবং আফ্রিকার বানর (গেরিলা, শিম্পাঞ্জি এক্ বানর অথবা পাগ্মী শিম্পাঞ্জি।
৬.৪ mya	হমিনয়েড এবং হমিনিডস্ এবং বিভক্তি।
৫.৬ mya	অষ্ট্রেলপেথিকাস্
৫.৬-২.৫ mya	প্রাচীনতম পাথরের অস্ত্র সমূহ
২.৫-২.০ mya	ঠাণ্ডা এবং শুকিয়ে যাওয়া আফ্রিকা, ফলস্বরূপ বনভূমি কমে তৃণভূমির আয়তন বৃদ্ধি।
২.৫—২.০ mya	হোমো (মানুষ)
২.২ mya	হোমো হেবিলিস
১.৮ mya	হোমো ইরেক্টাস
১.৩ mya	অস্ ট্রেল পেথিকাসের / বিলুপ্তি
০.৮ mya	আর্চিক সেপিয়ান, হোমো হেইডেনবার্গ জেনসিস্
০.১৯—০.১৬ mya	হোমো সেপিয়ানস্ সেপিয়ানস্ (আধুনিক মানব)

সময়সূচি - ২ (বৎসরের পূর্বে)	
প্রাচীনতম সমাধিস্থলের প্রমাণ	৩০০,০০০
হমোইরেক্টাসের বিলুপ্তি	২০০,০০০
ভয়েজ বক্সের উন্নতি	২০০,০০০
ভারতের নর্মদা উপত্যকায় আর্কেয়িক হোমো সেপিয়ানের মাথায় খুলি	২০০,০০০-১৩০,০০০
আধুনিক মানবের অবির্ভাব	১৯৫,০০০-১৬০,০০০
নিয়ান্ডারথেল - এর আবির্ভাব	১৩০,০০০
প্রাচীনতম অগ্নিকুণ্ডের প্রমাণ	১২৫,০০০
নিয়েনডারথেলের বিলুপ্তি	৩৫,০০০
মাটিকে আগুনে পুড়িয়ে প্রাচীন মুর্তি তৈরীর প্রমাণ	২৭,০০০
সূঁচের আবিষ্কার	২১,০০০

রিপ্ট উপত্যকা
পূর্ব আফ্রিকা

অনুশীলন

সংক্ষেপে উত্তর দাও—

১। তালিকার দিকে তাকাও। হাতিয়ার তৈরীর একটি তালিকা তৈরী কর। হাতিয়ার তৈরী করায় মানুষের কী কী বিষয়ে সুবিধা হয়েছিল?

২। মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীব যেমন বানর এবং গরিলা এর মধ্যে ব্যবহার ও দৈহিক গঠনে কিছুটা মিল আছে। সম্ভবত বানর থেকেই মানুষের সৃষ্টি। তুমি ওদের ব্যবহার ও দৈহিক গঠনের সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে দুটি তালিকা তৈরী কর। তুমি কি মনে কর তাদের মধ্যে কিছু সবিশেষপার্থক্য আছে ?

৩। মানুষের উৎপত্তিতে আঞ্চলিক অবিচ্ছিন্নতার আদর্শের স্বপেক্ষে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা আলোচনা কর। তুমি কী মনে কর এটা পুরাতত্ত্ব গত প্রমাণকে সন্দেহাতীত ভাবে ব্যাখ্যা করে?

৪। (ক) সংগ্রহ, (খ) হাতিয়ার তৈরি এবং (গ) আগুনের ব্যবহার এই তিনটির মধ্যে কোনটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল?

নাতি দীর্ঘ উত্তর দাও—

৫। ভাষার ব্যবহার (ক) শিকার ও (খ) আশ্রয়স্থল নির্মাণ কার্য্যে কী ভাবে সাহায্য করিয়াছিল, আলোচনা কর। ভাষা ছাড়া ভাব আদান প্রদানের জন্য অন্য কী মাধ্যম ব্যবহার করা যেত?

৬। অধ্যায়ের শেষাংশে সময় সূচি (১) এবং (২) থেকে যে কোন দুটি পর্যায় বেছে নাও এবং এগুলোকে তুমি কেন গুরুত্বপূর্ণ মনে কর তা প্রকাশ কর?

প্রসঙ্গ ২

লিখন পদ্ধতি ও নগর জীবন

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যভাগে মেসোপটেমিয়ায় নগরজীবনের সূত্রপাত হয়। মেসোপটেমিয়া বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ইরাক এর অংশ। সমৃদ্ধি, নগরজীবন, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ও প্রাচীন বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের জন্য মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা বিখ্যাত। ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বের পর উত্তর সিরিয়া, তুর্কি এবং ভূমধ্যসাগরীয় দেশে মেসোপটেমিয়ার লিখন পদ্ধতি ও সাহিত্যের বিস্তার ঘটে। এই সব অঞ্চলের শাসকেরা একে অন্যের সঙ্গে এমন কি মিশরের ফারাওদের সঙ্গেও এই মেসোপটেমিয়ার অক্ষর ও ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যে সময় থেকে ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে নথিভূক্ত করা হয়, সেই যুগে ঐ অঞ্চলটিকে সুমের বা আক্কাদ (Akkad) বলা হত। ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যখন অ্যাসিরিয়ানরা (Assyrians) উত্তরে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে তখন থেকে ঐ অঞ্চলের নাম হয় অ্যাসিরিয়া (Assyria)। যতদূর জানা যায়, এই অঞ্চলের প্রথম ভাষা ছিল সুমেরিয়ান। প্রায় ২৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যখন আক্কাদিয়ান (Akkadian) ভাষাভাষি মানুষ ঐ অঞ্চলে আসে তখন ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে সুমেরিয়ান ভাষার পরিবর্তে এই আক্কাদিয়ান ভাষা ব্যবহার হতে থাকে। আলেকজাণ্ডারের সময় পর্য্যন্ত (৩৩৬-৩২৩ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) এই ভাষার প্রচলন ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষায় আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটে। ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে অ্যারামিক (Aramic) ভাষারও ব্যবহার শুরু হয়। তবে হিব্রু ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যারামিক ভাষা ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর বহুলভাবে কথিত হতে থাকে। ইরাকের কিছু কিছু অংশে আজও এই ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

*মেসোপটেমিয়া নামটি গ্রীক শব্দ মেসোস (Mesos) অর্থাৎ মধ্যভাগ এবং (Potamos) পোটামোস অর্থাৎ নদী, এই দুয়ের সমন্বয়ে প্রাপ্ত।

১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার উর্ক (Uruks) ও মারি (Mari), এই দুটি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য আরম্ভ হয়। এই কাজ প্রায় কয়েক দশক ধরে চলে। অট্টালিকা, প্রতিমূর্তি, অলঙ্কারাদি, সীলমোহর ইত্যাদি ছাড়াও অজস্র লিখিত দলিল থেকে আমরা মেসোপটেমিয়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য পেয়ে থাকি।

ওল্ড টেস্টামেন্টে (অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম অংশে) মেসোপটেমিয়া সম্পর্কে উল্লেখ থাকায় ইউরোপীয়দের কাছে মেসোপটেমিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অফ জেনেসিস-এ 'Shimar' অর্থাৎ সুমের বলে একটি ইষ্টক নির্মিত নগর এলাকার বিবরণ আছে। ভ্রমণকারী ও ইউরোপের জ্ঞানী জনেরা মেসোপটেমিয়াকে তাদের আদি বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং সে এলাকায় প্রত্নত্তাত্ত্বিক খনন কার্য আরম্ভ হলে ওল্ড টেষ্টামেন্টের কথাগুলির সত্যতা প্রমাণ করার

চেষ্টা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে থেকেই প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস আবিষ্কারের প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এক বৃটিশ সংবাদ পত্র বাইবেলে বর্ণিত বন্যার গল্পের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য এক অভিযান আরম্ভ করে।

১৯৬০ সালে প্রমাণিত হয় যে বাইবেলে বর্ণিত এই সকল ঘটনা আক্ষরিক ভাবে সত্য না হলেও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো স্মরণীয় করে রাখবার প্রচেষ্টা মাত্র। ক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলোর উন্নতি ঘটল। অন্যান্য অনেক তথ্যের সঙ্গে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার বিষয়টিও প্রধান্য লাভ করে। বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সত্যতা নিরূপণের দিকটির গুরুত্ব হ্রাস পেল পরবর্তী গবেষণাগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের আলোচনা এগিয়ে যাবে।

পেইজ- ৩০

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত জীবকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে বন্যা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তবে ঈশ্বর বন্যার পর জীবন সকল রাখবার জন্য নোয়া নামক ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন। একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করে নোয়া ১ জোড়া করে সমস্ত প্রজাতির পশুপাখী এই নৌকাতে উঠিয়ে নিলেন। এ সমস্ত প্রাণী বন্যার পরে বেঁচে রইল। মেসোপটেমিয়ার পরম্পরাতেও এধরনের একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

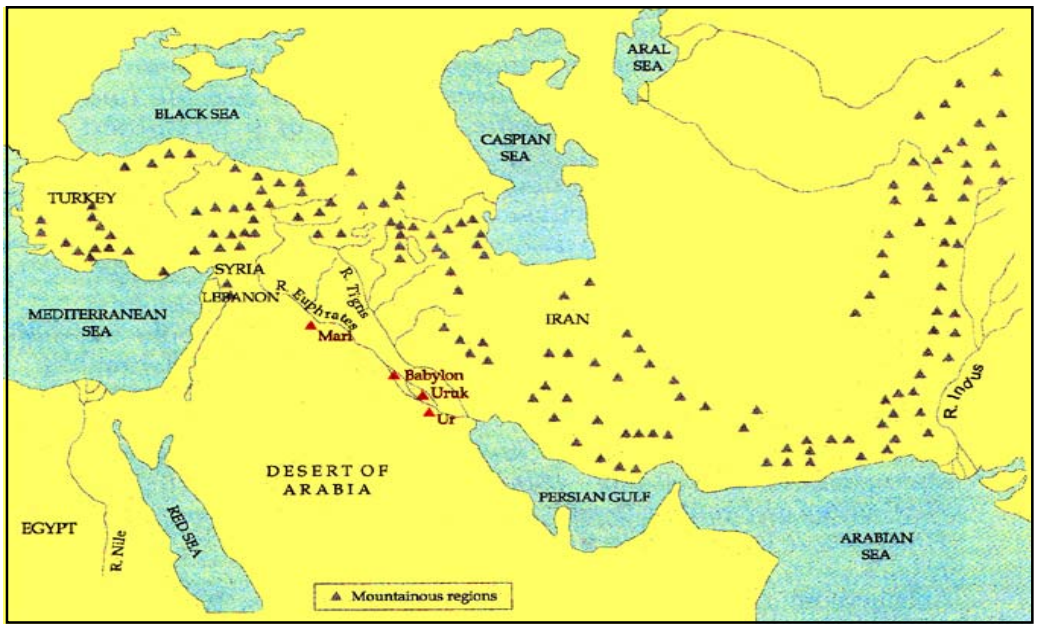

মানচিত্র - ১
পশ্চিম এশিয়া

কার্যক্রম - ১

অনেক সমাজে বন্যা সম্বন্ধে নানা মিথ্যা ধারণা প্রচলিত আছে। এ সমস্ত কাহিনীর মাধ্যমে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো স্মরণীয় করে রাখা হয়। এ সমস্ত কাহিনী যোগাড় করে বন্যার আগে ও পরে জীবনযাত্রার ধরণ সম্বন্ধে লক্ষ্য কর।

মেসোপটেমিয়া এবং তার ভৌগলিক পরিবেশ

ইরাকের প্রাকৃতিক পরিবেশ বহুবিধ। উত্তর পূর্বাঞ্চল সবুজ সমতলভূমি; ধীরে ধীরে উর্দ্ধমুখী হয়ে গাছ গাছড়ায় আবৃত পর্বতমালার দিকে এগিয়ে গেছে। সেখানে নদী, নালা, ফল, ফুল দেখা যায়। এখানকার প্রচুর পরিমান বৃষ্টিপাত কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। ৭০০০ থেকে ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এ অঞ্চলে কৃষিকাজ আরম্ভ হয়। উত্তরে বৃক্ষহীন প্রান্তর বিশেষে সেখানকার অধিবাসীরা পশুপালনের সুবিধা ভোগ করত। কৃষি কাজের চাইতে পশুপালনের উপার্জনের পরিমাণ ছিল বেশী। বৃষ্টিপাতের ফলে জন্মানো ঘাস ও গুল্ম থেকে পালিত ভেড়া ও ছাগলের খাদ্যের যোগাড় হত। পূর্বে টাইগ্রীস নদীর শাখানদী দিয়ে মানুষ ইরানের পর্বতমালা পর্য্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করত। দক্ষিণে ছিল মরুভূমি সেখানেই নগরী ও লিখন পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাহিত ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর মধ্যভাগে প্রতি বৎসর বন্যায় পলি মাটি জমে জমি উর্বরা হত।

ইউফ্রেটিস্ নদী মরুভূমিতে প্রবেশ করার পর ছোট ছোট ধারায় তার জল ছড়িয়ে পড়ত। ফলে এই নদীর বন্যায় এই সমস্ত অঞ্চলও প্রভাবিত হত। তাছাড়া জলধারাগুলো সেচের কাজে ব্যবহৃত হত। ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গম, বার্লি, মটরশুটি, মসুর ডাল উৎপন্ন হত। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে শষ্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট বৃষ্টিপাত না হলেও প্রাচীন সমস্ত সাম্রাজ্যের তুলনায় ঐ অঞ্চল ছিল সবচাইতে

মানচিত্র: ২ মেসোপটেমিয়া : পাহাড়, সমভূমি, মরুভূমি, দক্ষিণের জলসেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল।

বেশী। উর্বরা শুধু কৃষি নয়, সে সকল অঞ্চলে ভেড়া ও ছাগল পালনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ মাংস, দুধ, পশম পাওয়া যেত। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের নদীতে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যেত এবং গ্রীষ্ম কালে সেখানে প্রচুর খেজুর উৎপন্ন হত। তবে শুধুমাত্র যে গ্রামীণ সমৃদ্ধির ফলে নগরায়ন ঘটেছিল এমন ভাবনা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা প্রথমেই নগর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে পরে ধীরে ধীরে নগরায়নের অন্যান্য কারণগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব।

নগরায়নের তাৎপর্য্য

শুধুমাত্র অধিক সংখ্যক জনগণ অধ্যুষিত স্থানকেই শহর বা নগর বলে না। যখন খাদ্য উৎপাদনের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে, তখনই মানুষ শহর এলাকায় জড়ো হয়। খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও শহরের অর্থনীতির উপাদান হল ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পের উৎপাদন ইত্যাদি। শহরাঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন পণ্য বা পরিষেবার জন্য গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপর নির্ভরশীল থাকে। উভয়ের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলেই গ্রামাঞ্চল ও শহরজীবন মসৃণ ভাবে চলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— একজন শীলমোহর খোদাইকার তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও রঙীন পাথর নিজে যোগাড় করতে পারে না। একজন যন্ত্রপ্রস্তুতকারক তার প্রয়োজনীয় ধাতু ও জ্বালানী অন্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। পণ্য প্রস্তুতকারকের ব্যবসায়ী দক্ষতা থাকে না, যার জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এই শ্রম বিভাজন নগরজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক সংগঠন শহরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শহরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত জ্বালানী, ধাতব পদার্থ, বিভিন্ন ধরণের পাথর, কাঠ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে আনা হয়। এজন্য বাণিজ্যিক সংগঠন ও গুদামের প্রয়োজন হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে যে সকল খাদ্য সামগ্রী শহরাঞ্চলে যোগান দেওয়া হয় সেগুলো গুদামজাত এবং বণ্টন করবার দায়িত্ব থেকে যায়। তাছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করার জন্য কিছু লোকের বা সংগঠনের প্রয়োজন হয়। একথা স্পষ্ট যে এই ধরণের ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর লোকের আদেশ অন্যরা পালন করে। নাগরিক অর্থনীতিতে লিখিত নথিপত্রের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম নগরী সৃষ্টি হয় ৩০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ব্রোঞ্জ যুগে। তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরী ব্রাঞ্জ একটি মিশ্র ধাতু। ব্রোঞ্জ ব্যবহার করবার অর্থ উল্লেখিত ধাতুগুলো দূর থেকে আনয়ন করা। কাঠের ও পুতির কাজ, পাথরের সীলমোহর তৈরী ইত্যাদি কাজের জন্য ধাতুর হাতিয়ার প্রয়োজন হত। মেসোপটেমিয়ার অস্ত্রশস্ত্রও ছিল ব্রোঞ্জ নির্মিত।

কার্যক্রম-২
ধাতুর ব্যবহার ব্যতীত নগরজীবন সম্ভব ছিল কি না আলোচনা কর।

The Warka Head (ওয়ার্কার মাথা)

এই চিত্রের স্ত্রীলোকের মাথাটি ৪০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে উর্কে সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই করা হয়েছিল। এর ভ্রু এবং চোখগুলি গাঢ় নীল, সাদা ও কালো রঙের মূল্যবান পাথর খচিত। অন্যকোন অলঙ্কারের জন্য সম্ভবতঃ মাথার উপরিভাগের অংশ খোদাই করা হয়েছিল। স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, থুতনি ও গালের অনিন্দ্য সুন্দর সামঞ্জস্যের জন্য এই ভাস্কর্যটির খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। এছাড়া যে শক্ত পাথরে মূর্তিটি খোদাই করা হয়েছে তাও অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে আনা হয়েছে।

এধরনের মূর্তি তৈরী করবার কাজে পাথর আমদানী করা থেকে শুরু করে আরও যে ধরনের কাজ জড়িত থাকে তার তালিকা প্রস্তুত কর ।

বিভিন্ন নগরীর মধ্যে জিনিষপত্রের চলাচল

যদি ও মেসোপটেমিয়া খাদ্য শষ্যে ভরপুর ছিল, তবুও খনিজ সম্পদ সেখানে ছিল খুব কম। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থানে হাতিয়ার, উৎপাদনের উপযুক্ত পাথরের অভাব ছিল। ইরাকের খেজুর গাছের কাঠ গাড়ীর চাকা বা নৌকা তৈরীর উপযোগী ছিল না। অলঙ্কারাদি, যন্ত্রাদি এবং পানপত্রের (Vessels) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু এখানে পাওয়া যেত না। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে মেসোপটেমিয়া কৃষিজাত পণ্য, কাপড় ইত্যাদি রপ্তানি করে কাঠ, তামা, টিন, সোনা এবং বিভিন্ন ধরণের পাথর তুর্কি, ইরাক অথবা সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করত। শেষোক্ত অঞ্চলগুলো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এখানে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হত না। সুসংহত সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে এই ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য সম্ভব হয়। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার লোকেরা প্রত্যক্ষ বিনিময় ও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্যোগ নিত।

ব্যবসা বাণিজ্য, পরিষেবা ও হস্তশিল্প ছাড়াও নগর উন্নয়নের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন। গরুর গাড়ী বা অন্যকোন জন্তু দ্বারা টানা গাড়ী যদি শহরাঞ্চলে পশুখাদ্য, কয়লা বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য বহন করে তবে একটি শহরের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে না। কারণ এগুলোর মাধ্যমে কাজকর্ম ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ। একমাত্র নদীপথ কম ব্যয় বহুল পরিবহন ব্যবস্থা। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় নদীপথ দিয়ে নৌকা ও বার্জ চলত এবং বিভিন্ন ছোট বড় অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এই অধ্যায়ের শেষে মারি নগরীর বর্ণনা থেকে একটি 'বিশ্ব নদীপথ' হিসেবে ইউফ্রেটিসের গুরুত্ব বুঝতে পারা যায়।

লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন

প্রত্যেক সমাজেই নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। ভাষা মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম। লিখন ও একধরণের ভার প্রকাশেব মাধ্যম। লিখার মাধ্যমে কোন চিহ্নের দ্বারা

অন্যকে মনের ভাব বোঝানো যায়। মেসোপটেমিয়ায় প্রথম চিত্র ও সংখ্যা সম্বলিত ফলক লিখা হয় ৩২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। প্রাপ্ত প্রায় ৫০০০ ফলকে ষাড়, মাছ, রুটী ইত্যাদি জিনিষের তালিকা পাওয়া যায়। এ জিনিষগুলো দক্ষিণের উর্কনগরীর মন্দির থেকে এনে বণ্টন করা হত। নগরজীবনে বহু মানুষের মধ্যে নানাবিধ জিনিষের আদানপ্রদান ছিল। এ ধরণের আদানপ্রদানের হিসেব রাখবার প্রয়োজনেই সমাজে লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হল।

৩২০০ খ্রিস্টাব্দের মাটীর ফলক। প্রত্যেকটি ফলক উচ্চতায় ৩.৫ সেঃমিঃ অথবা তার চাইতে কম এবং চিত্র চিহ্ন সম্বলিত।

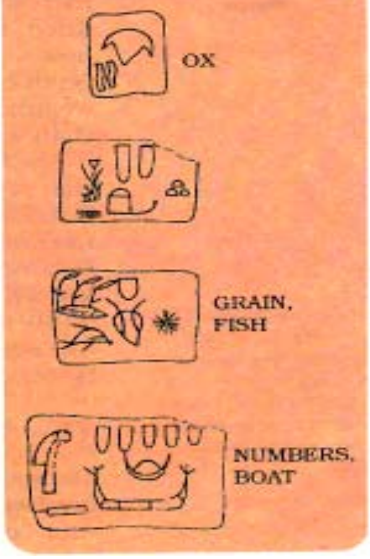

Cuneiform syllabic signs.

মেসোপটেমিয়ায় মাটির ফলক তৈরী করবার সময় লিপিকাররা ভেজা মাটিকে হাতে ধরে লিখবার মত সুবিধাজনক আকারে গড়ে নিতেন। ফলকটির উপরিভাগ মসৃণ করে নেওয়া হত। তারপর ধারালো করে কাটা নলখাগড়ার ডগা দিয়ে সেই ভেজা মাটির উপর গোঁজের (Wedge) আকারে খোদাই করা হত। রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে ফলকের উপর নতুন করে খোদাই করা সম্ভব হত না। তাই ছোট বড় যে কোন আদান-প্রদান সম্বন্ধীয় তথ্য আলাদা আলাদা ফলকে সংরক্ষিত করা হত। ফলে মেসোপটেমিয় অঞ্চলে অজস্র মাটির ফলক পাওয়া যায় এবং এই উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা মেসোপটেমিয়া সম্বন্ধে বহু তথ্য

দুই ধারে লিখা সম্বলিত মাটির ফলক। খচিত রেখা ও ত্রিকোণ দেখে ধারণা করা যায় এটি একটি আঙ্কিক ফলক।

সংগ্রহ করতে পারিও সে তুলনায় সমকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা অনেকটাই অজ্ঞ।

২৬০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ গোজাকৃতি অক্ষরে সুমেরিয়ান ভাষা লিখিত হতে থাকে। শুধুমাত্র তথ্য সংরক্ষণ ছাড়াও অভিধান তৈরীর কাজে, জমির মালিকানা পরিবর্তনের ব্যাপারে, রাজকীয় দলিল তৈরীর কাজে ও রাজা দেশের প্রচলিত আইন কানুনের কোন পরিবর্তন করলে তা প্রচারের কাজেও লিখার ব্যবহার হত। ২৪০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পর ধীরে ধীরে আক্কদিয়ান ভাষা মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সুমেরিয়ান ভাষার স্থান দখল করে নেয়। সুমেরিয়ান ভাষায়ও খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ বছর গোজাকৃতি অক্ষরের প্রচলন ছিল।

* Cuneiform is derived from the Latin words cuneus, meaning 'wedge amd forma, meaning 'shape'

লিখন পদ্ধতি

মেসোপটেমিয়ায় অক্ষরে শুধু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত না হয়ে বাক্যের যে অংশ একসাথে উচ্চারিত হত তাই ব্যবহৃত হত। যেমন- Put বা in ফলে লিপিকারদের অজস্র শব্দ জানতে হত। ফলক ভেজা অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্য খোদাই করার কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন।

লিখা বা পড়ার ক্ষমতা

মেসোপটেমিয়াতে খুব কম সংখ্যক লোকই লিখতে পড়তে জানতো। কারণ তখনকার অজস্র অক্ষর শিখার পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত জটিল। কোন রাজা লিখতে বা পড়তে পারলে তা তিনি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তার লিপিতে উল্লেখ করতেন। তবে লিখার ধরণের মধ্যে কথনরীতির প্রতিফলন ঘটত। যদি কোন কর্মচারীর লিখা চিঠি রাজাকে পড়ে শুনানো হত তবে তা এইভাবে আরম্ভ করা হত —
" হে ভগবান ..... আপনার সেবক বলছে..... আমি আপনার দেওয়া কাজগুলি সমাপণ করেছি।"

লিখার ব্যবহার

*The poet means that once the messenger has climbed to a great height, everything appeared small in the valley far below.

প্রাচীন উর্কের একজন শাসক এনমার্কার-এর বিষয়ে লিখা একটি দীর্ঘ সুমেরিয়ান কাব্য থেকে তখনকার নগর জীবন, ব্যবসা বাণিজ্য ও লিখার বিষয়ে জানা যায়। মেসোপটেমিয়ার পরম্পরা অনুসারে উর্ক ছিল একটি অতি উন্নত নগর।

সুমেরে প্রথম বাণিজ্যের শুরুর ব্যাপারে এনমার্কারের ভূমিকা ছিল। মহাকাব্য অনুযায়ী প্রথমদিকে সুমেরীয়ানদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল না। এনমার্কার চেয়েছিলেন যে ল্যাপিস লাজুলি (Lapis-Lazuli) অর্থাৎ গাঢ় নীল বর্ণের মূল্যবান পাথর ও ধাতু দিয়ে নগরের একটি মন্দির সাজিয়ে তুলবেন। পাথর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি আরাত্তা (Aratta) নামক দূরবর্তী স্থানে একজন দূত পাঠিয়ে ছিলেন। দূত রাজাকে বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছিল যে সে রাত্রিবেলা তারার আলোয় ও দিনের বেলা সূর্যের আলোয় পথ চলে। তাকে উচু নীচু পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে চলতে হয়। উচু পর্বতের উপর থেকে সমতলের লোকজনকে ইদুরের মত ছোট মনে হত। তার মনে হয়েছে সমতলের সুসা (Susa) নগরীর মানুষ তাকে কুর্ণিশ করছে। এভাবে তাকে অজস্র পর্বতমালা অতিক্রম করতে হয়েছে।

*Cuneiform letters were wedge shaped, bence, like nails.

সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরাত্তা প্রধানের কাছ থেকে সে নীলবর্ণ পাথর আদায় করতে পারেনি। রাজার আদেশে তাকে বারবার আাসা যাওয়া করতে হয়েছে। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে সবকিছু মাটির ফলকে লিখে সে আবাত্তার শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আরাত্তার শাসক যখন এই খবরটি পড়েন তখন তার মুখমণ্ডল ও ম্লান হয়ে যায়। তিনি বারবার ফলকটি দেখতে থাকেন। এই বর্ণনা সত্যি না ও হতে পারে তবে মেসোপটেমিয়ায় যে রাজার আগ্রহে ব্যবসা বাণিজ্য ও লিখার পদ্ধতি চালু হয়েছিল তা অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নগরায়ণ ঃ মন্দির ও রাজারা

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় জনবসতি শুরু হয়েছিল ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে। এ সমস্ত বসতি থেকেই কিছু প্রাচীন নগরীর পত্তন হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরকে কেন্দ্র করে কিছু নগরী গড়ে উঠেছিল। আবার কিছু নগরী গড়ে উঠেছিল বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে। কয়েকটি নগরীর পরিচয় ছিল শাসনের কেন্দ্ররূপে। উপরে উল্লিখিত প্রথম দুধরণের নগরী সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করব।

প্রাচীন বসতকারীরা (যাদের মূল বাসস্থান জানা নেই) তাদের গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে মন্দির নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাচীনতম মন্দিরটি ছিল কাঁচা ইটের তৈরী। মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর অধিষ্ঠান ছিল, যেমন উরের চাঁদ দেবতা, ভালবাসা ও যুদ্ধের দেবী ইনান্না (inanna) খোলা উদ্যানের চারদিকে অসংখ্য কক্ষ বিশিষ্ট এই সকল মন্দিরের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম দিককার মন্দিরগুলো অতি সাধারণভাবে নির্মিত হলেও প্রত্যেক যুগেই

মন্দিরের চতুর্দিকে দেওয়াল গড়া হত। তবে সাধারণ কোন বাড়ীর ক্ষেত্রে তেমন ছিল না।

জনগণ দেবতাকে প্রদান করার উদ্দেশ্যে শষ্য, মাছ, দৈ ইত্যাদি মন্দিরে নিয়ে আসত। মানুষের বিশ্বাস ছিল ভগবানই স্থানীয় মানুষের কৃষিজমি, মাছের ভেড়ি এবং পালিত পশুর স্বত্ত্বাধিকারী। সে সময় তেল উৎপাদন, শষ্য পেষাই, সূতোকাটা ও কাপড় বোনার মত কাজ মন্দিরে করা হত। উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বণ্টন ও তার হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবার জন্য মন্দিরগুলো নিজস্ব সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছিল। ক্রমে এ থেকেই প্রধান নগরকেন্দ্রিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠল।

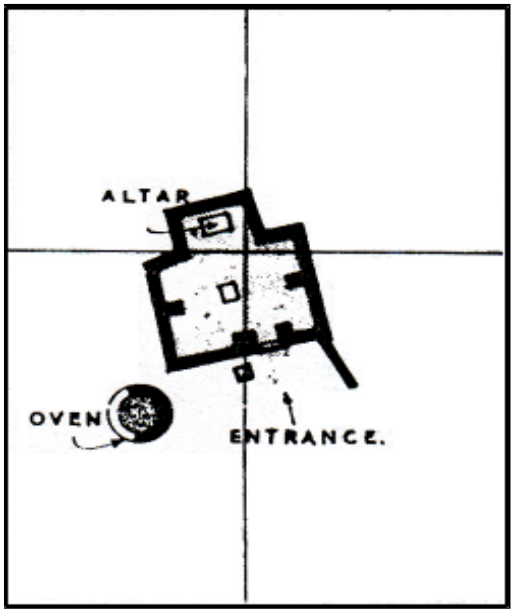

The earliest known temple of the south, c.5000 BCE (Plan).

জমির স্বাভাবিক উর্বরতা থাকা সত্ত্বেও কৃষি ছিল সংকটাপন্ন। ইউফ্রেস্টিস নদীর শাখানদীগুলির বন্যা প্রায়ই উভয় তীর প্লাবিত করে শষ্য নষ্ট করত। অনেক সময় নদীর গতিপথ পর্যন্ত পরিবর্তিত হত। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে জানা যায় যে মেসোপটেমিয়ায় গ্রামগুলোকে বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তাছাড়া মানুষ নিজেরাও অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করত। যারা স্রোতের প্রতিকূলে (Upstream) বসবাস করত তারা নিজেদের প্রয়োজনে নালা কেটে অধিক জল নিয়ে যেত। ফলে যারা নিম্নাঞ্চলে (downstream) বসবাস করত তাদের জলসংকট হত। অনেক সময় পলি এবং অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার না করায় নিম্নাঞ্চলে জলের প্রবাহ কমে যেত। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার গ্রামাঞ্চলের লোকের মধ্যে জল ও জমি নিয়ে প্রায়ই বিবাদ দেখা দিত।

A temple of a later period, c.3000 BCE, with an open courtyard and in-and-out facade (as excavated).

ঐ সকল অঞ্চলে দীর্ঘ যুদ্ধে জয়ী দলনেতারা তাদের অনুগামীদের লুণ্ঠিত সম্পদরাশির অংশ বিলিয়ে দিতেন। পরাজিত লোকেদের বন্দি করে তাদেরকে রক্ষী বা ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করতেন। এতে তাদের সম্মান ও আধিপত্য বৃদ্ধি পেত। যুদ্ধবিজেতাদের এ ধরণের আধিপত্য অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। যখন সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য নেতারা সচেষ্ট হলেন ও এ উদ্দেশ্যে নানা সংগঠন ও শাখা গড়ে তুললেন তখনই তাদের নেতৃত্ব স্বীকৃতি লাভ করল। নেতারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্যবান অংশ দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান করতেন ও মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে ব্যবহার করতেন। মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তারা বিভিন্ন যায়গায় লোক পাঠিয়ে মূল্যবান পাথর ও ধাতু নিয়ে আসতেন। দক্ষতার সঙ্গে মন্দিরে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও রক্ষা করা হত। এনমার্কার সম্বন্ধীয় কবিতা থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত দায়িত্ব পালন করার ফলে রাজার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পেত।

দলপতিরা জনসাধারণকে প্রয়োজনে একতাবদ্ধ সামরিক শক্তি হিসেবে কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করতেন। জনগণ একত্রিত এবং ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাদের সুরক্ষা ও অটুট থাকবে। প্রাচীনতম মন্দির শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম উর্কে আমরা শত্রু বিজয়ী যোদ্ধা ও পরাজিত লোকেদের চিত্র লক্ষ্য করি। প্রত্নতাত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে উর্ক ২৫০ হেক্টর ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে মহেঞ্জোদারোর যে বিস্তৃতি ছিল তার তুলনায় উর্কের বিস্তৃতি ছিল দ্বিগুণ। যে সময়ে অসংখ্য লোক গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ধাবিত হয়। প্রাচীন কালেই উর্কে একটি সুরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ৪২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত টিকে থাকা উর্ক নগরী ২৮০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে ৪০০ হেক্টর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

স্থানীয় লোকেদের উপর কৃষিকর আরোপ করা ছাড়াও তাদের ও যুদ্ধবন্দীদের রাজার কাজ বা মন্দিরের কাজে নিয়োগ করা হত। তবে যারা এ ধরণের কাজ করত তাদের খাদ্যদ্রব্য কাপড় ইত্যাদি দেওয়া হত। প্রাপ্ত তালিকাতে ব্যক্তির নাম ও তার প্রাপ্ত জিনিষের পরিমাণ উল্লিখিত আছে। ধারণা করা যায় একটি বিশেষ মন্দির নির্মাণ করতে প্রায় ১৫০০ লোকের প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা কাজ করে পাঁচ বৎসর কাল সময় লেগেছিল শাসকেরা জনগণকে মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর ও ধাতু যোগাড় করবার, দূরবর্তী স্থানে গিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বহন করে আনবার, কখনো বা ইট তৈরী করবার বা ইট বিছিয়ে দেবার আদেশ দিতেন। এ ধরণের কাজের মাধ্যমে ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ উর্ক প্রযুক্তিগতভাবে যথেষ্ট এগিয়ে যায়। বিভিন্ন শিল্পকর্মের জন্য ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহৃত হতে থাকে। কাঠের স্তম্ভগুলো বৃহৎ হলঘরগুলোর ছাঁদের ভার বহনের উপযুক্ত না হওয়ায় স্থপতিরা ইটের স্তম্ভ তৈরী করবার কৌশল আয়ত্ব করলেন।

বিভিন্ন আকারের মাটির পট নির্মাণ করবার ও পোড়াবার জন্য অজস্র লোককে নিয়োগ করা হত। এই পটগুলোকে মন্দিরের গায়ে অথবা মেঝেতে লাগিয়ে নানা রঙে বিচিত্র করা হত। মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও সাধারণ মাটি ব্যবহার না করে, বাইরে থেকে আনা পাথর ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতিও নাগরিক অর্থনীতি গড়ে তুলবার সহায়ক হয়েছিল। চাকার ব্যবহার শিখে পরবর্তীকালে একজন কুমাড় তার কারখানাতে অল্প সময়ে অজস্র পাত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Top : Basalt stele showing a bearded man twice. Note his headband and hair, waistband anmd long skirt. In the lower scene he attacks a lion with a huge bow and arrow. In the scene above, the hero finally kills the rampant lion with a spear (c.3200) BCE).*

* Steles are stone slabs with inscriptions or carvings.

নীচের চিত্রে ৩২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের একটি নলাকার সীল মোহর দেখানো হয়েছে। চিত্রে একই ধরণের চেহারাও চুলযুক্ত লোকের হাতে একটি তীরের ফলা আছে। এখানে তিন জন যুদ্ধবন্দি, তাদের হাত বাঁধা এবং চতুর্থ লোকটি যুদ্ধ নায়কের কাছে মিনতি করছে।

সীলমোহর — একটি নাগরিক শিল্পকৃতি

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে পাথরে ছাপ দিয়ে সীলমোহর তৈরী করা হত। মেসোপটেমিয়াতে প্রথম সহস্র খ্রিস্ট পূর্বাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত নলাকার সীলমোহরের মধ্য ভাগে গর্ত করা হত। সেই গর্তের মধ্যে শক্ত কাঠি ঢুকিয়ে নরম কাদার উপর দিয়ে তা গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে সুদক্ষ শিল্পীরা নানাধরনের চিত্র অঙ্কণ করতেন। কখনো বা অধিকারীর নাম, তার উপাস্য দেবতা, তার অবস্থান ইত্যাদিও লিখিত হত। কাদার উপর খোদাই করা সীলমোহর গুলোর বক্তব্য ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। সুতরাং সীলমোহর থেকে নগর জীবনে একজন নাগরিকের সঠিক ভূমিকা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি।

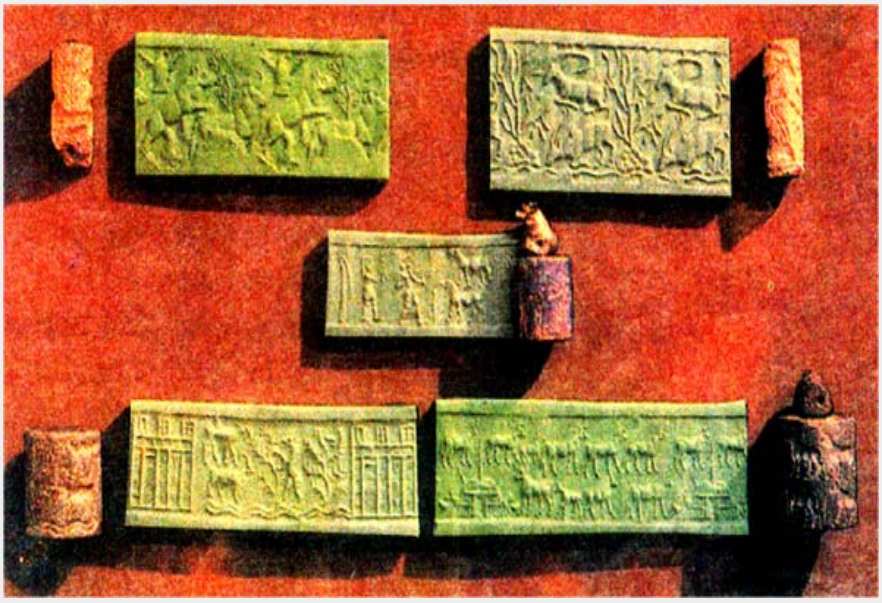

পাঁচটি প্রাচীন নলাকার সীলমোহর এবং তাদের ছাপ। প্রত্যেকটি সীলমোহরে কি দেখতে পাও তার বর্ণনা দাও। এর উপর কি গোঁজাকৃতি লিপির ছাপ রয়েছে?

নগর জীবন

আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমাজে একটি উন্নত শাসক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সমাজের সম্পদের অধিকাংশ ছিল তাদের হস্তগত। উর নগরীতে রাজা-রাণীদের কবরে অসংখ্য মূল্যবান অলঙ্কার, সোনার পাত্র, মূল্যবান রত্ন খচিত কাঠের বাদ্যযন্ত্র, সোনার তৈরী অস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ লোকের অবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

আইনী নথিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে মেসোপটেমিয়ার সমাজে অনু-পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে একজন বিবাহিত পুত্র তার পরিবার নিয়ে পিতামাতার সঙ্গেই বসবাস করত। পিতাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। আমরা বিবাহের নিয়ম কানুন ও কিছুটা জানতে পারি। কন্যার পিতামাতা বিবাহের ব্যাপারে তাদের সম্মতির কথা জানালে বিবাহের কথা ঘোষণা করা হত। বরপক্ষ তখন কন্যাপক্ষকে একটি উপহার প্রদান করত। বিবাহের অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষ উপহার আদান প্রদান করে,

একসাথে খাওয়া-দাওয়া ও মন্দিরে পূজার আয়োজন করত। শ্বাশুড়ী বধূকে আনতে গেলে, পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যে সম্পত্তি, তার অংশ কন্যাকে দেওয়া হত। পিতার বাড়ী, কৃষিক্ষেত্র পালিত পশু ইত্যাদি লাভ করত পুত্রেরা। প্রাচীনতম যে নগরীগুলোতে খননকার্য্য চালানো হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল উর।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে উর নগরীর সাধারণ বাসগৃহগুলো সুসংহত ভাবে খনন করা হয়। সেখানকার রাস্তাগুলো এত ছোট। ছিল যে অনেক বাড়ীতেই চাকা লাগানো গাড়ী ঢুকতে পারত না। গাধার পিঠে করে জ্বালানী কাঠ ও খাদ্যশষ্য আনা হত। সরু রাস্তা ও বাড়ীগুলোর এলোমেলো আকৃতি দেখে মনে হয় যে উর শহর ছিল আপরিকল্পিত। সমসাময়িক মহেঞ্জোদাড়োতে যেমন হল নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা যায় উরে তা লক্ষ্য করা যায় না। বাড়ীগুলোর ভেতরদিকের উদ্যানে নালা ও মাটির নল দেখতে পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় যে বাড়ীর ছাদ ভেতরদিকে হেলানো ছিল, ফলে ছাদের জল ভেতরের উদ্যানে অবস্থিত জলাধারে জমা হত। প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর রাস্তার জল জমা না হবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। নাগরিকেরা তাদের বাড়ী পরিষ্কার করে আবর্জনা রাস্তায় ফেলে দিত। মানুষের পায়ের নীচে পড়ে সেগুলি সমান হলের ক্রমশঃ রাস্তায় উচ্চতা বৃদ্ধিপেত। কিছুদিন পর বাড়ীগুলোর ভিত উচু করতে হত, নয়তো বৃষ্টির পর জানালা দিয়ে রাস্তার জলকাদা বাড়ীতে প্রবেশ করত। জানালা দিয়ে বাড়ীতেবাড়ীতে আলো না এসে দরজা দিয়েই আলো আসত ও দরজাগুলো উঠোনের দিকে খোলার ব্যবস্থা ছিল । দরজাগুলো বাড়ীর উঠোনের দিকে খোলার ব্যবস্থা থাকায় পরিবারের গোপনীয়তা ও রক্ষা পেত। উরে প্রাপ্ত ফলক থেকে বোঝা যায় বাড়ীর ব্যাপারে লোকের কুসংস্কারও ছিল। যেমন উচু প্রবেশ পথ পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধি করে, অন্য বাড়ীর দিকে মুখ করে সদর দরজা না খোলা শুভ লক্ষণ। তবে বাড়ীর সদর কাঠের দরজা যদি ভিতরের দিকে না খুলে বাইরের দিকে খোলে, তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুন্দর হবে না ইত্যাদি।

* A sump is a covered basin in the ground into which water and sewage flow.

A residential area at Ur, c, 2000 BCE. Can you locate, besides the winding streets, two or three blind alleys?

উর নগরীর সমাধিক্ষেত্রে পাশাপাশি রাজবংশের ও সাধারণ লোকের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ বসত বাড়ীর নীচে ও কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পশুচারণভূমিতে একটি বাণিজ্যিক শহর

MAP 3 : The Location of Mari

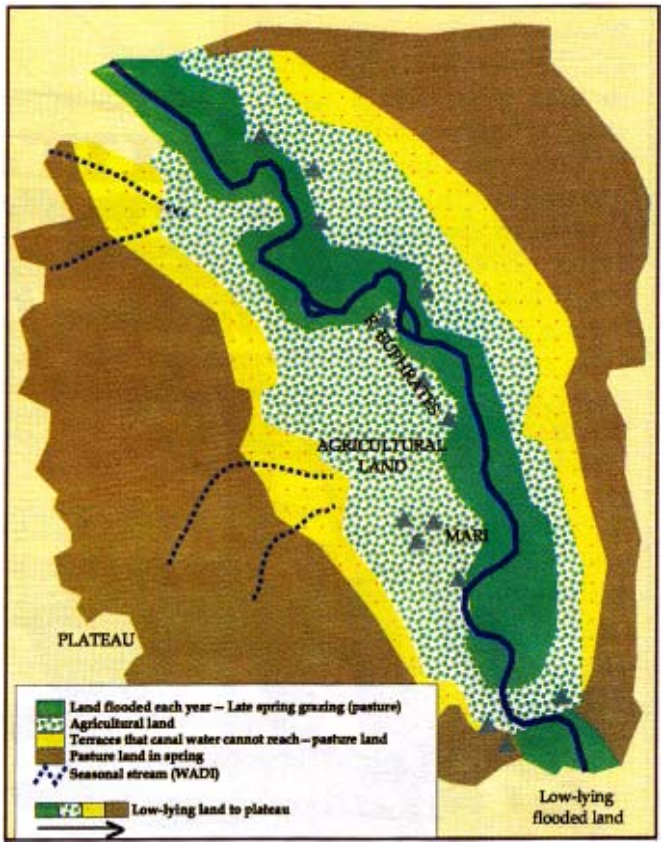

২০০০ খ্রিষ্টপূর্বের পর রাজধানী মারির উন্নতি ঘটেছিল। ২নং মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে মারির অবস্থান ছিল ইউফ্রেটিস নদীর উপরিভাগের (Upstream) অববাহিকায়। ৩নং রঙিন মানচিত্র থেকে বোঝা যায় যে এ অঞ্চলে একইসঙ্গে কৃষি ও পশুপালন প্রচলিত ছিল। মারির কোন কোন সম্প্রদায় একইসাথে কৃষি ও মেষপালন করত। কিন্তু এখানকার বেশীরভাগ ভূখণ্ড মেষ ও ছাগল পালনে ব্যবহৃত হত। পশুপালকদের পশুশাবক, দুগ্ধজাত খাদ্য, চামড়া, মাংস ইত্যাদির বিনিময়ে খাদ্যশষ্য, ধাতু নির্মিত হাতিয়ার ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হত। পশুর মল থেকে উৎপাদিত সারও কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তা সত্ত্বেও পশুপালক ও কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হত। পশুপালকেরা যখন জলের সন্ধানে শষ্যের ক্ষতি করে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে মেষের পাল নিয়ে যেত তখনই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হত। যাযাবর পশুপালকেরা গ্রাম লুণ্ঠন করে খাদ্যশষ্য নিয়ে যেত। অন্যদিকে কৃষকেরা তাদের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পশুপালকদের যাতায়াত করতে দিত না।

মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে পশ্চিম মরুভূমি অঞ্চলের যাযাবর সম্প্রদায় ঐশ্বর্যশালী কৃষি অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়েছে। মেষ পালকেরা গ্রীষ্মকালে তাদের মেষগুলি নিয়ে উর্ব্বর এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করত। আবার তারা কখনও কখনও পশুপালক হিসেবে কখনও শ্রমিক হিসেবে বা সৈনিক হিসেবে এসে ঐ সকল উর্ব্বর জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করত।

তাদের মধ্যে অনেকে ক্ষমতা দখল করে শাসন কায়েম করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আক্কাদিয়ান (Akkadians) আমরাইটস (Amorites) আসিরিয়ান (Assyrian) এবং এরামিয়নদের কথা (Aramaeans) (যাযাবর শাসকদের সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ৫ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। মারির রাজা ছিলেন আমরাইটসরা (Amorites)। স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে তাদের পোষাক ছিল ভিন্ন ধরণের। তারা শুধু মেসোপটেমিয়ার দেবতাদের শ্রদ্ধা করতেন না, তারা মারিতে ডাগন দেবতার একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ও সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির জন্যে উন্মুক্ত ছিল। সম্ভবত বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতির মিলনের ফলেই এই সভ্যতা অগ্রগতি লাভ করেছিল।

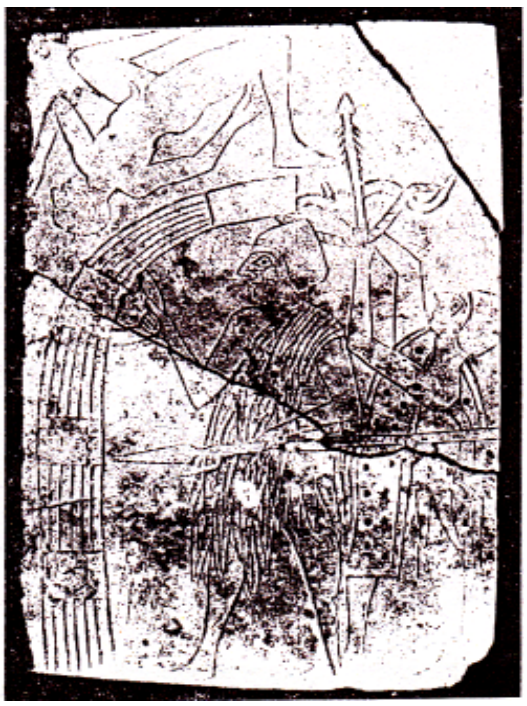

A warrior holding a long spear nd a wicker shiedl. Note the dress, typical of Amorites, and different from that of the Suimerian warrior shown on p. 38. This picture was incised on shell, c.2600 BCE.

The Palace at Mari of King Zimrilim (1810-1770 B

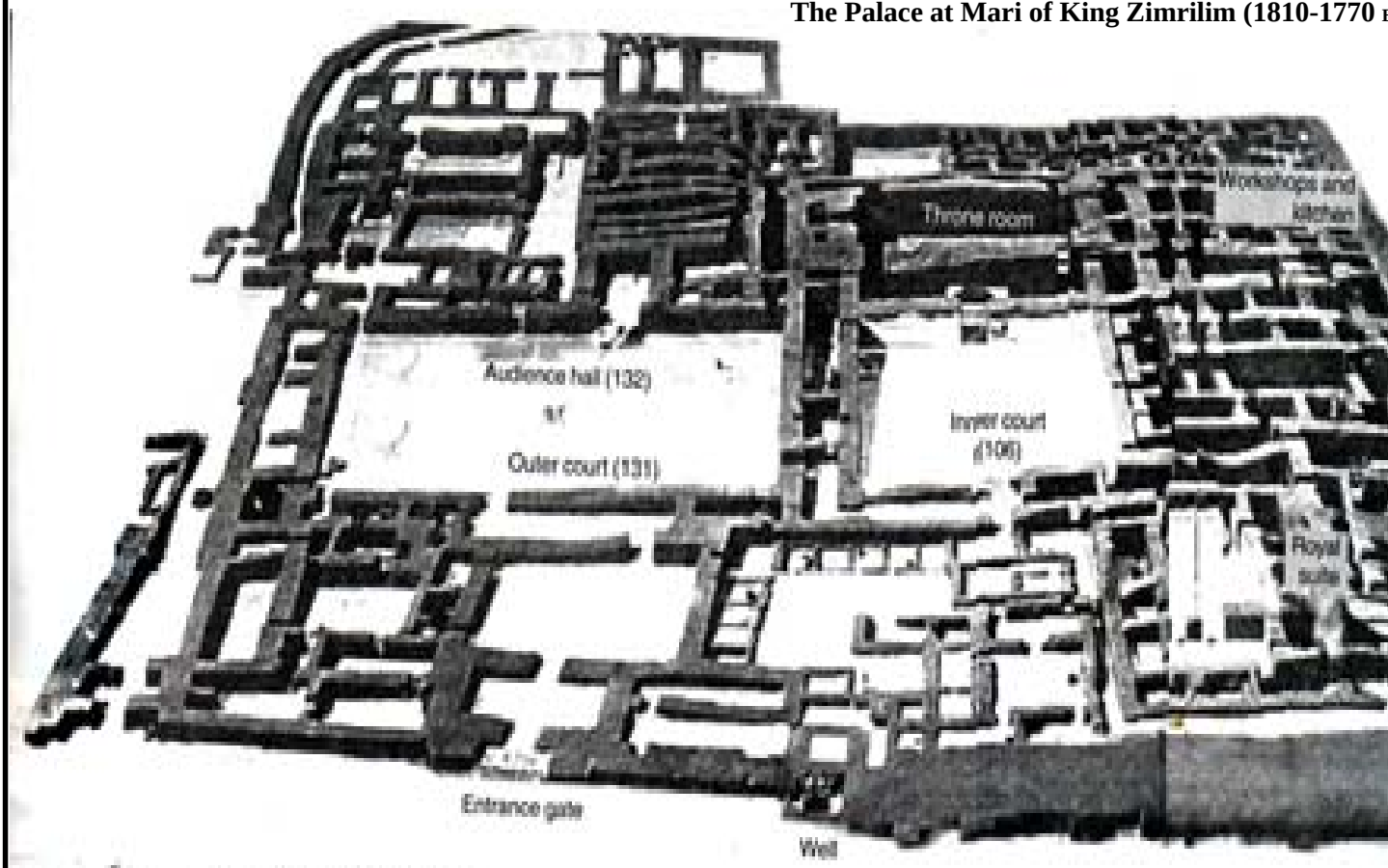

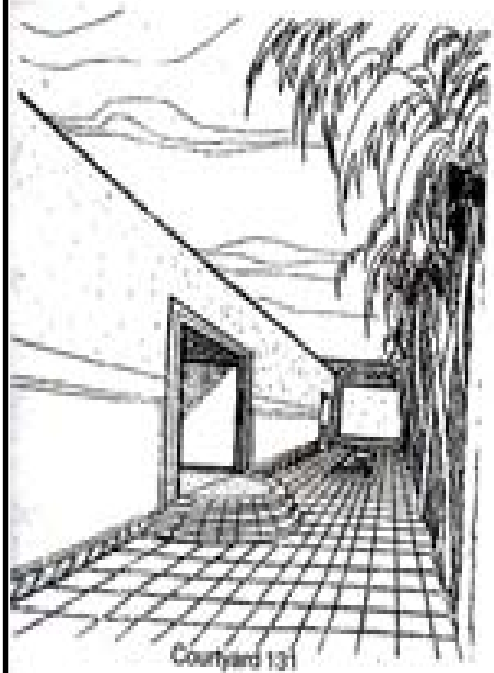
Courtyard 131

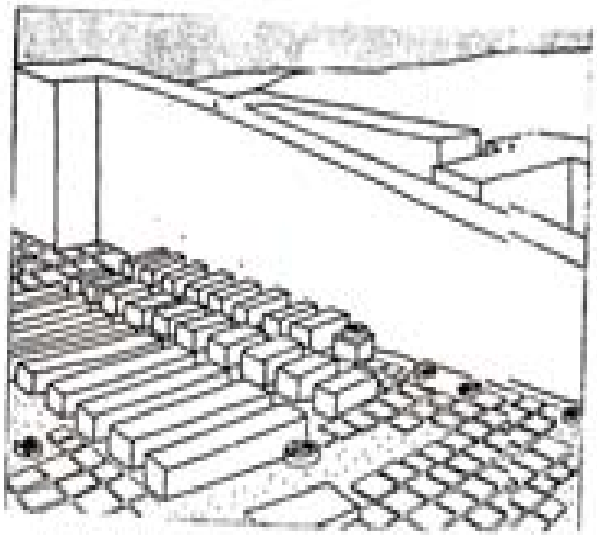
Scribes' office with benches and clay bins for storing tablets

BCE)

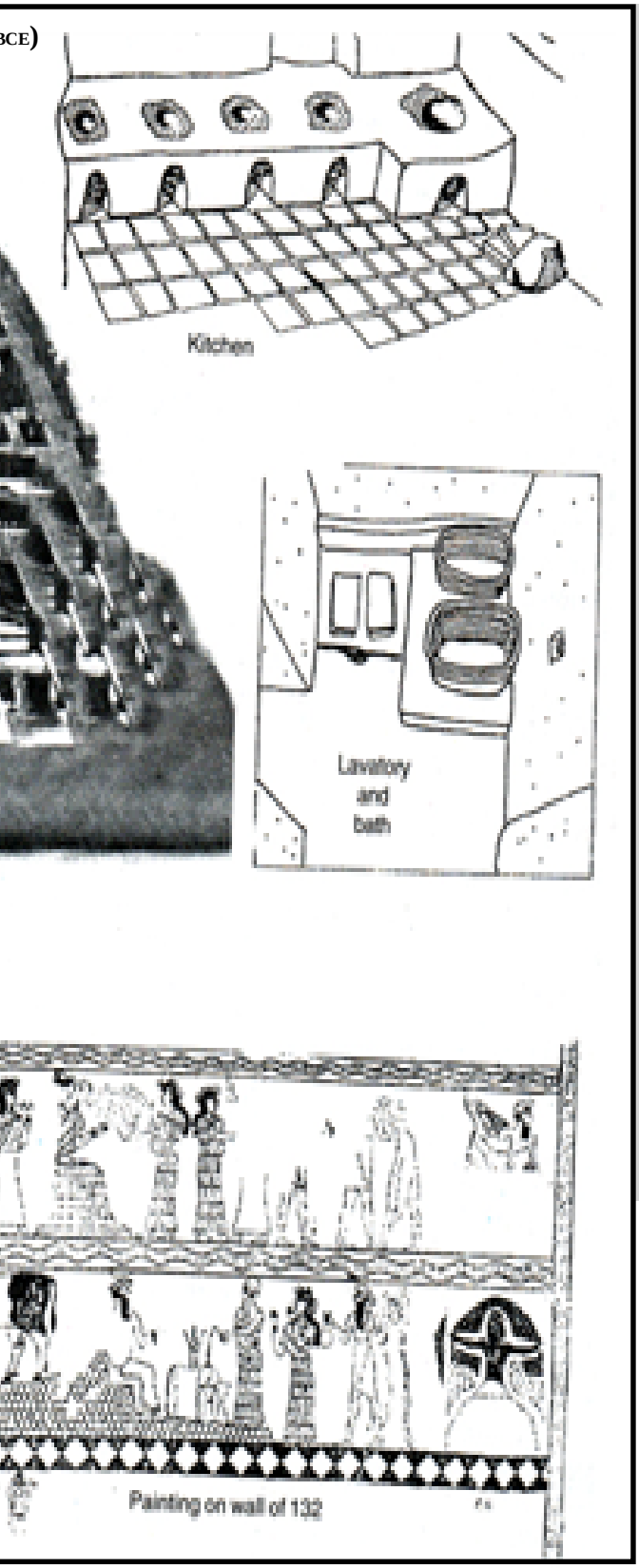

রাজা জিমরিলিমের (১৮১০-১৭৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মারি নগরীর প্রাসাদ

মারির বিশাল প্রাসাদটি রাজবংশের বাসস্থান ছিল। সেটা ছিল শাসনের ও, উৎপাদনের কেন্দ্র স্থল। এখানে মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার তৈরী হত। সিরিয়া থেকে একজন অল্পবয়সী রাজপুত্র মারির রাজা জিমরিলিমের এক বন্ধুর কাছ থেকে একখানা পরিচয় পত্র নিয়ে এই বিখ্যাত প্রাসাদে এসেছিল। রাজাকে আহারের সময় প্রচুর পরিমাণে খাওয়ার টেবিলে যথেষ্ট খাদ্য পরিবেশন করা হত, তাতে থাকত ময়দা, বার্লি, পাউরুটি, মাছ, মাংস, ফল, সুরা। সম্ভবত বহু সঙ্গী সাথীর সঙ্গে বসে রাজা আহার করতেন। এই প্রাসাদের উত্তরদিকে একটিমাত্র প্রবেশ দ্বার ছিল। রাজা সাধারণত এই প্রবেশদ্বার দিয়েই বিদেশী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি এবং নিজের ঘনিষ্ঠজনদের অভ্যর্থনা করতেন। দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন যুক্ত একটি কক্ষ ভ্রমণকারীদের বিস্ময় অর্জন করত। ৬০টি কক্ষ বিশিষ্ট এই প্রাসাদটি ২.৪ একর জমির উপর বিস্তৃত ছিল।

কার্যক্রম - ৩

প্রবেশ দ্বার থেকে ভিতরের রাজদরবারের রাস্তাটি চিহ্নিত কর। ভাড়ারে কি আছে বলে তুমি মনে কর। রান্নাঘরটি কিভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?

মারির রাজা সর্বদা সতর্ক থাকতেন, বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে তার রাজ্যের মধ্যে চলাচল করতে দিলেও তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। রাজা ও তার কর্মচারীদের মধ্যে চিঠি পত্রের আদান প্রদানের সময় তাদের (ঐ বণিকদের) কথা প্রায়ই উল্লেখিত হত। একজন কর্মচারী একটি পত্রে রাজার কাছে লিখেছিলেন যে তিনি প্রায়ই দেখতেন একটি শিবির থেকে অন্য শিবিরে রাত্রিবেলা আলোর সংকেত পাঠানো হয়। তার অনুমান যে একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মারি একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সেখান থেকে কাঠ, তামা, টিন, তেল এবং অন্যান্য বিভিন্ন দ্রব্য নদীপথে খনিজ সম্পদে পূর্ণ লেবানন তুরষ্ক ও লিবিয়াতে রপ্তানি করা হত। মারি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য ভিত্তিক নগর কেন্দ্র। দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলর পথে ভাঙ্গাপাথর, কাঠ, সুরা ও তেলপাত্র বহনকারী নৌকাগুলি মারিতে অবস্থান করত। নৌকাগুলিকে মারি থেকে (নিম্নগামী) রওয়ানা হবার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে আধিকারিকেরা মোট পণ্যমূল্যের এক দশমাংশ শুল্ক হিসাবে (Levy) ধার্য্য করতেন। বিশেষ শষ্য বহনকারী নৌকা করে বার্লি আনা হত।

সাইপ্রাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ আলাসিয়া (Alashiya) তামার জন্য বিখ্যাত ছিল। ফলক থেকে জানা যায় যে সেখানকার তামাও আমদানী হত। তাছাড়া আনা আরেকটি উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল বিন। নৌকাতে বহন করে।

হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র বানাবার জন্য ব্যবহৃত হত বলে সে সময়ে ব্রোঞ্জ ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক পণ্য। সুতরাং মারি একটি সামরিক শক্তি সমৃদ্ধ রাজ্য না হলেও এটি ছিল অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী।

মেসোপটেমিয়ার শহরগুলোর খনন কার্য্য

বর্তমানকালে মেসোপটেমিয়ায় খননকারীরা অতীত কালের তুলনায় অনেক উন্নত ধরনের ব্যবস্থার দ্বারা খনন কার্য্য সম্পাদন করেন।

উদাহরণ স্বরূপ ছোট শহর আবু সালাবিকের কথা বলা যায়। ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১০ হেক্টর এলাকা বিশিষ্ট এই শহরটির জনসংখ্যা ছিল ১০০০০। ধারালো হাতিয়ার দিয়ে মাটির উপরভাগের স্তর ভেঙ্গে পুরনো শহরের দেওয়ালের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাটির নীচের ভেজা অংশ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুরনো স্থাপত্যের রং গঠন ইত্যাদি নানা ধরনের বৈশিষ্টের সন্ধান পান। মাটির স্তুপের ভেতর বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া যায়। বিশালাকৃতি মাছের হাড় ও আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘুটের পোড়া অংশ দেখে রান্নাঘর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। অল্প কিছু সংখ্যক বৈঠক খানার ও নিদর্শন পাওয়া যায়। রাস্তার উপর শুকর শিশুর দাঁতের অংশ পাওয়া যাওয়ায় ধারণা করা যায় যে শুকরেরা শহরে অবাধে বিচরণ করত। একটি সমাধিক্ষেত্রে কিছু শুকরের হাড় আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে করা যায় যে মৃত্যুর পরে গ্রহণ করবার জন্য মৃতদেহের সঙ্গে শুকরের মাংস দেওয়া হত। আবার গৃহের কক্ষগুলোর মেঝে পরীক্ষা করে বোঝা যায় যে কিছু কক্ষের উপরি ভাগ ফাঁকা ছিল ও কিছু কক্ষের উপরিভাগে নানারকম পাতার ছাউনী ছিল।

মেসোপটেমিয়ান সংস্কৃতিতে নগরীর স্থান

মেসোপটেমিয়ান সাম্রাজ্যে নগরীগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মানুষ এ সমস্ত নগরীতে বসবাস করত। যুদ্ধে নগরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে মেসোপটেমিয়ানরা তাদের কাব্যের মধ্য দিয়ে এগুলোকে স্মরণীয় করে রেখেছিল।

মেসোপটেমিয়ানরা তাদের নগরীগুলো সম্বন্ধে যে গর্ববোধ করত, তার প্রমাণ আমরা পাই গিলগামেস মহাকাব্যের শেষ পর্য্যায়ে (GILGAMESH EPIC) । এই মহাকাব্যটি বারোটি ফলকে লিখিত হয়েছিল। এনমার্কারের পর উর্ক কিছুদিন গিলগামেসের শাসনাধীন ছিল বলে মনে করা হয়। দেশ-বিদেশে বহু যুদ্ধজয়ী বীর গিলগামে তার বন্ধুর মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখন তিনি মানুষের অমরত্ব লাভের পথের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন এবং পৃথিবীর নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টায় তিনি বিফল হন এবং উর্কে ফিরে আসেন। তখন তিনি উর্ক নগরের দেওয়াল ঘেষে হেঁটে স্বান্তনা পান। তার মনে হয় যে এই ইটের দেওয়ালটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে।

গিলগামেসের কখনও মনে হয়নি যে তার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার আপনজনের হাতে গড়া নগরীটিই তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবে।

লিখনের মাধ্যমে অবদান

সাধারণ কোন বিষয় মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেও বিস্তার লাভ করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় লিখিত তথ্যের। এ তথ্য বছরের পর বছর ধরে পণ্ডিতেরা পাঠ করতে পারেন এবং এর উপর ভিত্তি করে নতুন গবেষণা এগিয়ে যেতে পারে। সম্ভবত সময় গণনার হিসাব এবং অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান বিশ্বে মেসোপটেমিয়ার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৮০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের যে মাটির ফলক পাওয়া যায় তা গুণ ও ভাগের নামতা, বর্গ ও বর্গমূল এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের তালিকা সম্বলিত। সেখানে দুই এর বর্গমূল এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল—

$$১+২৪/৬০+৫১/৬০^{২}+১০/৬০^{৩}$$

অঙ্কটি করে দেখা যায় যে এর উত্তর ১.৪১৪২১২৯৬, সঠিক উত্তর ১.৪১৪২১৩৫৬-এর সঙ্গে যার সামান্যই অসঙ্গিত। ছাত্রদের যে ধরণের অঙ্কের সমাধান করতে হত, তা হল— একটি স্থানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উল্লেখ করে বলা হত যে এখানে এক আঙ্গুল গভীর জল আছে। মোট জলের পরিমাণ কত?

বারো মাসে এক বৎসর চার সপ্তাহে এক মাস, ২৪ ঘণ্টায় একদিন, ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা— আমাদের নিত্য জীবনের অঙ্গ এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি মেসোপটেমিয়া থেকে। বর্ষগণনার এই পদ্ধতি আলেকজাণ্ডারের উত্তরসূরীরা গ্রহণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যে, পরে ইসলাম জগতে এবং সবশেষে মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই গণনা পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে।

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের দিনক্ষণ নির্দ্ধারিত হত এই বর্ষগণনা অনুযায়ী। একই পদ্ধতিতে আকাশে তারকা ও নক্ষত্র পুঞ্জের অবস্থান বোঝা যেত। লিখন পদ্ধতির ব্যবহার ব্যতীত ও বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতিতে মেসোপটেমিয়ার পক্ষে এ ধরণের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হত না। বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রেরা প্রাচীন ফলক গুলো পাঠ করতে শিখল। তাদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল

তার ফলে শুধু তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছাড়াও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করবার শিক্ষা গ্রহণ করল।

মেসোপটেমিয়ার নগর সভ্যতার প্রতি গুরুত্বদান আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য বলে ভাবার কোন কারণ নেই। প্রাচীন কালে লিখিত তথ্য ও ঐতিহ্য রক্ষা করবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তার প্রতি আমরা লক্ষ্য করে দেখব।

An Early Library

In the iron age, the Assyrians of the north created an empire, at its height between 720 and 610 BCE, that stretch as far west as Egypt. The state economy was now a predatory one, extracting labour and tribute in the form of food, animals, metal and craft items from a vast subject population.The great Assyrian kings, who had been immigrants, acknowledged the southern region, Babylonia, as the centre of high culture and the last of them, Assurbanipal (668-627 BCE), collected a library at his capital, Nineveh in the North. He made great efforts to gather tablets on history, epics omen literature, astrology, hymns and poems. He sent his scribes south to find old tablets. Because scribes in the south were trained to read and write in schools where huge collections of tablets were created and acquired fame. And although Sumerian ceased to be spoken after about 1800 BCE, it continued to be taught in schools, through vocabulary texts, sign lists, billingual (Sumerian and Akkadian) tablets, etc. So even in 650 BCE, cuneiform tablets written as far back as 2000 BCE were intelligible - and Assurbanipal's men knew where to look for early tablets or their copies.

Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, the copier stating his name and writing the date. Some tablets ended with a reference to Assurbanipal:

'I, Assurbanipal, king of the universe, king of Assyria, on whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly erudition, I wrote down on tables the wisdom of the gods ... And I checked and collated the tablets. I placed them for the further in the library of the temple of my god, Nabu, at Nineveh, for my life and the well-being of my soul, and to sustain the foundations of my royal throne...'

More important, there was cataloguing: a basket of tables would have a clay label that read: 'n number of tablets about exorcism, written by X'. Assumbanipal's library had a total of some 1,000 texts, amounting to about 30,000 tablets, grouped according to subject.

একজন প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদ

দক্ষিণের জলাভূমির নবপোলাসার (Nabopolassar) নামক এক ব্যক্তি ব্যাবিলনকে আসিরিয়ান আধিপত্য থেকে ৬২৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মুক্ত করেছিলেন। তার উত্তরসূরিরা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল এবং ব্যাবিলনের জন্য নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। ঐ সময় থেকে শুরু করে ৩৩১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ব্যাবিলন অধিকার করবার সময় পর্যন্ত ব্যাবিলন পৃথিবীর একটি প্রধান নগর ছিল। তিনটি দেওয়াল যুক্ত ৮৫০ হেক্টর জমির উপর বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির, স্তম্ভ ও অনুষ্ঠান স্থলে যাবার উপযুক্ত সরণী সমৃদ্ধ এই নগর একটি বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র-ও ছিল। এখানকার জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ গণ অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার করেছিলেন। (অন্যস্থান থেকে আগত অ্যাসিরিয়ান রাজারা দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যবিলনকে উচ্চ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ অ্যাসিরিয়ান রাজা আসুরবাণিপাল (৬৬৮-৬২৭) তার রাজধানী নিনেভে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তিনি ইতিহাস, মহাকাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, পদ্য ও শুভ-অশুভ লক্ষণ সম্বন্ধীয় মাটীর ফলক জোগাড় করবার চেষ্টা করেন। তিনি ফলক সংগ্রহ করবার জন্য তার লিপিকারদের দক্ষিণ অঞ্চলে পাঠাতে থাকেন। সে অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ফলক পাঠের শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে কথ্য ভাষা হিসাবে সুমেরিয়ানের ব্যবহার বন্ধ হলেও এ ভাষার সাহিত্য, সাংকেতিক চিহ্ন স্কুলগুলোতে পাঠ্য বিষয় ছিল। তাছাড়া (সুমেরিয়ান ও আক্কাদিয়ান) দ্বিভাষিক ফলকও পাঠোদ্ধারা করা হত। সুতরাং ৬৫০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে ও ২০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে খোদাই করা ফলক পাঠোদ্ধার করা সম্ভব ছিল। আসুরবানিপালের প্রেরিত কর্মীরা যে সমস্ত ফলকের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধেও অবগত ছিল।

নাম ও তারিখ সহ গিলগামাসের মহাকাব্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ফলকের প্রতিলিপি তৈরী করা হয়। কয়েকটি ফলকের শেষভাগে আসুরবাণিপালের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছেঃ-

"আমি আসুরবানিপাল, মহাবিশ্বের রাজা, আসিরিয়ার রাজা, যার উপর দেবতারা অসীম জ্ঞান বর্ষণ করেছেন ..... আমি ফলকগুলো পরীক্ষা ও তুলনা করেছি। ..... এগুলোকে আমি ভবিষ্যতের জন্য নিনেভে আমার ঈশ্বর নাবুর মন্দিরে স্থাপন করেছি, আমার জীবন ও আমার আত্মার শান্তির জন্য এবং আমার রাজকীয় সিংহাসনের ভিত্তি অটুট রাখবার জন্য...."

তাছাড়া গ্রন্থাগারে ফলকগুলোকে তালিকাভুক্তও করা হয়েছিল। আসুরবাণিপালের গ্রন্থাগারে ১০০০টি লিখিত তথ্য এবং প্রায় ৩০,০০০ মাটীর ফলক বিষয় অনুসারে তালিকাবদ্ধ করা হয়। এখানকার জ্যোতিবিদ ও অঙ্কশাস্ত্র বিশরদগণ অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার করেছিলেন)।

নাবনী দাস ছিলেন স্বাধীন ব্যবিলনের সর্বশেষ শাসক। তিনি লিখেছিলেন যে উরের দেবতা স্বপ্নে এসে তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে দক্ষিণের এই পুরাতন শহরে ধর্মীয় পদ্ধতির ব্যাপারে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যেন একজন মহিলা পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়। তিনি লিখেছিলেন, ".. আমি দিনের পর দিন মহিলা পুরোহিতের গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চিন্তা করেছি.... " তিনি আরও বলেন যে তিনি অতি পুরাতন একজন রাজার আমলের একটি মূর্তি পেয়েছিলেন যেখানে একজন মহিলা পুরোহিতের প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। সেখানকার পোষাক ও অলংকারাদি লক্ষ্য করে সেই আদলে তিনি তার কন্যাকে সজ্জিত করে তাকে পুরোহিত পদের উপযুক্ত করে তোলেন।

অন্য সময়ে নবনীদাসের কর্মীরা তার কাছে আক্কাডের রাজা সারাগণের নাম খোদাই করা একটি ভগ্ন মূর্তি নিয়ে আসে। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও রাজতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের জন্য নাবনীদাস সে মুর্তিটির সংস্কার করতে উদ্যত হলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা মূর্তিটির মস্তক পুনঃস্থাপন করি"।

ACTIVITY 4

Why do you think Assurbanipal and Nabonidus chershed early Mesopotamian traditions?

সময়সূচী

৭০০০-৬০০০ খৃ:পূ:	উত্তর মেসোপটেমিয়ার সমতল অঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু।
৫০০০ খৃ:পূ:	দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম মন্দির নির্মাণ
৩২০০ খৃ:পূ:	মেসোপটেমিয়ার প্রথম লিখন।
৩০০০ খৃ:পূ:	উর্ক একটি বিরাট নগরে পরিণত হয়, যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ে
২৭০০-২৫০০ খৃ:পূ:	প্রাচীন কালের রাজাগণ, সম্ভবত গিলগামেসের মত পৌরাণিক রাজা সহ
২৬০০ খৃ:পূ:	গোজের মত (Cuneiform) লিপির উন্নতি।
২৪০০ খৃ:পূ:	সুমেরিয়ানের পরিবর্তে আক্কাদিয়ানের ব্যবহার।
২৩৭০ খৃ:পূ:	সারগণ (Salgon) আক্কাদর রাজা
২০০০ খৃ:পূ:	সিরিয়া, তুর্কি ও মিশলে গোজের মত মাটির উপর লিখা বিস্তার হয়। মারি ও ব্যালিলন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নগরে পরিণত হয়।
১৮০০ খৃ:পূ:	অঙ্কশাস্ত্রের বই রচনা হয়, সুমেরিয়ান বলা বন্ধ হয়।
১১০০ খৃ:পূ:	অ্যাসিরিয়ান রাজ বংশের / রাজতের প্রতিষ্ঠা
১০০০ খৃ:পূ:	লোহার ব্যবহার
৭২০-৬১০ খৃ:পূ:	আসিরিয় সাম্রাজ্য
৬৬৮-৬২৭ খৃ:পূ:	অসুর-বাণীপালের শাসন।
৩৩১ খৃ:পূ:	আলেকজাণ্ডারের ব্যাবিলন হয়।
১ম শতাব্দী	আক্কাদিয়ান ভাষা ও গোজের (মাটির তৈরী) ব্যবহার হতে থাকে।
১৮৫০	গোজের আকারে লিপির পাঠোদ্ধার।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ-

১) প্রাকৃতিক উর্বরতা এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তুর উৎপাদনই প্রাচীনকালে নবীকরণের কারণ বলে কেন তোমার মনে হয় না?

২) নিম্নলিখিত গুলোর মধ্যে কোনটা নগরায়নের প্রয়োজনীয় সর্ত্ত, কোনটি নগরায়ণের কারণ ও কোনটি এর ফলাফল বলে তুমি মনে কর?

১) অধিক কৃষি উৎপাদন ২) হল পরিবহন ব্যবস্থা ৩) ধাতু ও পাথকেক অভাব ৪) শ্রম বিভাজন ৫) সীলমোহরের ব্যবহার ৬) বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়কারী রাজার সামরিক শক্তি।

৩) কোন ভ্রাম্যমান পশুপালক গোষ্ঠী নগরজীবনের জন্য ভয়ের কারণ নয়?

৪) কোন প্রাচীন মন্দিরগুলির অনেকটা বাড়ির মত?

সংক্ষিপ্ত রচনার আকারে লিখ ঃ-

৫) নগরায়নের শুরুর যুগে যে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কোনটি রাজার উদ্যোগের উপর নির্ভর করত?

৬) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা সম্পর্কে প্রাচীন গল্পগুলো থেকে আমরা কি জানতে পারি?

২

সাম্রাজ্যসমূহ

তিনটি মহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্যের পত্তন

মধ্য ইসলামীয় ভূমি

যাযাবর সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্যসমূহ

মেসোপটেমিয়ার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দু-হাজার বছরের মধ্যে এই এলাকায় ও তার পূর্ব ও পশ্চিমভাগে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অ্যাসিরিয়ান সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশে ইরাণীরা তাদের আধিপত্য স্থাপন করে। এ সময়ে ভূমধ্য সাগরের উপকূল অঞ্চলে ও সমুদ্র পথে ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তার লাভ করে।

ব্যবসা বাণিজ্যের এই বিস্তৃতির ফলে ভূমধ্য সাগরের পূর্বদিকে গ্রীক নগর রাষ্ট্র ও তাদের উপনিবেশগুলো লাভবান হয়ে উঠে। কৃষ্ণসাগরের উত্তর অঞ্চলে যাযাবর জাতিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক যোগাযোগের ফলেও তারা যথেষ্ট লাভবান হয়। গ্রীস দেশের নাগরিক জীবনে আথেন্স ও স্পার্টার একটি মূখ্য ভূমিকা ছিল। খ্রিষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে শেষভাগে গ্রীস দেশের ম্যাসিডন রাজ্যের শাসক আলেকজাণ্ডার রাজ্য জয়ের নেশায় উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ, পশ্চিম এশিয়া ও ইরান অধিকার করে বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে যান। তার সৈন্যরা এরপর আরও পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে আলেকজাণ্ডার এখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হলেও, বেশ কিছুসংখ্যক গ্রীক সৈন্য ভারতবর্ষে থেকে গেল।

আলেকজাণ্ডার অধিকৃত সমগ্র এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে গ্রীকদের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি, পরস্পরা ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে। সামগ্রীকভাবে অঞ্চলটিকে বলা যায় 'হেলেনাইজড', (গ্রীকদের সে সময় বলা হত Hellenes) এবং গ্রীক ভাষা সমগ্র অঞ্চলের কথ্য ভাষায় পরিণত হয়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু পরবর্তী প্রায় তিনশত বৎসর এ অঞ্চলে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব অটুট থাকে। এ অঞ্চলের ইতিহাসে এই বিশেষ সময়টিকে হেলেনষ্টিক যুগ বলে বর্ণনা করা হয়। তবে সাম্রাজ্য গঠনের ব্যাপারে এ অঞ্চলে অন্যান্য সংস্কৃতির অবদানকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় না, অথচ এদের অবদান কোন অবস্থাতেই গ্রীকদের চাইতে কম ছিল না।

এ অধ্যায়ে এর পরবর্তী ঘটনাক্রম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় তার সুযোগ গ্রহণ করে মধ্য ইটালির ক্ষুদ্র ও সুসংহত নগর রাষ্ট্র রোম। খ্রিষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। সেই সময় রোম ছিল একটি প্রজাতন্ত্র। এক জটিল নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে এখানে সরকার গঠিত হত। কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করত এবং অন্যদিকে এখানকার সমাজে ক্রীতদাস প্রথারও প্রচলন ছিল। রোমের শাসক শ্রেণি পূর্বতন আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলে। খ্রিষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উচ্চ কোটীর সামরিক নায়ক জুলিয়াস সীজারের আমলে এই রোমান সাম্রাজ্য বর্তমানকালের জার্মানী ও

ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

সাম্রাজ্যের প্রাচীন যোগাযোগের ভাষা ছিল ল্যাটিন। (রোমে কথিত ভাষা)। তবে পূর্বাঞ্চলে অনেকেই তখনো গ্রীক ভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিও রোমানদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল। খ্রিষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এবং খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট কনষ্টেন্টাইন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর রোমান সাম্রাজ্য যথেষ্টভাবে খ্রিষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খ্রিষ্ট চতুর্থ শতাব্দীতে রোমের সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। রোমের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর লোকেদের ব্যবসা, সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ, অভিবাসন ইত্যাদি সম্পর্কীয় বিভিন্ন যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পশ্চিম অংশে এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাঙন দেখা দেয়। এর ফলে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা ক্রমশই রোমের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। একদিকে এই বৈরীতা ও অন্যদিকে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ভাঙন— দুয়ের প্রভাবেই পঞ্চম খ্রিষ্ট রোমের সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগ ভেঙ্গে পড়ে। এই ভেঙ্গে পড়া অংশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের রাজ্য গড়ে তোলে। তবে খ্রিষ্টান চার্চের উদ্যোগে নবম খ্রিষ্টাব্দ থেকে এধরনের কিছু সংখ্যক রাজ্যকে কেন্দ্র করে একটি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে পূর্বতন রোমান সাম্রাজ্যের কিছু ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

কোরিন্থের গ্রীক নগরীর ধ্বংসাবশেষ

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পয়গম্বর মহম্মদের (সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক) শিষ্যরা দামাস্কাসকে কেন্দ্র করে আরব সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই আরবেরা অথবা তাদের উত্তরসুরীরা (যারা প্রাথমিক অবস্থায় বাগদাদ্ থেকে শাসন পরিচলনা করত) সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কনষ্টেনন্টাইনকে কেন্দ্র করে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত যে সমস্ত এলাকা ছিল তা অধিকার করে নেয়। এ অঞ্চলে গ্রীক এবং ইসলাম পরম্পরার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। অঞ্চলটির ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক প্রাচুর্য উত্তরভাগের যাযাবর জাতিগুলোকে এটির প্রতি মনযোগী করে তুলেছিল। এদের মধ্যে বিভিন্ন তুর্কী জনগোষ্ঠী প্রায়ই এই এলাকার নগরগুলিকে আক্রমণ ও দখল করত। জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীরাই সবশেষে এ অঞ্চলকে আক্রমণ করে দখল করবার প্রচেষ্টা করেন। মোঙ্গলেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ, মধ্য এশিয়া এবং চীন দেশ পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

ব্যবসায়িক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবার জন্য ও ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল তার সুফল লাভ করবার লক্ষ্যেই এ অঞ্চলে সাম্রাজ্য গঠন করার প্রতি উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি সাম্রাজ্যই ব্যবসা-বাণিজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছিল। এই সাম্রাজ্যগুলোতে নানা ধরনের সামরিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হয়েছিল। একটি সাম্রাজ্যের অর্জিত সাফল্যের সুফল অনেক সময়েই অন্য সাম্রাজ্য ভোগ করত। কালক্রমে এ অঞ্চলটিতে অন্যান্য ভাষা ছাড়া পার্সী, গ্রীক, ল্যাটিন এবং আরবী ভাষা কথিত এবং লিখিত হতে থাকল।

সাম্রাজ্যগুলোর ভিত কখনোই খুব বেশি দৃঢ় ছিল না। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে সম্পদের অধিকার নিয়ে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব

দামাস্কাতে ৭১৪তে নির্মিত বিখ্যাত মসজিদ

লেগে থাকত। তাছাড়া রাজ্যের উত্তর অঞ্চলের যে সমস্ত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন ও সামরিক দায়িত্ব পালন করে সাম্রাজ্যগুলোকে টিকে থাকতে সাহায্য করত, তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যগুলোর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। এটাও উল্লেখ্য যে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যই নগর কেন্দ্রিক ছিল না। একটি যাযাবর জাতি কি করে সফলতার সঙ্গে দীর্ঘ কাল ধরে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারে তার উদাহরণ চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলের মোঙ্গল সাম্রাজ্য।

বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার লোকগোষ্ঠীর কাছে বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনের ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাসও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত। প্রথম শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইনে প্রবর্তিত খ্রিষ্টধর্ম ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম, দুয়ের ক্ষেত্রেই এ কথার সত্যতা লক্ষ্য করা যায়।

সময়সূচী - ২
(১০০ খ্রিষ্ট পূর্ব থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

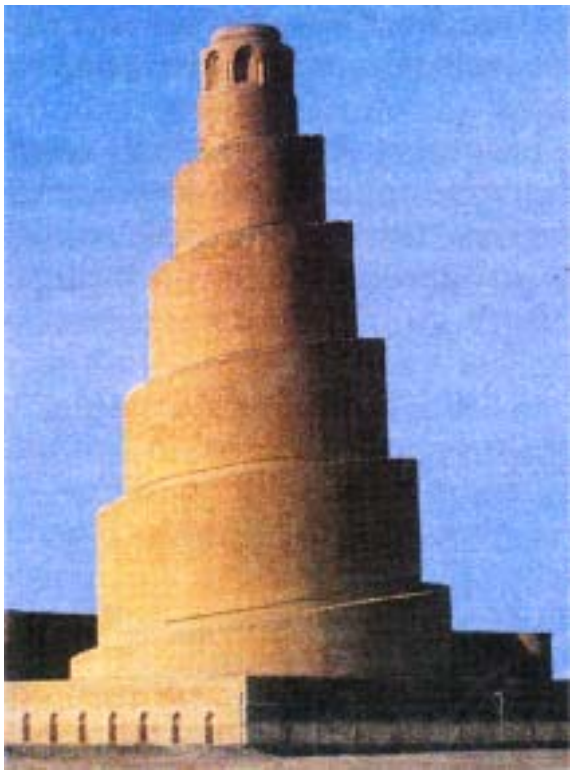

এখানে উল্লিখিত সময়সূচী রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলোর প্রতি আলোকপাত করছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ কতকগুলো, সময় যেমন একাধিক মহাদেশে বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্য আকারে ছিল বিশাল। এই একই সময়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা গড়ে ওঠে এবং মননশীলতার ক্ষেত্রেও নানা প্রতিষ্ঠানে উদ্ভব হয়। লিখিত আকারে বই আত্মপ্রকাশ করবার ফলে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পরস্পরের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের আজকের প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য নানা সামগ্রী এ যুগেই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়।

সময়	আফ্রিকা	ইউরোপ
১০০-৫০ খ্রিঃ পূঃ	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পূর্ব আফ্রিকাতে সমুদ্রপথে কলার আগমন	স্পার্টাকাস ১,০০,০০০ ক্রীতদাসের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন (৭৩ খ্রিঃ পূঃ)
৫০-১	মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা (৫১-৩০ খ্রিঃ পূঃ)	রোমের কলোসিয়ামের নির্মাণ
১-৫০ খ্রিঃ		
৫০-১০০		
১০০-১৫০	আলেকজান্ড্রিয়ার নায়ক বাষ্পবাহিত যন্ত্র তৈরী করেন	রোম সাম্রাজ্য শীর্ষ বিন্দুতে
১৫০-২০০	আলেকজান্ড্রিয়ার টলেমির ভূগোল সংক্রান্ত পুস্তক	
২০০-২৫০		
২৫০-৩০০		
৩০০-৩৫০	অক্সামে খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক	কনষ্টেণ্টাইন সম্রাট হন, কনষ্ট্যান্টিনোপন নগরের পতন করেন
৩৫০-৪০০		রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমভাগে বিভক্ত হয়
৪০০-৪৫০	ইউরোপের ভেণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকাতে রাজ্য স্থাপন করে (৪২৯)	উত্তর এবং মধ্য ইউরোপের জনগোষ্ঠী কর্তৃক রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ
৪৫০-৫০০		গ্বলের ক্লোডিসদের খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তর (৪৯৬)
৫০০-৫৫০		সন্ত বেনিডিক্ট ইটালীতে একটি মঠ স্থাপন করেন (৫২৬), সন্ত অগাষ্টাইন ইংল্যান্ডে খ্রিষ্টধর্ম প্রবর্তন করেন (৫৯৬) মহান গ্রেগরী রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতার পত্তন ঘটান
৫৫০-৬০০		
৬০০-৬৫০	কিছু সংখ্যক মুসলমানের এবিসিনিয়া যাত্রা (৬১৫)	
৬৫০-৭০০	আরবী মুসলমানরা মিশরের দক্ষিণে নুবিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন (৬২৫)	বেডে ইংরেজ চার্চ ও জনগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন
৭০০-৭৫০		
৭৫০-৮০০		
৮০০-৮৫০	ঘানায় রাজ্যের উত্থান	ফ্রান্সের রাজা শার্লেমেনের পবিত্র রোমান সম্রাটের উপাধি লাভ (৮০০)
৮৫০-৯০০		কিভ এবং নবগ্রদে রাশিয়ার প্রথম রাজ্য স্থাপন
৯০০-৯৫০		ভাইকিং-এর পশ্চিম ইউরোপ লুণ্ঠন
৯৫০-১০০০		
১০০০-১০৫০		ইটালীর সেলারিনোতে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন (১০৩০)
১০৫০-১১০০	ঘানা থেকে দক্ষিণ স্পেন পর্যন্ত অ্যালমোরাবিদ রাজত্ব বিস্তার (১০৫০-১১৪৭)	নরম্যান্ডির উইলিয়াম ইংল্যন্ড আক্রমণ করে রাজা হন (১০৬৬); প্রথম ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা (১০৯৫)
১১০০-১১৫০	দূর ব্যবসার ও সোনা এবং তামার শিল্পদ্রব্যের কেন্দ্র	হিসেবে জিম্বাবোয়ের উত্থান (১১২০-১৪৫০)
১১৫০-১২০০	ইথিওপিয়াতে খ্রিষ্টান গীর্জা স্থাপন (১২০০)	নতারদামের গীর্জার নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ (১১৬৩)
১২০০-১২৫০	পশ্চিম আফ্রিকাতে শিক্ষার কেন্দ্র টিম্বক্ট সহ মালী রাজ্য স্থাপন	ত্যাগ ও সহমর্মিতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসিসির সন্ত ফ্রান্সিস একটি ধর্মীয় ধারার প্রবর্তন করেন (১২০৯) আইন অনুযায়ী রাজ্য শাসন করবার নীতি মেনে যে রাজারা মেগ্নাকার্টাতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের লর্ডরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
১২৫০-১৩০০		১৯১৮ খ্রিঃ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়াতে রাজত্বকারী হেপসবার্গ বংশের পত্তন

সময়	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১০০-৫০ খ্রিঃ পূঃ	চীন দেশে হান সাম্রাজ্য, এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্য্যন্ত রেশম পথের বিস্তার	উত্তর পশ্চিমে ব্যাকট্রীয় গ্রীক এবং শকদের সাম্রাজ্য স্থাপন : দক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের উত্থান
৫০-১		দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব ও পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে ব্যবসার বিস্তার
১-৫০ খ্রিঃ	রোম সাম্রাজ্যের জুদাইতে যীশুখ্রীষ্ট; আরবে রোম আক্রমণ (২৪)	
৫০-১০০		উত্তর পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে কুষাণ রাজ্য স্থাপন
১০০-১৫০	চীনদেশে কাগজের আবিষ্কার (১১৮) প্রথম ভূকম্প পরিমাপ যন্ত্রের আবির্ভাব	
১৫০-২০০		
২০০-২৫০	হান সাম্রাজ্যের ইতি; পার্শিয়াতে সামানিদদের শাসন (২২৬)	
২৫০-৩০০	চীনদেশের রাজসভায় (২৬২), চৌম্বক কম্পাসের ব্যবহার (২৭০)	
৩০০-৩৫০		গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা (৩২০)
৩৫০-৪০০		চীনদেশ থেকে ফা-হিয়েনের ভাতরবর্ষে আগমণ (৩৯৯)
৪০০-৪৫০		
৪৫০-৫০০		জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট
৫০০-৫৫০		
৫৫০-৬০০	জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন (৫৯৪) শষ্য আনা নেওয়ার জন্য ৩৪ বছর ধরে ৫০০,০০০০ শ্রমিকের দ্বারা প্রাপ্ত ক্যানেল খনন	বাদামী ও আইহোলে চালুক্য মন্দির
৬০০-৬৫০	চীনদেশে টাং বংশ (৬১৮) মহম্মদের মদিনা গমন, হিজরি সালের প্রবত্তন (৬২২) সেসেনিয় সাম্রাজ্যের পতন (৬৪২)	চীনদেশ থেকে হিউয়েনসাঙ-এর ভারতবর্ষে আগমণ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে নালন্দার অভ্যুদয়
৬৫০-৭০০	উমিয়াদ খলিফাতন্ত্র (৬৬১-৭৫০)	
৭০০-৭৫০	একটি উমিয়াদ গোষ্ঠীর স্পেন বিজয়, চীনদেশে টাং বংশের প্রতিষ্ঠা	আরবদের সিন্ধুপ্রদেশ জয় (৭১২)
৭৫০-৮০০	বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসিদ খলিফাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি ও ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে ওঠে	
৮০০-৮৫০	কম্বোডিয়াতে Khmer রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৮০২)	
৮৫০-৯০০	চীনদেশে প্রথম ছাপানো বই (৮৬৮)	
৯০০-৯৫০		
৯৫০-১০০০	চীনদেশে টাকার ব্যবহার	
১০০০-১০৫০	পার্সী চিকিৎসক ইবন সিনাব লিখিত চিকিৎসা গ্রন্থ শতাব্দীব্যাপী অনুসরিত	গজনীর মাহমুদের উত্তর পশ্চিম আক্রমণ, আলবেরুণীর ভারতবর্ষে গমন, তাঞ্জাভুরে রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মাণ
১০৫০-১১০০	আল্প আর্সালান তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (১০৭৫)	
১১০০-১১৫০	চীনদেশে প্রথম নথিভূক্ত আলোর খেলা	কলহনের রাজতরঙ্গিনী
১১৫০-১২০০	কম্বোডিয়ার শীর্ষে আঙ্কর সাম্রাজ্য, আঙ্করভাটে মন্দিরশ্রেণি	
১২০০-১২৫০	চেঙ্গিস খানের শক্তি দৃঢ়তর (১২০৬)	দিল্লী সুলতানতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১২০৬)
১২৫০-১৩০০	চেঙ্গিস খানের পৌত্র কুবলাই খান চীনদেশের সম্রাট	আমির খসরু নতুন রীতির কবিতা ও গান সৃষ্টি করেন, কোণারকে সূর্য মন্দির

সময়	আমেরিকা	অষ্ট্রেলিয়া /প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
১০০-৫০ খ্রিঃ পূঃ		
৫০-১		
১-৫০		
৫০-১০০		
১০০-১৫০		
১৫০-২০০		
২০০-২৫০		
২৫০-৩০০		
৩০০-৩৫০	ম্যাক্সিকোতে পিরামিড আকৃতি মন্দির সহ টিওটিহুয়াকান নগর প্রতিষ্ঠা, জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চা ও চিত্রের দ্বারা লিখন পদ্ধতির আবির্ভাব।	
৩৫০-৪০০		
৪০০-৪৫০		
৪৫০-৫০০		
৫০০-৫৫০		
৫৫০-৬০০		
৬০০-৬৫০		
৬৫০-৭০০		
৭০০-৭৫০		
৭৫০-৮০০		
৮০০-৮৫০		
৮৫০-৯০০		
৯০০-৯৫০		
৯৫০-১০০০	উত্তর আমেরিকায় প্রথম নগর নির্মাণ (৯৯০)	পলিনেসিয়ার মাওরি নাবিকের নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার
১০০০-১০৫০		
১০৫০-১১০০		পলিনেসিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মিষ্টি আলু (দক্ষিণ আমেরিকা জাত) উৎপাদন
১১০০-১১৫০		
১১৫০-১২০০		
১২০০-১২৫০		
১২৫০-১৩০০		

ACTIVITY

Try and identity at least five events / processes that would have involved the movement of peoples across regions/ continents. What would have been the significance of these events/ processes?

প্রসঙ্গ ৩

তিনটি মহাদেশে জুড়ে সাম্রাজ্যের পত্তন

এক বিস্তৃত অঞ্চলের উপর রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ইউরোপের বহুলাংশ, অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর জমির অধিকাংশ ও উত্তর আফ্রিকা ছিল এই সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত। এই সাম্রাজ্যের গঠন প্রণালী, এর ভাগ্য নির্ধারক রাজনৈতিক শক্তিসমূহ এবং জনসাধারণের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভাজন আমাদের এ অধ্যায়ের উপজীব্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সাম্রাজ্য স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করেছিল এবং আজকের বিভিন্ন দেশের তুলনায় সেখানকার মহিলাদের যথেষ্ঠ আইনি অধিকার ছিল। আবার এক বৃহৎ সংখ্যক জনগণকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে এখানকার অর্থনীতি অনেকাংশে ক্রীতদাস প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল। পঞ্চম শতাব্দী থেকে সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে ভাঙন দেখা দিলেও পূর্বভাগ ছিল অটুট এবং আশ্চর্যজনকভাগে বিত্তশালী। পরবর্তী অধ্যায়ে যে খলিফাদের কথা বলা হয়েছে তারাই এই ঈশ্বর্য ও সম্পদ গড়ে তুলেছিলেন এবং এর নগর কেন্দ্রিক এবং ধর্মীয় পরম্পরার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন।

রোমান ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকদের কাছে যথেষ্ঠ উপাদান সংরক্ষিত রয়েছে। এই উপাদানগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি— (ক) বই (খ) লিখিত উপাদান (গ) ধ্বংসাবশেষ।

(ক) বই বলতে বোঝানো হচ্ছে সমসাময়িক লেখকদের রচিত ইতিহাস (বছর অনুসারে লিখিত হত বলে এই রচনাগুলিকে বলা হয় Annals), চিঠিপত্র, বিভিন্ন বক্তৃতা, উপদেশাবলী ও তখনকার আইন-কানুন। (খ) লিখিত উপাদান বলতে মূলতঃ লিপি এবং প্যাপরি। লিপিগুলো পাথরে খোদাই করা হত বলে, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত বহু লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। নীল নদের তীরে নলখাগড়া জাতীয় বিশেষ একধরণের গুল্ম জন্মাত, যার নাম ছিল প্যাপিরাস। এই প্যাপিরাস থেকে উৎপাদিত হত কাগজের মত জিনিষ; যা সে যুগে লেখার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। প্যাপিরাস বিশেষজ্ঞরা এই প্যাপিরাসে লিখিত বহু দলিল, হিসেবপত্র ও চিঠি উদ্ধার করেছেন। (গ) খননকার্য ও ক্ষেত্র পরিদর্শনের মাধ্যমে পুরাতত্ত্ববিদেরা নানা ধরনের স্থাপত্য, মৃতশিল্প ও মুদ্রার সন্ধান পেতে পারেন। সুচারুভাবে ব্যবহার করতে পারলে এ সমস্ত উপাদানকে অবলম্বন করে আমরা অতীত দিনের এক জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারি।

প্যাপিরাসের গোটানো লিপি

যীশু খ্রিষ্টের জন্মের সময় থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে রোমান ও ইরাণী এই দুই শক্তিশালী সামাজ্য ইউরোপের বিশাল অংশ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের উপর রাজত্ব করেছিল। এই দু'টি শক্তির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে তাদের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়েই তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় একটি সংকীর্ণ স্থলভাগ প্রতিবেশী এই দুই সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং এই সূত্রে রোমের বিরোধী শক্তি ইরাণের কথাও উল্লেখিত হবে।

মানচিত্র ১ :
ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা

মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্ররাশি ইউরোপ ও আফ্রিকাকে বিভাজিত করেছে। এই ভূমধ্য সাগরই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। ভূমধ্যসাগর এবং তার উত্তর ও দক্ষিণভাগে রোমের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

উত্তরে রাইন ও ডেনিয়ুব নদী ও দক্ষিণে বিস্তৃত সাহারা মরুভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল রোমান সাম্রাজ্য। অন্যদিকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক থেকে আরব দেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ছিল ইরানী সাম্রাজ্যের অধীন। কখনো কখনো আফগানিস্তানের বড় অংশও ইরানীরা দখল করে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছে। সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশই এই দুই বৃহৎ শক্তির অধিকারে চলে যায়। এদের অধিকৃত অঞ্চলকে চীনারা তা চীন বা বৃহত্তর চীন বলে বর্ণনা করত (ব্যাপক অর্থে পশ্চিম অঞ্চল)।

প্রাচীন সাম্রাজ্য :

তৃতীয় শতাব্দীকে বিভাজন কাল ধরে রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— প্রাচীন ও উত্তর। অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়কে 'প্রাচীনকাল' ও পরবর্তী সময়কে 'উত্তরকাল' বলে ধরা যেতে পারে।

রোমান ও ইরানী সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়— রোমান সাম্রাজ্য ছিল বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। সেই সময় ইরাণী সাম্রাজ্যের শাসক পার্থিয়ানরা এবং পরবর্তীতে সেসেনীয়ানরা যে এলাকার উপর তাদের শাসন কায়েম করেছে তা ছিল বহুলাংশে ইরানী অধ্যুষিত। অন্যদিকে বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতি অধ্যুষিত রোমান সাম্রাজ্য শুধুমাত্র একটি শাসনব্যবস্থার সূতোয় গাঁধা ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যে বহু ভাষার প্রচলন থাকলে ও শাসন কার্যে শুধুমাত্র গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করা হত। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা পূর্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করত। ভাষিক অঞ্চলের বিভাজন প্রসারিত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে আফ্রিকার ট্রিপলিটানিয়া (ল্যাটিন ভাষা) এবং সিরিনিকা (গ্রীক ভাষা) রাজ্যকে বিভাজিত করে। সাম্রাজ্যের যে কোন অংশে বসবাসকারী, যে কোন ভাষিক লোকই শুধুমাত্র সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল।

খ্রিষ্ট পূর্ব ২৭ অব্দে প্রথম রোমান সম্রাট অগাষ্টাসের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে বলা হত প্রিন্সিপেট। যদিও অগাষ্টাস ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র কেন্দ্র তবু রোম প্রজাতন্ত্রের আমলের একটি কল্পাকাহিনী ছিল যে অগাস্টাস শুধুমাত্র মূখ্য নাগরিক, (ল্যাটিন ভাষায় প্রিন্সেপ) চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নন। রোমে প্রজাতন্ত্রের আমলে শতাধিক বর্ষব্যাপী সমস্ত ক্ষমতার উৎস ছিল সিনেট নামক প্রতিষ্ঠান। অভিজাত শ্রেণীর প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম অবস্থায় রোমান ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও পরবর্তীতে এখানে ইটালীয় বংশোদ্ভূতরাও সুযোগ পেতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত রোমের যে সমস্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যায় তার অধিকাংশই এই সিনেটের সদস্যদের লিখিত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সিনেটের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে সম্রাটদের মূল্যায়ন করা হত। সিনেট বিদ্বেষী সন্দেহপ্রবণ, অমা নবিক শাসকদের কখনোই সু-নজরে দেখা হত না। সিনেটের কিছু সংখ্যক সদস্য প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদিও অন্যরা এর অবাস্তবতা অনুভব করতে পেরেছিলেন।

সম্রাট ও সিনেটের পর শাসন ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল সামরিক বাহিনী। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী পারসিক সাম্রাজ্যের মত এখানে সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের বেতনভুক পেশাদার সামরিকবাহিনীতে সৈন্যদের ন্যূনতম ২৫ বছর কাজ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে এই বেতনভুক সামরিকবাহিনী ছিল রোমান সাম্রাজ্যের বৃহত্তম সংগঠিত প্রতিষ্ঠান। শাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই সামরিক বাহিনী। সৈন্যরা ক্রমাগত তাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও উপযুক্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেত। কখনও কখনও সৈন্যরা সেনাপতি বা সম্রাটের দ্বারা অবহেলিত বোধ করলে এই আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ করত। তবে রোমান সেনাবাহিনীর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আমরা

অল্পসংখ্যক বিত্তবান পরিবারের সদস্যরা ছিলেন নোবেল সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শ্রেণির আধিপত্যে গঠিত হত সিনেট নামক প্রতিষ্ঠান। প্রজাতন্ত্র নামক শাসন ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা থাকত সিনেটের হাতে। প্রকৃতপক্ষে সিনেটের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করা হত বলে প্রজাতন্ত্র নোবেলদের ভাবনা-চিন্তাই প্রতিফলিত হত। ৫০৯ খ্রিষ্ট পূর্ব থেকে ২৭ খ্রিষ্ট পূর্ব পর্য্যন্ত ক্ষমতায় থাকা প্রজাতন্ত্রকে উৎখান করেন জুলিয়াস সীজারের দত্তক পুত্র অক্টাভিয়ান। অক্টাভিয়ান পরবর্তীতে অগাষ্টাস নাম গ্রহণ করেন। সিনেটের সদস্যপদের জন্য পারিবারিক পটভূমির চাইতে বিত্ত এবং জীবিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। সদস্যরা সারাজীবনের জন্য এই পদ লাভ করতেন।

** A conscripted army is one which is forcibly recruited : military service is compulsory for certain groups or categories of the population.

পাই সিনেটের সদস্যদের বিবরণ থেকে। যেহেতু সেনাবাহিনী যে কোন সময়ে অপ্রত্যাশিত অস্থিরতার সৃষ্টি করে থাকত, তাই, এদের প্রতি সিনেটের সদস্যদের ভীতি ও ঘৃণা মিশ্রিত মনোভাব ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে যখন প্রশাসন ক্রমবর্দ্ধমান সেনাবাহিনীর খরচ বহন করবার জন্য বিপুল পরিমাণ কর আারোপ করতে বাধ্য হয় তখন দেশে এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

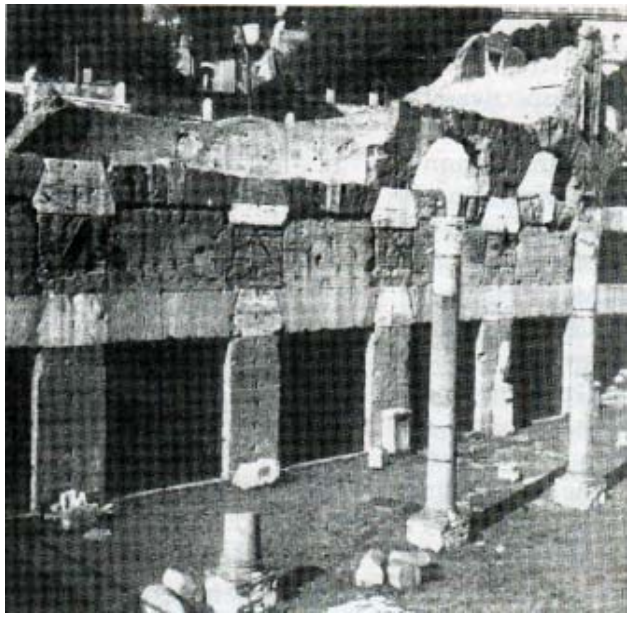

রোমে ৫১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পরে নির্মিত দোকানপাট

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যর রাজনৈতিক ইতিহাসে মুখ্য ভূমিকা অধিকার করেছিলেন সম্রাট, অভিজাত সম্প্রদায় ও সামরিক বাহিনী। সামরিক বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপরেই যে কোন সম্রাটের সাফল্য নির্ভর করত। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবেই সৃষ্টি হত গৃহযুদ্ধ। এ ব্যাপারে ৬৯ খ্রিষ্টাব্দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যখন অতি অল্পদিনের মধ্যে চারজন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এ বছরটি ছাড়া প্রথম দু শতাব্দীর শাসন ছিল তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ। পারিবারিক উত্তরাধিকারের সূত্রেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হত। সামরিক বাহিনীও এই প্রথার বিরোধিতা করেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে রোমান সম্রাটদের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা টিবেরিয়াস (১৪-৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) রাজা অগাষ্টাসের নিজের পুত্র ছিলেন না। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারের স্বার্থে অগাষ্টাস তাকে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম দু'শতাব্দীতে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে ও রোমানদের কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি। অগাষ্টাসের পরে টিবেরিয়াস এত বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন যে আর কোন ধরনের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। দীর্ঘ আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও সামরিক অভিযানের পর 'অগাষ্টাসের যুগ' দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় অর্থহীন রাজ্যদখল এসময়কার একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারমূলক অভিযান। ১১৩ থেকে ১১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ সাম্রাজ্যে টিবেরিয়াসের উত্তরাধিকারীরা পরিত্যাগ করেন।

১. একটি দেশের ভিতর ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বলা হয় গৃহযুদ্ধ। এখানে দুই বা ততোধিক দেশ জড়িত থাকে না।

The Emperor Trajan's Dream – A Conquest of India?

'Then, after a winter (115/16) in Antioch marked by a great earthquake, in 116 Trajan marched down the Euphrates to Ctesiphon, the Parthian capital, and then to the head of the Persian Gulf. There [the historian] Cassius Dio describes him looking longingly at a merchant-ship setting off for India, and wishing that he were as young as Alexander.'

– Fergus Millar, *The Roman Near East.*

রোমান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অঞ্চলের এলাকাগুলো ছিল নিকট প্রাচ্য। এ অঞ্চলের মধ্যে সিরিয়ার রোমান রাজ্য, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং ব্যাপক অর্থে আরবের মত পারিপার্শ্বিক এলাকাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রত্যক্ষ রোমান শাসনের বিস্তার। নিকটপ্রাচ্যে অসংখ্য রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিমদিকের সমস্ত রাজ্যগুলিকে রোমান সাম্রাজ্য গ্রাস করে নেয়। (ঘটনাচক্রে এরকম কিছুসংখ্যক রাজ্য ছিল যথেষ্ট সম্পদশালী। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে রাজা হেরোডের রাজ্য থেকে ৫.৪ মিলিয়ন ডেনারি প্রতিবছর আদায় হত। (১২৫০০০ কেজি সোনার সমমূল্য।) নিখাদ রূপো দিয়ে তৈরি রোমান মুদ্রাকে বলা হত ডেনারিয়াস।

প্রকৃতপক্ষে ইটালি ছাড়া সাম্রাজ্যের বাকি সমস্ত অঞ্চল করদ রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হত। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিস্তারের কালে রোমান সাম্রাজ্য স্কটল্যাণ্ড থেকে আর্থেনিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এবং সাহারা অঞ্চল থেকে ইউফ্রেটিস নদী বা তার পরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল যার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ মিলিয়ন। আধুনিক যুগের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা না থাকায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে সম্রাটের পক্ষে এত বিশাল ও ভিন্ন জাতি অধ্যুষিত এলাকায় শাসন কার্য পরিচালনা কেমন করে সম্ভব হত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় সাম্রাজ্যের নগরায়ণের ফলেই এই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

এই স্থানীয় রাজ্যগুলি ছিল রোমের খরিদ্দার। প্রয়োজনে এখানকার শাসকেরা রোমের সমর্থনে তাদের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতেন, পরিবর্তে তাদের অবস্থান রোম সমর্থন করত।

ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে গড়ে উঠা নগরীগুলোই ছিল শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রভূমি। এদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল Carthange, Alexandria এবং Antioch। এই নগরীগুলোর মাধ্যমেই 'সরকার' বিত্তবান শহরতলী অঞ্চলগুলোর উপর কর আরোপ করত। এ থেকে স্পষ্ট যে স্থানীয় উচু শ্রেণির নাগরিকেরা রাষ্ট্রের সঙ্গে শাসন ও কর আদায় ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করত। রোমের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল ইটালি ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার স্থানান্তর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী ব্যাপী সময়ে রাজ্য পর্য্যায়ের উচু শ্রেণীভুক্ত পরিবার থেকে রাজ্য শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী এবং সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হত। সম্রাটের স্নেহধন্য এই গোষ্ঠী শাসন ও সামাজিক প্রধানদের একটি নতুন শ্রেণী তৈরী করেছিল যারা কালক্রমে সিনেটের সদস্যদের চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। জানা যায় যে সিনেটরদের কবল থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্যই গ্থেলেনাস (২৫৩-৬৮) তাদের সামরিক বাহিনীতে নিযুক্তি রদ করেন।

Port Du Cprd, Nimes, France. খ্রিষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত জলবাহিত হবার প্রণালী

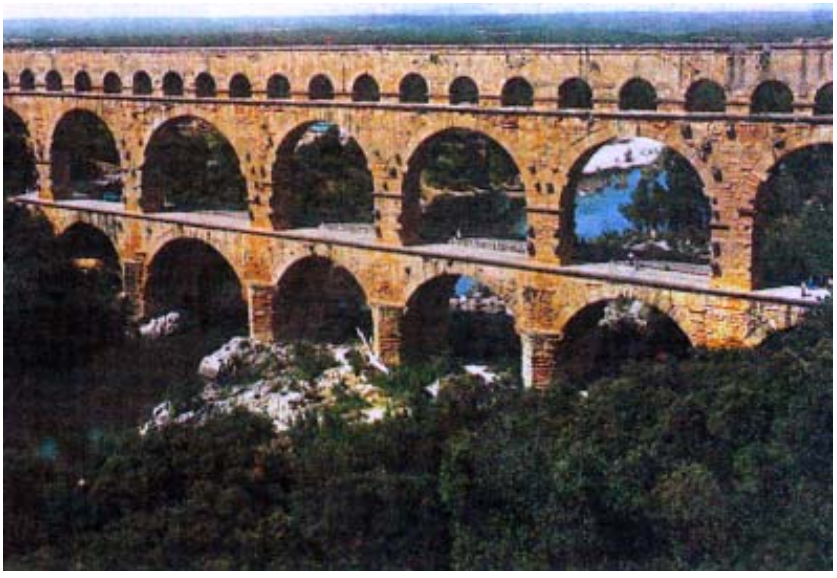

প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ, দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে সামরিক বাহিনী ও শাসনকার্য্যে নিযুক্তি মূলতঃ রাজ্যগুলো থেকেই দেওয়া হত। কিন্তু ইটালির নাগরিকেরা তৃতীয়

শতাব্দী পর্যন্ত সিনেটে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। তার পরবর্তীতে রাজ্যস্তর থেকে আগত সিনেটররা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ধারা দক্ষিণ স্পেন, আফ্রিকা ও পূর্বাংশের মত ভূমধ্যসাগরের সম্পদশালী ও নগর কেন্দ্রিক অংশগুলোতে নতুন বিদগ্ধ নাগরিক শ্রেণির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যের ভিতর ইটালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতন সূচিত করে। নিজস্ব শাসক, নগরী পরিষদ ও অধীনস্থ কয়েকটি গ্রাম এলাকা সহ একটি শাসন কেন্দ্রকেই রোমান ধারণা অনুযায়ী নগর বলে আখ্যায়িত করা হত অর্থাৎ একটি নগরী কখনোই অন্য নগরের অন্তর্ভূক্ত হতে পারত না। তবে গ্রামের ক্ষেত্রে এর অন্যথা হতে দেখা যায়। রাজার সঙ্গে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কোনো গ্রামকে নগরের স্তরে উন্নীত করা হত অথবা তার বিপরীত ঘটনাও ঘটত। নগরী-জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সুব্যবস্থা থাকবার ফলে খাদ্য সংকট অথবা দুর্ভিক্ষের কালে এখানে শহরতলীর তুলনায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকতো।

কার্যক্রম ১:
রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের তিন প্রধান কুশীলব কারা ছিলেন? তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে দু-একটি লাইন লিখ। কিভাবে রোমান সম্রাটরা এত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন? কোন কোন যোগসূত্রের ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন সম্ভব হয়েছিল?

Doctor Galen and how Roman Cities Treated the Countryside

"The famine prevalent for many successive years in many provinces has clearly displayed for men of any understanding the effect of malnutrition in generating illness. The city-dwellers, as it was their custom to collect and store enough grain for the whole of the next year immediately after the harvest, carried of all the wheat, barley, beans and lentils, and left to the peasants various kind of pulse – after taking quite a large proportion of these to the city. After consuming what was left in the course of the winter, the country people had to resort to unhealthy food in the spring; they ate twigs and shoots of trees and bushes and bulbs and roots of inedible plants...'

– Galen, On Good and Bad Diet.

রোমান নাগরিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গণ স্নানাগার (কোনো বিশেষ ইরাণী শাসক ইরাণে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে যাজকদের রোষের সম্মুখীন হনহু তাদের অভিমত ছিল গণ স্নানাগার ব্যবহার করা হলে জলের পবিত্রতা নষ্ট হবে)। এছাড়াও নগরবাসী দের জন্য নানা রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। যেমন, একটি হিসেব থেকে জানা যায় বছরের প্রায় ১৭৬ দিন বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো।

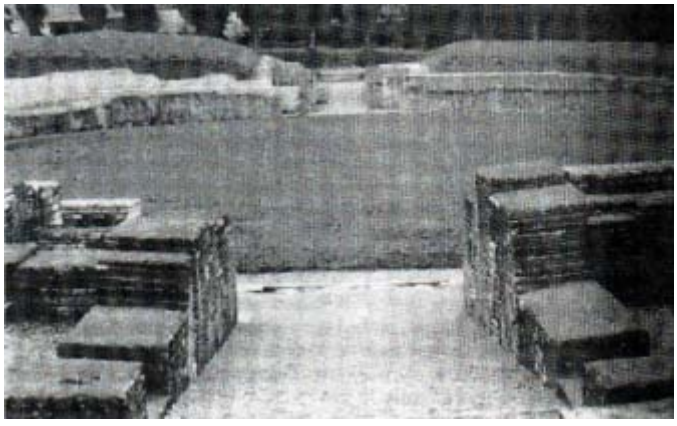

সৈন্য কুচকাওয়াজের ও তাদের জন্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে রোমান সেনা শহর ভিন্দনিসাতে অবস্থিত প্রথম শতকে নির্মিত এ্যাম্ফিথিয়েটার।

তৃতীয় শতকের সংকট

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীকে মূলতঃ শান্তি, সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিস্তারের সময় বলে মনে করা হলেও তৃতীয় শতাব্দীতে আভ্যন্তরীণ অশান্তির সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। ২৩০ খ্রিষ্ট পূর্ব থেকে রোমান সাম্রাজ্য একসাথে নানা দিকে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইরাণে ২২৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে একটি নতুন আগ্রাসী রাজবংশ (যারা নিজেদের সেসেনিয়ান বলে অভিহিত করত) ক্ষমতায় আসে এবং মাত্র ১৫ বছর সময়কালের মধ্যে তারা ইউফ্রেটিস নদীর দিকে দ্রুত রাজ্য বিস্তার করে। তিনটি ভাষায় খোদিত একটি শিলালিপিতে ইরাণী শাসক প্রথম শাহাপুর দাবী করেন যে তিনি ৬০,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট রোমান সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন ও সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের রাজধানী আন্টিয়ক অধিকার করেন। ইতিমধ্যে জার্মান উপজাতিদের এক বিশাল গোষ্ঠী রাইন ও দানিয়ূব সীমান্তের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। ফলে ২৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে কৃষ্ণসাগর থেকে আল্পস্ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বহু আক্রমণের মুখোমুখি হয়। রোমানরা যাদের বর্বর বলে অভিহিত করত তাদের বিরুদ্ধে এ সময়কার রোমান সম্রাটদের অনবরত যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে এবং দানিয়ূব নদীর অন্যদিকের বহু এলাকা তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তৃতীয় শতাব্দীতে দ্রুত সম্রাট পরিবর্তন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংকটের পরিচায়ক।

নারীর অবস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি

রোমান সাম্রাজ্যের একটি অতি আধুনিক প্রথা ছিল অনুপরিবারের অস্তিত্ব। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা যেমন বাবা-মায়ের সঙ্গে এক পরিবারে বাস করত না তেমনি প্রাপ্তবয়স্ক ভাইয়েরাও এক বাড়ীতে বসবাস করত না। অন্যদিকে ক্রীতদাসেরা ছিল রোমান পরিবার ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ পর্যায়ে এক বিশেষ বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। প্রথা অনুযায়ী বিবাহের পরও মহিলাদের তাদের বাবা মায়ের সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকত। কন্যাপণ প্রথার প্রচলন থাকলেও মহিলারা বাবার মৃত্যুর পর তার সম্পতির অধিকারী হতেন। সুতরাং রোমান মহিলারা সম্পত্তি ভোগ ও দেখাশোনার ব্যাপারে যথেষ্ট আইনী অধিকার ভোগ করতেন। অন্যভাবে বলা যায় বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী স্ত্রীর স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক মর্যাদা ছিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। স্বামী বা স্ত্রীর তরফে বিচ্ছেদের চাহিদা সহ একটি আবেদনই ছিল এ ব্যাপারে যথেষ্ট। অন্যদিকে ছেলেরা ২৮-২৯ থেকে ৩১-৩২ বছর বয়সে বিবাহ করলেও মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হত ১৮-১৯ থেকে ২১-২২ বছরের মধ্যে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তারতম্য নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি করত। সাধারণতঃ সম্বন্ধ করে বিবাহ হলেও মহিলারা পুরুষের আধিপত্যের শিকার হতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় উত্তর আফ্রিকাতে কাটিয়ে বিখ্যাত যাজক অগাষ্টিন[১] তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। অগাষ্টিনের বয়ান অনুযায়ী তার বাবা তার মাকে নিয়মিতভাবে শারীরিক লাঞ্ছনা করতেন। যেখানে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন সেখানকার অধিকাংশ মহিলারই এই অভিজ্ঞতা ছিল। সবশেষে সন্তানের উপর পিতার আইনি অধিকার এমন পর্য্যায়ের ছিল যে অবাঞ্ছিত সন্তানের প্রাণনাশের চেষ্টাও দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হত না।

১. ৩৯৬ খ্রিঃ থেকে সন্ত অগাষ্টাইন ছিলেন উত্তর আফ্রিকার হিপ্পো নগরের বিশপ। চার্চের বৌদ্ধিক ইতিহাসে তার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে বিশপদের স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে এবং তারা যথেষ্ট ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বলা বাহুল্য যে সাধারণ শিক্ষিত জনের সংখ্যা সাম্রাজ্যের নানা অংশে সমান ছিল না। যেমন, সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে ৭৯ খ্রিষ্টাব্দে আগ্নেয়গিরির উদগীরণে ধ্বংস প্রাপ্ত পম্পেইতে সাধারণ শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। পম্পেই নগরীর প্রধান সড়কগুলোর পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপনের ও সমস্ত নগরীতে দেওয়াল লিখনের সন্ধান পাওয়া যায়।

২. প্রাত্যহিক জীবনে লেখা পড়ার প্রচলন।

পম্পেই নগরীর একটি কৌতুককর দেওয়াল লিখন 'Wall, I admire you for not collapsing in ruins

When you have to support so much boring writing on you'

বিপরীত দিকে মিশরে যথেষ্ট পরিমাণে প্যাপিরা পাওয়া গেলেও এখানকার দলিল-পত্র সাধারণঃ লিপিকরদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে দলিলকর্তারা ছিলেন অশিক্ষিত। তবে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণি, যেমন, যোদ্ধা, সামরিক আধিকারিক ও ভূসম্পত্তি পরিচালকদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল ব্যাপক।

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবস্থান, ভিন্ন স্থানীয় ধর্মাচার, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সংগঠন ও বসবাসের ধরণের ভিন্নতার মধ্যে এই অনৈক্য প্রকাশ পেত। নিকট পূর্বে অ্যারামিক ভাষীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠী। (অন্ততঃ ইউফ্রেটিসের পশ্চিমভাগে) মিশরে কপ্টিকভাষা, উত্তর আফ্রিকাতে পিউনিক এবং বারবার ভাষা, স্পেনের উত্তর পশ্চিমে কেলটিক ভাষা কথিত হত। কিন্তু এই ভাষাগুলোর অধিকাংশেরই কোন লিখিত রূপ ছিল না। আর্মেনিয়ান ভাষা লিখিতরূপ পায় পঞ্চম শতকে। অন্যদিকে কপ্টিক ভাষা? বাইবেল অনুদিত হয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে। অন্যত্র কেল্টিকের মতন বহুল প্রচলিত ল্যাটিন ভাষার প্রসারের ফলে অবলুপ্ত হয়ে যায়। প্রথম শতকের পর কেল্টিক ভাষার লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

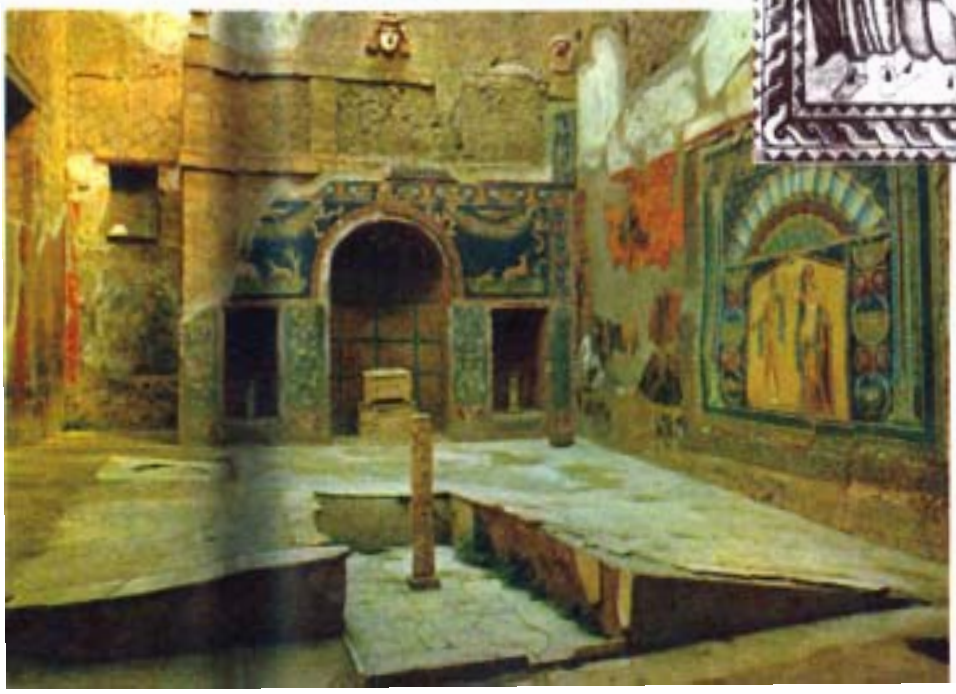

Edessa তে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শতাব্দীর চিত্র। সিরীয় লিপি থেকে জানা যায় রাজা আবগারের স্ত্রী ও তার পরিবারকে চিত্রিত করা হয়েছে।

পম্পেইঃ এক সুরা ব্যবসায়ীয় ভোজন কক্ষ। এ কক্ষের দেওয়ালে পৌরাণিক জীব-জন্তুর ছবি চিত্রিত করা হয়েছে।

কার্যক্রম ঃ ২
রোমান সাম্রাজ্যের মেয়েদের স্বাধীনতা কতটুকু ছিল? রোমান পরিবারের সঙ্গে আজকের ভারতবর্ষের পারিবারিক পরিস্থিতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঃ

বন্দর, পাথর খাদ, খনি, ইটভাটা, অলিভ অয়েল (জলপাই তেল) কারখানা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে রোমান সাম্রাজ্যের একটি শক্ত অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। গম, সুরা ও অলিভ অয়েলের মত বহুল ব্যবহৃত সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে কেনা-বেচা হত। অনুকূল আবহাওয়াতে এ ধরণের সামগ্রী স্পেন, গ্যালিক প্রদেশ, উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও কিছু পরিমাণে ইটালিতে উৎপন্ন হত। সুরা ও অলিভ অয়েলের মত তরল পদার্থ 'amphorae' নামক পাত্রে পাঠানো হত। এসমস্ত পাত্রের খোলামকুচির মত ভগ্নাংশ যথেষ্ট পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। (রোমের Monte Jestaccioতে ৫০ মিলিয়ন পাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যায়) পুরাতাত্ত্বিকরা এগুলো থেকে পাত্রগুলোর আকার ও তাদের বহণ করা দ্রব্যের ধরণ সম্বন্ধে অনুমান করেছেন। ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অংশে খোদাই করা অসংখ্য গহ্বরের মাটির সঙ্গে উল্লিখিত পাত্রগুলোতে ব্যবহৃত মাটির ধরণের সাদৃশ্য দেখা যায়। এ থেকে এগুলো কোন অঞ্চলে তৈরী করা হয়েছিল সে সম্বন্ধেও পুরাতত্ত্ববিদরা ধারণা করেছেন। স্পেনের অলিভ অয়েলের উদাহরণ দিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় যে এই বিশেষ দ্রব্যটির বাণিজ্য ১৪০ থেকে ১৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে চূড়ান্তে পৌছয়। এই সময়ে স্পেনের অলিভ অয়েল সাধারণঃ Dressel 20 নামক পাত্রে রাখা হত (আবিষ্কারক পুরাতত্ত্ববিদের নাম অনুসারে পাত্রের নামকরণ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে Dressel 20 র ভগ্নাংশ যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকায় ধারণা করা যায় এখানে স্পেনের অলিভ অয়েলের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এ ধরণের প্রমাণের (বিভিন্ন ধরণের amphorae-র ভগ্নাবশেষ ও তাদের প্রাপ্তিস্থান) ভিত্তিতে পুরাতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন যে অলিভ অয়েল বাজারজাত করবার ব্যাপারে স্পেনীয় উৎপাদকেরা ইটালিয়দের চাইতে বেশী সফল হয়েছিলেন। একমাত্র স্পেনীয় উৎপাদকেরা কম দামে তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট মানের তেল বাজারজাত করবার ফলে এটা সম্ভব হয়েছিল। আবার অন্যদিক থেকে নিজেদের উৎপাদিত জিনিষ বাজারজাত করবার ব্যাপারে বিভিন্ন এলাকার বড় বড় ভূস্বামীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল। জলপাই উৎপাদনকারীদের মধ্যে স্পেনের পরেই সাফল্য অর্জন করেছিল উত্তর আফ্রিকা। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী ব্যাপী কালে, সাম্রাজ্যের এই অংশের উৎপাদনকারীদের আধিপত্য বজায় ছিল। পরবর্তীতে ৪২৫ খ্রিষ্টাব্দের পর উত্তর আফ্রিকার

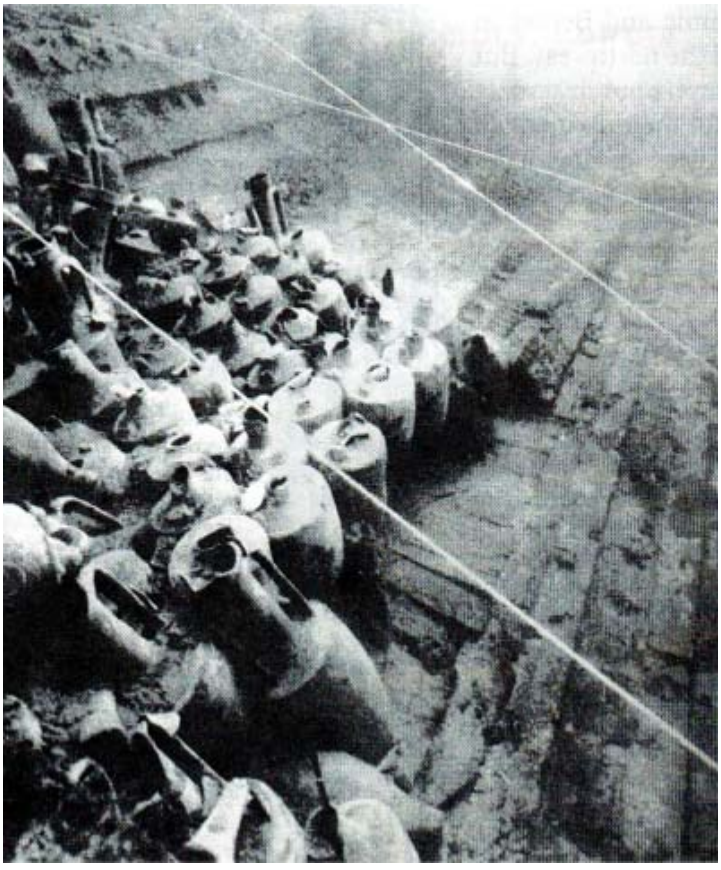

Shipwreck off the south coast of France, first century BCE. The amphorae are Italian, bearing the stamp of a producer near the Lake of Fondt.

আধিপত্য স্থানান্তরিত হয়ে যায় পূর্বের দিকে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এজিয়ান, এশিয়া মাইনরের দক্ষিণভাগ (টার্কি), সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন ছিল সুরা ও অলিভ অয়েলের প্রধান রপ্তানীকারী। এ সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, আফ্রিকাতে তৈরী হওয়া মৃৎপাত্রের সন্ধানও কম পাওয়া যায়। কোন এলাকা কিভাবে তাদের উৎপাদিত জিনিষের মান উন্নীত করে তা বাজারজাত করতে পারবে তার উপরেই সেই এলাকার সমৃদ্ধি নির্ভর করত।

মৃতপাত্রের ভগ্নাংবশেষ নিয়ে যে পুরাতাত্ত্বিকরা গবেষণা করেন তাদের কাজের ধরণ গোয়েন্দাদের মত। কেন, বলতে পার? মৃতপাত্রগুলো থেকে রোমান যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় কি?

রোমান সাম্রাজ্যের বহু এলাকা ছিল যথেষ্ট উর্বর। ষ্ট্র্যাবোও প্লিনীর মত অনুযায়ী ইটালির ক্যাম্পেনিয়া, সিসিলি, মিশরের ফায়াম, থ্রেলীলি, বাইজেন্টিয়াম (টিউনিসিয়া), দক্ষিণ গ্বল এবং বেটিকা (দক্ষিণ স্পেন) ছিল সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী ও ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। সব চাইতে উৎকৃষ্ট মানের সুরা ক্যাম্পেনিয়াতে তৈরী হত। সিসিলি এবং বাইজেসিন্টয়াম থেকে রোমে যথেষ্ট পরিমাণ গম রপ্তানি হত। থ্রেলীলিতে নিবিড়ভাবে জমি চাষ করা হত (ঐতিহাসিক জোসেফাস লিখেছেন যে সেখানকার অধিবাসীরা প্রতি ইঞ্চি জমি চাষ করত) এবং স্পেনে প্রাপ্ত অলিভ অয়েল মূলত দক্ষিণ স্পেনের Guadalquivir নদীর তীরবর্তী এলাকাতে তৈরী হত।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিস্তৃত অঞ্চল ছিল অনেকটাই অনুন্নত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নুমিডিয়ার শহরতলী অঞ্চলের মেষপালক ও যাযাবর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বিচিত্র ধরণের কুড়েঘরে (mapalia) সহ প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করত। উত্তর আফ্রিকাতে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করায় সেখানকার চারণভূমির পরিমাণ কমে এসেছিল এবং মেষপালকদের চলাচলও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। এমনকি স্পেনেরও উত্তরাংশও ছিল যথেষ্ট অনুন্নত। কেল্টিক ভাষী কৃষক সম্প্রদায় এ অঞ্চলে পাহাড়ের চূড়াদেশে অবস্থিত গ্রামগুলোতে বসবাস করত। এ ধরণের গ্রামকে বলা হত Castella। রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় এই বৈষম্যগুলো সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে।

পশুপালকেরা তাদের পালিত পশুর চারণভূমির খোঁজে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর উচু পাহাড়ী এলাকা থেকে নিম্ন সমভূমি এলাকাতে যাতায়াত করত।

প্রাচীন যুগ হলেও এ ধারণা করা উচিৎ নয় যে সে সময়কার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ছিল আদিম ও অনুন্নত। বরঞ্চ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলশক্তির বহুল ব্যবহার, জলশক্তি নির্ভর কারখানাগুলোর উন্নত পরিকাঠামো, সেখানকার সোনা ও রূপোর খনিগুলোতে হাইড্রোলিক খনন প্রক্রিয়া এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী খনিগুলোতে ব্যবহৃত দৈত্যাকার পরিমাপ যন্ত্র, সংগঠিত বাণিজ্যিক পরিকাঠামো এবং মুদ্রার বহুল ব্যবহার, সুসংহত রোমান অর্থনীতির-ই ইঙ্গিত বহন করে। এখান থেকে আবার শ্রমিক ও ক্রীতদাস প্রথা সংক্রান্ত প্রসঙ্গ আসে।

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ

প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও নিকট প্রাচ্যে ক্রীতদাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে খ্রিষ্টান ধর্মের উত্থান ও বিকাশ ঘটলেও ক্রীতদাসপ্রধার অস্তিত্ব নিয়ে কখনো কোনও প্রশ্ন দেখা দেয় নি। এও সত্যি নয় যে রোমান অর্থনীতিতে অধিকাংশ কঠোর পরিশ্রমের কাজ ক্রীতদাসেরাই করত। প্রজাতন্ত্রের অবস্থানকালেন ইটালির অধিকাংশ এলাকার ক্ষেত্রে এ কথা কিছুটা সত্য হলেও, সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল

অন্যরকম। (রাজা অগাস্টাসের আমলে ইটালির মোট ৭.৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩ লক্ষ ছিল ক্রীতদাসশ্রেণীভুক্ত) ক্রীতদাসেরা ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে এক ধরণের বিনিয়োগ এবং অন্ততঃ একজন রোমান কৃষি বিষয়ক লেখক ভূস্বামীদের ক্রীতদাস ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। তার বক্তব্য ছিল যে, শষ্য সংগ্রহের মত কাজ, যেখানে অত্যধিক সংখ্যক ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার মতন রোগে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা আছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রীতদাসেদের ব্যবহার বন্ধ হওয়া উচিৎ। তবে এটা ভেবে নিলে ভুল হবে যে ক্রীতদাসদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব থেকে এ কথা বলা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিচার ও বিশ্লেষণ করেই এ ধরণের মন্তব্য করা হয়েছিল। আবার রোমান উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা দাসদের প্রতি ব্যবহারে অমানবিক হলেও সাধারণ লোক তাদের প্রতি ছিল সমহানুভূতিশীল। রাজা নীরোর আমলের একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা একজন ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন।

On the Treatment of Slaves

'Soon afterwards the City Perfect, Lucius Pedanius Secundus, was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must be executed. But a crowd gathered, eager to save so many innocent lives; and rioting began. The senate-house- was besieged. Inside, there was feeling against excessive severity, but the majority opposed any change (....) [The senators]f favouring execution [revented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict, and lined with troops the whole route along which those condemned were taken for execution.'

– Tacitus (55-117), historian of the early empire

প্রথম শতাব্দীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে এসে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সং! ক্রীতদাসদের সংখ্যা কমে আসছিল। ক্রীতদাস ব্যবহারকারীদের এ পরিস্থিতিতে ক্রীতদাসদের প্রজনন বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হতে অথবা ঠিকা শ্রমিকদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকভাবে ক্রীতদাস ব্যবহার যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ ছিল বলে রোমে জনমুখী কাজে ভাড়াটে শ্রমিক বহুলভাবে ব্যবহার করা হত। সমস্ত বছর ধরে খাওয়া-পরার খরচ যোগাতে হত বলে ক্রীতদাস প্রথা ছিল যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। তার পরিবর্তে ভাড়াটে শ্রমিকের ব্যবহার ছিল সুবিধাজনক। সম্ভবতঃ এই কারণেই পরবর্তীকালে অন্ততঃ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে কৃষিকাজে ক্রীতদাসদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। অন্যদিকে, ব্যবসা ক্ষেত্রে যেখানে শ্রমিকের চাহিদা ছিল তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে ক্রীতদাসদের ও প্রভুর কতৃত্ব থেকে মুক্ত প্রাক্তন দাসেদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। অনেক ক্ষেত্রে প্রভুরা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা করার জন্য অথবা নিজস্ব ব্যবসা চালাবার জন্য, ক্রীতাদাসদের মূলধনের যোগান দিতেন। রোমান কৃষি-সম্বন্ধীয় লেখকেরা শ্রমিক পরিচালনার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। দক্ষিণ স্পেন থেকে আসা Columella নামক প্রথম শতাব্দীর একজন লেখক বলেছেন যে, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার জন্য চাষের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ভূস্বামীদের প্রয়োজনের অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ মজুত রাখা উচিত। কারণ ক্রীতদাসের সংখ্যার স্বল্পতা বা সময়ের অপচয়ের ফলে এ সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি পায়। নিয়োগকর্তাদের ধারণা ছিল যে তদারকি ছাড়া কোন কাজই সুসম্পাদিত হতে পারে না, তাই সাধারণ শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্য্যায়ের তদারকির ব্যবস্থা ছিল। তদারকের কাজের সুবিধার জন্য শ্রমিকদের ছোট, বড় গোষ্ঠীতে ভাগ করে নেওয়া হত। প্রতি দশজন শ্রমিকের একটি গোষ্ঠী গঠন করবার জন্য সুপারিশ করে Columella বলেছেন যে এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা যাচাই করা সহজতর হবে। এ থেকে শ্রমিক পরিচালনার ব্যাপারে তখনকার ভাবনা-চিন্তা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বিখ্যাত 'Natural History's প্রণেতা জ্যেষ্ঠ প্লিনী শ্রমিক গোষ্ঠী গঠন করবার প্রস্তাবের নিন্দা করে বলেছেন যে গোষ্ঠীবদ্ধ শ্রমিকদের শৃঙ্খলিত করে কাজ

স্ত্রী-ক্রীতদাস ও তাদের সঙ্গীদের (ভবিষ্যত ক্রীতদাস সৃষ্টির জন্য) বেশী সন্তান উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হত।

Opp page : Mosaic at Cherchel, Algeria, early third century CE. with agricultural scenes. Above : Ploughing and sowing.
Below : Working in vineyards.

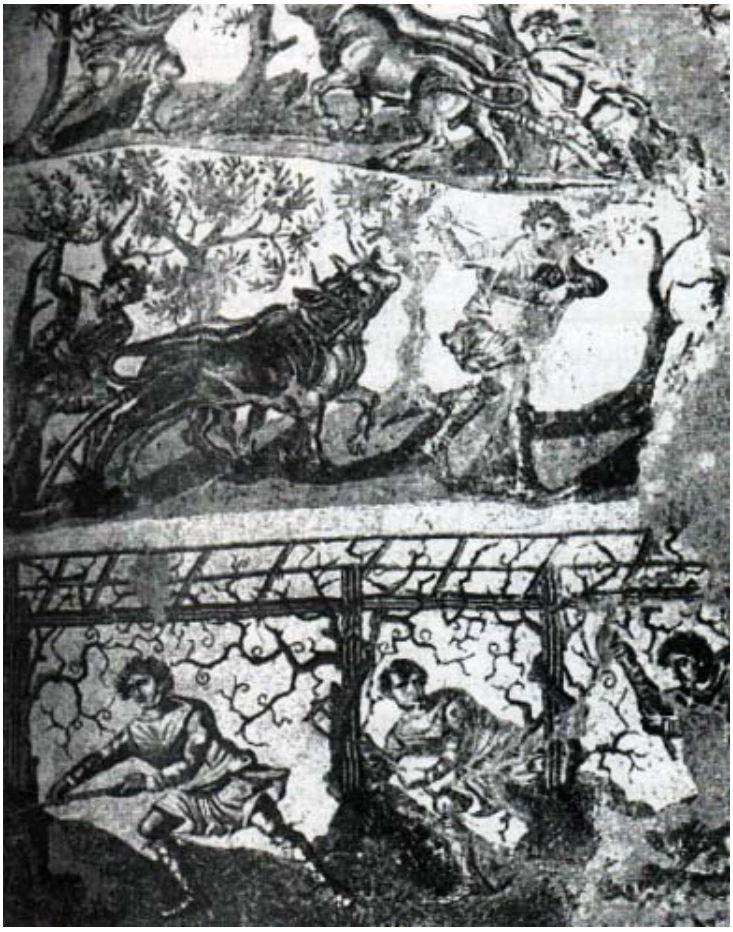

করাবার এই ধারাটি উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গলদ। এই প্রথাগুলোকে অত্যন্ত নির্মম বলে মনে করা হলেও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আজকের দিনেও বিভিন্ন কলকারাখানাতে একই পদ্ধতিতে শ্রমিকদের পরিচালনা করা হয়। এ কথা সত্যি, রোমান সাম্রাজ্যের কিছু শিল্প সংগঠনে কঠিনতর শ্রমিক পরিচালনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হত। আালেকজান্ড্রিয়ার বিশেষ সুগন্ধি (Frankincense)** কারখানার পরিস্থিতি বর্ণনা করে জ্যেষ্ট প্লিনী বলেছেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ তদারকি ব্যবস্থার পরও শ্রমিকদের উর্দি ছাড়াও ঘন জালিকাবদ্ধ একটি মুখোশ মাথায় পরতে হত, এবং কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যাবার আগে তাদের সেখানকার সমস্ত জামাকাপড় পরিবর্তন করতে হত। তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগের একটি লিপি আনুযায়ী ধারণা করা যায় য়ে কৃষিক্ষেত্রের ক্লান্তিকর কাজ শ্রমিকের পছন্দ হত না। লিপিটিতে মিশরীয় শ্রমিকদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে কৃষিকর্মে যুক্ত না হবার জন্য তারা নিজস্ব গ্রাম ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে। অধিকাংশ কলকারাখানার ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি ছিল। ৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি আইনে, পালিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের উদ্ধার করবার সুবিধার জন্য প্রথম অবস্থাতেই তাদের শরীরে নির্মমভাবে চিহ্নিতকরণের কথা বলা হয়েছে। বহু ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংগঠনের নিয়োগকর্তা শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের চুক্তি, ঋণ-পত্রের আদলে তৈরী করত। এক্ষেত্রে কর্মীরা নিয়োগর্তার কাছে ঋণী বলে প্রতিপন্ন করে তাদের উপর নিয়োগকর্তার কতৃত্ব বজায় রাখা সহজ হত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগের একজন লেখক বর্ণনা করেছেন 'অজস্র সাধারণ শ্রমিকেরাও দাসের জীবন-যাপন করতে তৈরী ছিল।' অর্থাৎ অসংখ্য গরীব পরিবার বেঁচে থাকবার জন্য ঋণপত্র মেনে নিত। ইদানীংকালে আবিষ্কৃত অগাস্টিনের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে বাবা-মা তাদের সন্তানদের ২৫ বছরের জন্য ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে দিত। বাবার মৃত্যুর পর এ সমস্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল কি না, এ কথা আগাস্টিন একজন আইনজ্ঞ বন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। গ্রাম্য জীবনে ঋণের বোঝা ছিল ব্যাপক, অসন্তুষ্টির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদী বিদ্রোহের[১] সময় বিদ্রোহীরা জন-সমর্থন পাবার আশায় ভূস্বামীদের চুক্তিপত্র ধ্বংস করে ফেলে।

*Draconian: Harsh (so-called because of an early sixth-century BCE Greek lawmaker called Draco, who prescribed death as the penalty for most crimes!).

তবে এ কথাও বলা উচিত হবে না যে অধিকাংশ শ্রমিকই এভাবে নির্যাতিত হত। পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে রাজত্বকারী সম্রাট এনাস্টেসিয়াস সমস্ত পূর্বাঞ্চল থেকে বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে তিন সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব সীমান্তের দারা নগরটির নির্মাণকার্য্য শেষ করেছিলেন। প্যাপরি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় আঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্বভাগে বেতনভোগী শ্রমিকদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

ধূপ ও প্রসাধনীতে ব্যবহৃত সুগন্ধির ইউরোপীয় নাম। একটি বিশেষ ধরণের গাছের কষ থেকে এ সুগন্ধি সংগ্রহ করা হয়। সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি পাওয়া যেত আরব উপমহাদেশ থেকে।

সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস ঃ

১. ডুদাইতে রোমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিদ্রোহ রোমানরা দৃঢ়ভাবে দমন করেন। এই দমন কার্য্যকে বলা হয়েছে 'Jewish War'

এবার আমরা রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। Tacitus এর বর্ণনা বর্ণনা অনুযায়ী সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে উল্লেখযোগ্য সামাজিক শ্রেণীগুলো ছিল ঃ সিনেটর (Patres lit 'fathers'), অশ্বারোহী শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা, জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিবারভুক্ত সম্মানীয় শ্রেণী, সার্কাস, নাটক ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত অবিন্যস্ত নীচুতলার সদস্যরা এবং সর্বশেষে দাসশ্রেণী। তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে ১০০০ জন সিনেটরের মধ্যে মোটামুটিভাবে অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন ইটালিয় পরিবার থেকে আগত। সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে পর্য্যায়ে অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়। চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে রাজা কনস্টেটাইনের রাজত্বকালে Tacitus বর্ণিত প্রথম দুটি শ্রেণী (Senators ও Equestrian) একত্রি হয়ে একটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণী তৈরি করে এবং এ শ্রেণীর মোট পরিবার সংখ্যার অন্তত অর্ধেকের মূল ছিল আফ্রিকা বা পূর্বাঞ্চলে। এই 'পরবর্ত্তী রোমান সম্ভ্রান্তশ্রেণী যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী হলেও সাধারণ শ্রেণী থেকে উদ্ভুত সম্পূর্ণ সামরিক আধিকারিকরা নানাভাবে তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। এ সময়ে আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে রাজকীয় কার্য্যে যুক্ত সাধারণ লোকেরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্য ছিল। এছাড়া পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী সমৃদ্ধ ব্যবসায়ীরা কৃষকেরাও এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। Tacitus বলেছেন যে এই 'সম্মানীয়' মধ্যবিত্তশ্রেণী সিনেট পরিবারগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মূলতঃ সরকারী চাকরী ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করেই এ ধরনের অধিকাংশ পরিবার জীবন ধারণ করত। এদের পরেই ছিল humiliors নামে পরিচিত বিশাল নিম্ন শ্রেণী। গ্রাম্য শ্রমিক নিয়ে গঠিত এই শ্রেণীর অনেকে ছিল বিশাল জমিদারীগুলোতে স্থায়ীভাবে কর্মরত তাছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠান ও খনির কাজে যুক্ত শ্রমিকরা, শষ্য ও অলিভ ক্ষেতে কর্মরত ও নির্মাণ শিল্পে যুক্ত শ্রমিকেরা, বেতনভোগী শ্রমিকদের চাইতে সম্পন্নতর বলে পরিচিত স্বনির্ভর কারিগরেরা, বিশেষভাবে বড় নগরগুলোতে কর্মরত প্রচুর সংখ্যক ঠিকা শ্রমিক এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগে আবস্থানকারী অজস্র দাস ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।২

ACTIVITY

The text has referred to three writers whose work is used to say something about how the Romans treated their workers. Can you identify them? Reread the section for yourself and describe any two methods the Romans used to control labour.

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐতিহাসিক Olympiodorus বলেছেন যে রোম নগরকেন্দ্রীক অভিজাত শ্রেণীর সদস্যরা ভূসম্পত্তি থেকে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও বছরে 4,000 Ibs পর্য্যন্ত সোনা আয় করতেন।

স্পেনের রূপের খনিগুলো নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় সরকারের রৌপ্য-মুদ্রাকেন্দ্রিক স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার মতন যথেষ্ট রূপার যোগান ছিল না। তাই প্রথম তিন শতাব্দীতে প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা পরবর্তীতে ভেঙ্গে পড়ে। কনস্টেনটাইন স্বর্ণ-মুদ্রাকেন্দ্রিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যায়ে এ জাতীয় মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল।

*The equites, (Knights or horsemen) রা ছিল পরম্পরাগতভাবে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্পন্ন ও শক্তিশালী গোষ্ঠী। মূলতঃ তাদের সম্পত্তির পরিমাণের ভিত্তিতে তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে নিয়োগ করা হত। সিনেটারদের মত প্রত্যেক নাইটই ছিল ভূসম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু তাদের সঙ্গে সিনেটারদের পার্থক্য ছিল যে তারা অনেকেই ছিলেন জাহাজের মালিক, ব্যবসায়ী অথবা অন্যান্য ব্যবসা কর্মে যুক্ত।

রোমান শাসন ব্যবস্থায় আমলারা ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ শ্রেণী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পারিশ্রমিক সোনার মূল্যে প্রদান করা হত এবং এর সিংহভাগ দিয়ে তার জমি কিনতেন। আবশ্য সামরিক বাহিনীতে যোগানের ক্ষেত্রে ও বিচার ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উচুস্তরের আমলাদের চাহিদা এবং রাজ্যগুলোর শাসকদের

লোভ ছিল প্রবাদ-প্রতিম। কিন্তু সরকার নানাভাবে এই সমস্ত দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করত। দুর্নীতি দূর করবার জন্য আইন পাশ করা হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকেরা ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এই দুর্নীতির নিন্দা করেছেন. এই সমালোচনার ধারাটি তৎকালীন সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। রোমান শাসন ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী কর্তৃপক্ষের আদেশ আমান্য করা নাগরিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং এ ক্ষেত্রে সরকার বল-প্রয়োগের মাধ্যমে মোকাবিলা করত। পূর্বাঞ্চলের নগরগুলিতে জনগণের মধ্যে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা য়ায় এবং এখানেই সরকারকে কঠোর হতে হত। তবুও চতুর্থশতাব্দী পর্য্যন্ত রোমান আইনের একটি শক্ত ধারা গড়ে উঠেছিল এবং এই আইনগুলো চরম কঠোর সম্রাটদের কাজেকর্মেও রাশ টেনে ধরত। সম্রাটরা নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী যেমন খুশী চলতে পারতেন না, কারণ জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করবার ব্যাপারে আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এরফলে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্ষমতাশালী সম্রাটরা যখন জনগণের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেছেন ও তাদের নিপীড়ন করেছেন তখন এম্বোসের মত ক্ষমতাশালী বিশপের পক্ষে তাদের হয়ে সম্রাটদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল।

রোমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সম্পদের পরিমাণ, পঞ্চম শতাব্দী

'Each of the great houses of Rome contained within itself everything which a medium-sized city could hold, a hippodrome, fora, temples, fountains, and different kinds of baths... Many of the Roman households received an income of four thousand pound of gold per year from their properties, not including grain, wine and other produce which, if sold, would have amounted to one-third of the income in gold. The income of the households at rome of the second class was one thousand or fifteen hundred pounds of gold.'

পরবর্তী সাবেকীআনা

পরিচ্ছেদের শেষভাগে আমরা রোমান সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কথা অলোচনা করব। ব্যাপকভাবে চতুর্থ ও সপ্তম শতকের মধ্যেকার রোমান সাম্রাজ্যের রূপান্তর ও ভাঙ্গনের শেষ এবং মুগ্ধকর সময়কে বর্তমানে অর্থাৎ পরবর্তী সাবেকীআনা বলে বর্ণনা করা হয়। চতুর্থ শতাব্দী ছিল সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দুদিকেই গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক পর্য্যায়ে খ্রিষ্টধর্মকে সরকারী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রাজা কনষ্টেন্টাইন ধর্মীয় ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। অন্যদিকে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের উত্থানও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ানের সময় থেকে রাষ্ট্রের পরিকাঠামোতেও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সময় থেকেই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি।

সাম্রাজ্যের প্রবল বিস্তৃতির ফলে ডায়োক্লিসিয়ান স্থানিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোকে বর্জন করতে বাধ্য হন। তিনি সীমান্ত এলাকাগুলোকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন, রাজ্যের সীমারেখার পরিবর্তন ও অসামরিক ও সামরিক শাসন ব্যবস্থার পৃথকীকরণ করেন। তার আমলে সামরিক আধিকারিকেরা যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কনস্টানটাইন এই পরিবর্তনগুলোতে আরও জোর দেন ও তিনি নিজেও কিছু নতুন পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। তার প্রবর্তিত Solidus নামক ৪.৫ গ্রাম নিখাদ সোনার মুদ্রার অস্তিত্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরেও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত

করা নানাবিধ মুদ্রার প্রচলন ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে। তিনদিকে সমুদ্র বেষ্টিত কনষ্টান্টিনোপলে (অতীত বাইজেন্টিয়াম, বর্তমান তুরস্কের ইস্তানবুল) দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনা ছিল সম্রাটের দ্বিতীয় কৃতিত্ব। দ্বিতীয় রাজধানীর জন্য নতুন সিনেটের প্রয়োজনে চতুর্থ শতাব্দীতে শাসকশ্রেণী বিস্তার লাভ করে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়। পুরাতাত্ত্বিক নথি থেকে তেল মাড়াই ও কাচের শিল্পের মতন গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রে নানা বিনিয়োগের সম্বন্ধে জানা যায়। এছাড়া পেরেক ও জলশক্তি চালিত কারখানার মত নতুন শিল্পোদ্যোগে ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দূরপাল্লার ব্যবসা পুনরজীবিত করবার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করা হয়।

এ সমস্ত কিছুর ফলাফল ছিল প্রভূত নতুন ধরণের স্থাপত্য সমৃদ্ধ এবং যথেষ্ট বিলাস বহুল নাগরিক সমৃদ্ধি। শাসকগোষ্ঠী আগের চাইতে সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মিশরে প্রাপ্ত শেষ শতাব্দীগুলোর অগুন্তি প্যাপরি থেকে একটি তুলনামূলক সমৃদ্ধ সমাজের ধারণা পাওয়া যায়। সমাজে মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রগুলো যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রা আয় করত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ষষ্ঠ শতাব্দী gustiaian এর রাজত্বে মিশর থেকে বছরে ২.৫ সহস্র সলিডি কর হিসেবে আদায় হত। (প্রায় ৩৫,০০০ Ibs পরিমাণ সোনা) সঠিক অর্থে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিকট প্রাচ্যের শহরতলীর বৃহৎ অংশ বিশ শতাব্দীতে যতটা হওয়া উচিত তার চাইতেও ছিল বেশী উন্নত ও ঘন বসতিপূর্ণ। এরকম সামাজিক পটভূমিতে আমরা এ সময়কার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

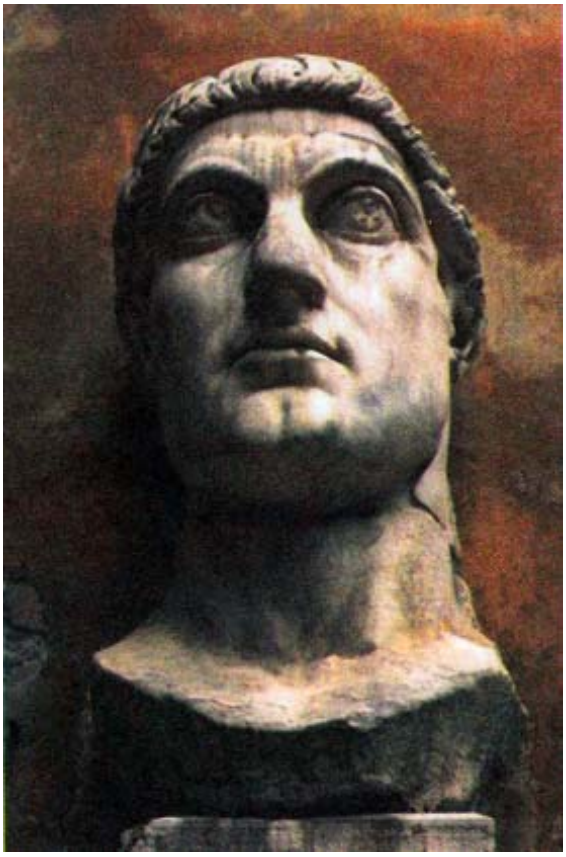

সম্রাট কনষ্টেন্টাইনের মূর্তির অংশ বিশেষ

গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের মত সাবেক অঞ্চলে পরস্পরাগত ভাবে বহু দেবদেবী পূজিত হতেন। অর্থাৎ এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সাম্রাজ্য জুড়ে অসংখ্য মন্দির ও দেবালয়ে যেমন রোমান / ইটালীয়ান দেবী ও এর আরাধনা হত তেমনি অগণিত গ্রীক ও পূর্বদেশীয় দেবদেবীরও স্তুতি প্রচলিত ছিল। বহু দেবদেবীদের নিজস্ব কোন নামে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। অন্য আরেকটি ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল কিন্তু ও খানে কোন একক গোষ্ঠী হিসেবে ছিল না এবং পরবর্তী সাম্রাজ্যে ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টীয়করণ ছিল একটি জটিল প্রক্রিয়া। বহুদেববাদীতা, বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে সহজে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। সে অঞ্চলে খ্রিষ্টান যাজকেরা প্রতিবাদী সাধারণ খ্রিষ্টান জনসাধারণের চাইতেও কঠিনভাবে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করেছেন। অন্যদিকে ধর্মীয় নেতারা ও চার্চের নেতৃত্ব দানকারী বিশপেরা কঠোরতর বিশ্বাস ও প্রথা দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে অনুগামীদের

উপর নিজেদের কতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তবে তাদের চেষ্টার ফলেই চতুর্থ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগ রোগের প্রভাবে প্রচুর প্রাণ নাশ হয়। তা সত্ত্বেও পূর্বপ্রান্তে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ অঞ্চলের সামগ্রীক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে উত্তর দিক থেকে আগত জার্মানদেশীয় নানা গোষ্ঠী পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য দখল করায় সে অঞ্চলের খণ্ডীকরণ হয়। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলোকে 'উত্তর রোমান' বলে বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল স্পেনে VISIGOTHS -দের প্রতিষ্ঠিত (৭১১ থেকে ৭২০ এর মধ্যে আরবদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত) গ্বল-এ FRANKS-দের প্রতিষ্ঠিত ও ইটালীতে LOMBARDS -দের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য। এই রাজ্যগুলো সাধারণতঃ 'মধ্যযুগ' বলে পরিচিত এক নতুন যুগের আগমণ সূচিত করেছিল। পূর্বদিকে সুসংগঠিত এলাকায় জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল সমৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়োয় পৌঁছেছিল। জাষ্টিনিয়ান VANDAL দের কবল থেকে আফ্রিকাকে পুণরুদ্ধার করেন (৫৩৩) কিন্তু ইটালিকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে দেশটি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং লোম্বার্ড আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে রোম ও ইরাণের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধে। তৃতীয় শতাব্দী থেকে ইরাণে রাজত্বকারী সেসেনিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সবগুলো প্রভাবশালী রাজ্য (মিশর সহ) আক্রমণ করে। ক্রমে বাইজান্টিয়াম বলে পরিচিত হওয়া রোমান সাম্রাজ্য ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে এই রাজ্যগুলোকে পুনরুদ্ধার করে। এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত নেমে আসে।

*Monolith – literally a large block of stone, but the expression is used to refer to anything (for example a society or culture) that lacks variety and is all of the same type.

**খ্রিষ্টীয়করণ অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

***Laity – the ordinary members of a religious community as opposed to the priests or clergy who have official positions within the community.

৭৯ খ্রিঃ নির্মিত ৬০,০০০ আসন সমৃদ্ধ এখানে যোদ্ধারা অন্য জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেন।

আরব দেশে জেগে উঠা ইসলামধর্মের বিস্তৃতিকে 'প্রাচীন পৃথিবীতে সংগঠিত হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর দশ বছর, অর্থাৎ ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব রোমান ও সেসেনিয়ান সাম্রাজ্য দুয়েরই অধিকাংশ এলাকা ধারাবাহিক ও ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আরবদের হস্তগত হয়। তবে একথা স্মরণে রাখা উচিত যে নবোত্থিত ইসলামীয় রাষ্ট্র আরবগোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করবার ফলেই স্পেন, সিন্ধুপ্রদেশ ও মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত এধরণের রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ আরবের আভ্যন্তরীণ ও পরবর্তীতে সিরীয় মরুভূমি এবং ইরাকের প্রান্তবর্তী অঞ্চলের আরবগোষ্ঠীগুলো ইসলামীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যাবে যে আরব উপদ্বীপ এবং এর অজস্র গোষ্ঠীর একতাবদ্ধতা ছিল ইসলামের রাজ্য বিস্তারের মূল কারণ।

মানচিত্র ২: পশ্চিম এশিয়া।

শাসক	ঘটনা	
খ্রিঃ পূঃ ২৭ খ্রিঃ-১৪	২৭ খ্রিঃপূঃ	অক্টাভিয়ানের রাজ্য স্থাপন, অগাষ্টাস নাম গ্রহণ
অগাষ্টাস, প্রথম রোমান সম্রাট	২৪ খ্রিঃ -৭৯ খ্রিঃ	ভিসুভিয়াসের উদগীরণে জ্যেষ্ঠ প্লিনীর মৃত্যু, রোমান নগরী পম্পেই
১৪-৩৭		ধ্বংসপ্রাপ্ত।
টিবেরাস	৬৬-৭০	বিখ্যাত ইহুদী বিদ্রোহ এবং রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম অধিকার।
৯৮-১১৭		
ট্রাজান	১১৫	পূর্বে ট্রজানের রাজ্যজয়ের পর রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিস্তৃতি।
হ্যাড্রিয়ান	২১২	সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীদের রোমান নাগরিকত্ব লাভ।
১৯৩-২২১	২২৪	পূর্বপুরুষ সেসেনের নাম অনুযায়ী ইরাণে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজবংশের
সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস		‘সেসেনীয়ান’ পরিচিতি
২৪১-৭২	২৫০	ইউফ্রেটীসের পশ্চিমে রোমান ভূমিতে পারসিয়ানদের আক্রমণ।
ইরাণে প্রথম শাপুরের রাজত্ব	২৫৮	কার্থেজের বিশপের প্রাণনাশ।
২৫৩-৬৮	২৬০	গ্যালিনিয়াস কর্তৃক সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন।
গ্যালেনিয়াস	২৭৩	রোমানদের দ্বারা পালমিরার ক্যারাভান সিটি ধ্বংস।
২৮৪-৩০৫	২৯৭	ডায়োক্লেসিয়ান সাম্রাজ্যকে ১০০ টি প্রদেশে পুনর্গঠিত করেন।
	৩১০	কনষ্টেনটাইন নতুন স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন।
	৩১২	কনষ্টেনটাইনের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তকরণ।
৩১২-৩৭	৩২৪	সাম্রাজ্যের একমাত্র শাসক কনষ্টেনটাইন, কনষ্টান্টিনোপল নগরীর পত্তন।
কনষ্টেণ্টাইন		
৩০৯-৭৯	৩৫৪-৪৩০	হিপোর বিশপ অগাষ্টাইনের মৃত্যু।
ইরাণে দ্বিতীয় শাপুরের রাজত্ব		
৪০৮-৫০	৩৭৮	গথেরা এড্রিয়ানপোলে রোমান সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে।
দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস	৩৯১	আলিকজান্ড্রিয়াতে মেরাপিয়াম মন্দির ধ্বংস।
	৪১০	ভিসিগথেরা রোম লুণ্ঠন করে।
৪৯০-৫১৮	৪২৮	ভ্যাণ্ডেলরা আফ্রিকা অধিকার করে।
অ্যানাষ্টাসিয়াস	৪৩৪-৫৩	অ্যাটিলা হানের সাম্রাজ্য।
৫২৭-৬৫	৪৯৩	ইটালিতে অষ্ট্রগথদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
জাষ্টিনিয়ান	৫৩৩-৫০	জাষ্টিনিয়ান কর্তৃক আফ্রিকা এবং ইটালী পুনরুদ্ধার।
৫৩১-৭৯	৫৪১-৭০	মহামারী রূপে প্লেগ।
ইরাণে প্রথম খসরুর রাজত্ব	৫৬৮	ল্যাম্বার্ডরা ইটালি আক্রমণ করে।
৬১০-৪১	৫৭০	মহম্মদের জন্ম।
হেরাক্লিয়াস	৬১৪-১৯	পারসিক শাসক খসরু পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন।
	৬২২	মহম্মদ ও তার সঙ্গীরা মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা করেন।
	৬৩৩-৪২	আরব রাজ্যজয়ের প্রথম ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ঃ মুসলমান সৈন্যরা সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইরাক এবং ইরাণের অংশ বিশেষ অধিকার করে।
	৬৬১-৭৫০	সিরিয়াতে উমিয়াদ বংশ।
	৬৯৮	আরবেরা কার্থেজ অধিকার করে।
	৭১১	আরবদের স্পেন আক্রমণ।

৫৪৭ খ্রিঃ রাবেনার দেওয়াল চিত্রে সম্রাট জাস্টিনিয়ান।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাওঃ-

১. রোমান সাম্রাজ্যে বাস করলে তুমি শহরে অথবা শহরতলীতে, কোথায় থাকতে পছন্দ করতে? ব্যাখ্যা কর।

২. এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি শহর, নগর, নদী, সমুদ্র এবং প্রদেশের একটি তালিকা প্রস্তুত করে মানচিত্রে এদের অবস্থান নির্দেশ কর। তালিকা থেকে যে কোন তিনটি বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বল।

৩. একজন রোমান গৃহবধূর সংসারে ব্যবহার্য জিনিসের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪. রোমান সরকার কেন রৌপমুদ্রা প্রস্তুত করবার কাজ বন্ধ করে দিল? রূপোর পরবর্তে তারা মুদ্রাতে অন্য কোন ধাতু ব্যবহার করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত রচনার আকারে লিখ ঃ-

৫. যদি সম্রাট ট্রজান ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারতেন ও রোমানরা বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে রাজত্ব করত, তাহলে আজকের ভারতবর্ষের চিত্র কেমন হত ?

৬. অধ্যায়টি মনযোগ দিয়ে পাঠ করে রোমান সমাজ ও অর্থনীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো যথেষ্ট আধুনিক বলে মনে হয়, সেগুলো নির্দেশ কর।

প্রসঙ্গ
৪

মধ্য ইসলামীয় ভূমি

একবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এক কোটিরও বেশি মুসলমান ধর্মাবলম্বী বাস করেন। তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক, ভিন্ন ভাষাভাষি ও তাদের পোষাক পরিচ্ছদও ভিন্ন। জায়গাভেদে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন, আবার বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা নানা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে বলা যায় যে ইসলামীয়দের মূল ছিল ১৪০০ বছর আগে আরব সাগর উপদ্বীপে। এই পরিচ্ছেদে আমরা ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে মিশর থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইসলামের অভ্যুদয় ও বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই সময়কালের মধ্যে ইসলামীয় সমাজ নানারকম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সাক্ষী থেকেছে। এখানে ইসলাম শব্দটি শুধুমাত্র ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না, এর ব্যঞ্জনা এখানে গভীরতর। সামগ্রিকভাবে ইসলামের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি বোঝাতে গিয়ে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমাজে সংগঠিত সমস্ত কিছু সরাসরি ধর্ম থেকে উদ্ভুত হয়নি, কিন্তু এখানে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের এবং তাদের ধর্মীয় চেতনার সামাজিক আধিপত্য বজায় ছিল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিম্নতর হলেও সমাজের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। খ্রিস্টান জগতে ইহুদীদের অবস্থানের সঙ্গে তাদের অবস্থানের তুলনা করা যায়।

সময়ানুবর্তী ঘটনাপঞ্জি, (Tawarikh) প্রায় ঐতিহাসিক লেখাপঞ্জি যেমন জীবনীগ্রন্থ (SIRA) পয়গম্বরের বাণী ও কর্মের পঞ্জি (HADITH) এবং কোরানের টীকাকারদের (TAFSIR) উপর নির্ভর করে আমরা ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেকার ইসলামীয় এলাকার ইতিহাস নির্মাণ করতে পারি। অগণিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বিস্তৃত সময় ধরে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে বাহিত হয়ে এই আকরগুলো গড়ে উঠেছে। একটি সমালোচনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাহক মাধ্যমগুলোকে সনাক্ত করে ও টীকাকারদের সততা যাচাই করে এই বিবরণগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাদের ব্যবহৃত প্রক্রিয়াটি নির্ভুল না হলেও, সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের লেখকদের তুলনা ? মুসলমান লেখকেরা তাদের তথ্য সংগ্রহ ও সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্য আনুধাবন করবার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। বিতর্কিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তারা বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঘটনাটির নানা আঙ্গিক তুলে ধরেছেন। তাদের সমসাময়িক অথবা নিকটতর সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে তারা শুধুমাত্র প্রতিবেদন তুলে ধরেননি, সমস্ত ঘটনা সুসংহত ভাবে তুলে ধরে তার বিশ্লেষণ করেছেন। আরবী ভাষায় লিখিত সময়ানুবর্তী ঘটনাপঞ্জি ও প্রায়-ঐতিহাসিক লেখাপঞ্জিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাবারি লিখিত তারিক। এটি ৩৮টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। পার্সিয়ান ভাষায় করেছেন। আরবী ভাষায় লিখিত সময়ানুবর্তী ঘটনাপঞ্জি ও প্রায়-ঐতিহাসিক লেখাপঞ্জিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাবারি লিখিত তারিখ। এটি ৩৮টি বিভক্ত হয়ে

ইংরাজীতে আনুবাদিত হয়েছে। পার্সিয়ান ভাষায় লিখিত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জিগুলো সংখ্যায় কম হলেও এতে ইরাণ ও মধ্য এশিয়ার বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সিরিয়াক (অ্যারামিকের একটি কথ্য রূপ) ভাষায় লিখিত খিষ্টান কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জিগুলো সংখ্যায় আরও কম হলেও এগুলো প্রাচীন ইসলাম সম্বন্ধে ইসলাম সম্বন্ধে নানা উল্লেখযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ। কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি ছাড়াও আমরা আইনি নথি, ভৌগলিক তথ্য পরিব্রাজকদের বিবরণ এবং গল্প কবিতার মত নানা সাহিত্য-কর্ম ইত্যাদি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

সরকারি আদেশ বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মত লিখিত তথ্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সবচাইতে মূল্যবান উপাদান, কারণ এগুলোতে সচেতনভাবে কোনও ঘটনা বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় না। প্রায় সমস্ত লিখিত তথ্যই গ্রীক ও আরবী প্যাপরি এবং Ganiza থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও পুরাতত্ব, মুদ্রা ও লিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্যও অর্থনৈতিক ইতিহাস ও শিল্পের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য উপাদান। ব্যক্তি বিশেষের বা স্থান বিশেষের নাম ও সময় নির্দ্ধারণ করার ব্যাপারেও এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম জার্মাণী ও নেদারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপকেরা ইসলামের সঠিক ইতিহাস রচনা করতে শুরু করেন। মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ ফরাসী ও ইংরেজ গবেষকদেরও ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করে। খ্রিষ্টান পুরোহিতদের ইসলামের প্রতি উৎসাহের ফলেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়। তবে তারা তাদের রচনাগুলোতে মূলত ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রাচ্যবাদী বলে পরিচিত এই পণ্ডিতেরা আরবী এবং পার্সিতে যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। এই বিষয়ে মূলপাঠগুলোর তারা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। Ignaz Goldziher বলে একজন হাঙ্গেরীবাসী ইহুদী কায়রোর ইসলামীয় কলেজে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ইসলামিক আইন এংব ধর্মতত্ব সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় নতুন ধরণের আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিংশ শতাব্দীর ইসলামীয় ঐতিহাসিকেরা বহু অংশে প্রাচ্যবাদীদের ধারা অনুসরণ করেছেন। তারা নতুন নতুন প্রসঙ্গের অর্ন্তভুক্তি ঘটিয়েছেন এবং অর্থনীতি, নৃতত্ব ও সংখ্যাতত্ত্বের মত বিষয়গুলির সাহায্যে প্রাচ্যবাদী শিক্ষাকে পরিশীলিত করেছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষার এক অনন্য উদাহরণ হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস লিখন পদ্ধতি। আরও উল্লেখযোগ্য যে যারা এই ইতিহাস চর্চা করেছেন তারা তাদের চর্চিত জনগোষ্ঠীর বা প্রথার অংশীদার নন।

* হিব্রু ও আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ভাষা অ্যারামিক। সম্রাট অশোকের লিপিতেও এ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবে ইসলামের উত্থান : ধর্ম, সম্প্রদায় এবং রাজনীতি

৬১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পয়গম্বর হজরত মহম্মদ একমাত্র ঈশ্বর, তথা আল্লার উপাসনা প্রচার করেন। তিনি এক সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এখানেই ছিল ইসলামের মূল কথা। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে আরবীয় মহম্মদের জীবিকা ছিল ব্যবসা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব সংস্কৃতি আরবীয় উপদ্বীপ এবং দক্ষিণ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আরবেরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর একজন নেতা ছিলেন। পারিবারিক পটভূমিকার উপর ভিত্তি করে নেতা নির্বাচিত করা হলেও এক্ষেত্রে সাহসিকতা,

জ্ঞান ও আচার ব্যবহারের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হত। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব দেবদেবীকে মূর্তিরূপে ধর্মস্থানে রেখে উপাসনা করতেন। অনেক আরব গোষ্ঠী ছিল যাযাবর, যারা নিজেদের পালিত উটের খাদ্যের সন্ধানে মরু অঞ্চল থেকে শ্যামল অঞ্চলের দিকে চলাচল করতেন। অনেকে নগরগুলিতে বসবাস করে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। মহম্মদের নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর নাম ছিল কোরায়শ (Quraysh) এরা মক্কাতে বসবাস করে এখানকার কাবা নামক ঘনকাকৃতি মূল দেবালয়টির তত্ত্বাবধান করতেন। এই দেবালয়ে মূর্তির অধিষ্ঠান ছিল। মক্কার বাইরের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীরাও কাবাকে পবিত্র জ্ঞানে তাদের নিজস্ব দেবদেবীর মূর্তিকে এই দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করতেন। প্রতি বছর তারা তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এখানে আসতেন। ইয়েমেন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ব্যবসায়িক পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল বলে মক্কার গুরুত্ব ছিল অধিক। মক্কাতে কোনরকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল ও এখানকার সমস্ত ভ্রমণার্থীর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। তীর্থভ্রমণ ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম, যাযাবর ও সুস্থিত দু'রকম জনগোষ্ঠীকেই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দিত। এর ফলে একের সঙ্গে অন্যের বিশ্বাস ও প্রথার আদানপ্রদান হত। বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসী আরবদের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও সম্ভবতঃ তাদের আশেপাশে বাস করা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের প্রভাবে মূর্তি ও দেবালয়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল গভীরতর।

৬১২ খ্রিস্টব্দে নাগাদ মহম্মদ নিজেকে ঈশ্বরের দূত রসুল (Rasul) হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র আল্লার আরাধনা প্রচারের জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আরাধনা রীতি ছিল খুব সরল— প্রাত্যহিক প্রার্থনা ও ভিক্ষাদান এবং চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবার অঙ্গীকার। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী একটি সম্প্রদায় উম্মা (Umma) তৈরী করা ছিল মহম্মদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামনে এই বিশেষ সম্প্রদায় এক নতুন ধর্মের সাক্ষ্য শাহাদা (shahada) বহন করবে। মক্কাবাসী একশ্রেণীর জনগণ ব্যবসা ও ধর্মীয় কার্যকলাপের আয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত মনে করতেন এবং তারা একটি নতুন সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের খোঁজে ছিলেন। মহম্মদের আবেদন তাদের প্রভাবিত করল। যারা এই মত গ্রহণ করলেন তাদের পরিচয় হল মুসলমান বলে। পৃথিবীতে তাদের নিজ সম্প্রদায়ের সম্পদের অংশীদার করা হবে এবং পরপারে বিচারের দিনে (Giyama) তাদের মুক্তি লাভ হবে বলে এই গোষ্ঠীকে আস্বস্ত করা হল। মক্কাবাসীরা তাদের দেবদেবীদের অবমাননায় রুষ্ট হলেন এবং মুসলমানরা অল্পদিনের মধ্যেই প্রভাবশালী মক্কাবাসীদের বিরোধিতার মুখোমুখি হল। তাদের দেবদেবীদের উপেক্ষা করে নতুন ধর্মমত প্রচার করার কাজ মক্কাবাসীরা পছন্দ করলেন না। তাদের ধারণা হল এই নতুন ধর্মমত মক্কার সম্মান ও সমৃদ্ধির পথে বিপদের সংকেত বহন করছে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ তার অনুগামীদের সহ মদিনাতে চলে যেতে বাধ্য হলেন। মক্কা থেকে মহম্মদের যাত্রা হীরা (hira) ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তার মদিনাতে চলে আসবার বছর থেকে মুসলমান সাল গণনা হতে শুরু হল।

একটি ধর্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার অনুগামীদের

* রক্তের সম্পর্কযুক্ত লোকেদের নিয়ে একেকটি গোষ্ঠী গঠিত হত। অনেকগুলি বৃহৎ পরিবার একটি গোষ্ঠী গঠন করত। কখনও সম্পর্কবিহীন লোকও একটি গোষ্ঠীতে যোগ দিত। গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় অ-আরবীয়রাও Mawali গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারত। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পরও আরব মুসলমানরা Mawali-দের তাদের সমকক্ষ মনে করত না এবং তাদের পৃথক মসজিদে প্রার্থনা করতে হত।

মধ্যযুগে চিত্রিত Archangel Gabriel এর চিত্র। তিনি মহম্মদের কাছে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তার কথিত প্রথম শব্দটি ছিল recite. এই শব্দটি থেকেই Quran শব্দের উৎপত্তি। মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে পরীরা ব্রহ্মাণ্ডের জীবনধারার মধ্যে এক সুন্দর সৃষ্টি। অন্য দুটি সৃষ্টি হল মানুষ এবং জিন।

ইসলামীয় ক্যালেন্ডার

উমর যখন খলিফা ছিলেন,তখন থেকে হিজরি সাল গণনা শুরুহয়। এই গণনা অনুযায়ী প্রথম হিজরির শুরু ৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

হিজরি ৩৫৪ দিনের একটি চান্দ্র বৎসর। এতে অন্তর্ভুক্ত ১২ মাস এবং ২৯ বা ৩০ দিন। প্রতিটি দিন শুরু হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে এবং প্রতি মাস শুরু হয় অমাবস্যা পরবর্তী চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে। হিজরি বর্ষে সৌরবৎসরের চাইতে প্রায় ১১ দিন কম থাকে। তার ফলে কোন ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠ ান, যেমন রমানের উপবাস, ঈদ এবং হজ কখনোই ঋতু অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় না। হিজরি ক্যালেন্ডারে র দিনগুলো গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের দিনের সঙ্গে সহজে মেলানো যায় না। (ত্রয়োদশ গ্রেগরি ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গণনা শুরু করেন)। দুই ক্যালেন্ডারের দিনের সমীকরণ নিম্নবর্তী নীতি অনুযায়ী করা যেতে পারে —

$(Hx৩২/৩৩)+৬২২ = C$

$(C-৬২২) \times ৩৩/৩২ = H$

C - খ্রিস্টাব্দ

H - হিজরি।

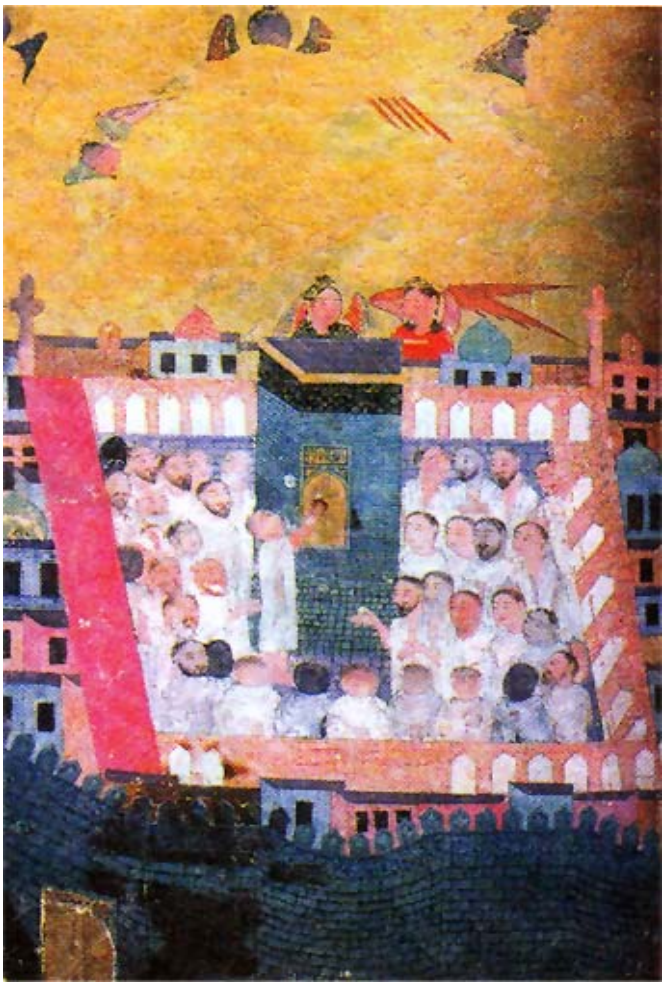

পঞ্চদশ শতকের পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত কাবার তীর্থযাত্রীদের চিত্র।
একজন তীর্থযাত্রী (হাজী) কালো প্রস্তরখণ্ড (hajr al-aswad) স্পর্শ করছেন।

স্থায়িত্বের উপর। আভ্যন্তরীণভাবে সুসংবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়টিকে বাইরের বিপদের মোকাবিলা করবার ক্ষমতা রাখতে হবে। সংঘবদ্ধতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে। বাইরের থেকে আনয়ন করা বা অতীত থেকে অর্জন করা কোন রাষ্ট্র বা সরকার সেই দায়িত্ব নিতে পারে। এই তিনটি সূত্রকে ব্যবহার করেই মহম্মদ মদিনাতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন। এর ফলে তার অনুগামীরা যেমন সুরক্ষিত থাকলেন তেমনি সেখানকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরও অবসান ঘটল। বহুদেবতা বাদে বিশ্বাসীদের মদিনায় ও বসবাসকারী ইহুদীদের অন্তর্ভূক্ত করে মহম্মদের নেতৃত্বে একটি বড় অনুগামীদল সৃষ্টি হল। নতুন প্রথা ও নীতি যোগ করে, পুরনো প্রথা ও নীতিকে মার্জিত করে মহম্মদ তার অনুগামীদের জন্য ধর্মতাটিকে সংগঠিত করে দিলেন। এই সম্প্রদায়টির জীবিকা ছিল কৃষি, ব্যবসা ও ধর্মীয়

ভিক্ষাবৃত্তি। এছাড়া মুসলমানেরা মক্কার মরুভূমিতে ভ্রমণরত যাত্রীদের ও মরুদ্যানগুলিতেও লুঠতরাজ করত। এরফলে মক্কাবাসীদের সঙ্গে ও মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের মতানৈক্য দেখা যায়। একাধিক যুদ্ধের পর মুসলমানোর মক্কা অধিকার করে এবং একজন ধর্মপ্রবর্তক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে দূরদূরান্তে মহম্মদের পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। মহম্মদ ধর্মান্তকরণকেই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হবার একমাত্র শর্ত বলে প্রচার করলেন। রুক্ষ মরু অঞ্চলে বসবাসকারীরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন। ক্রমে মুসলমানেরা সমস্ত আরবদেশ জয় করল। নবগঠিত ইসলামীয় রাষ্ট্রের শাসনকেন্দ্র হল মদিনা এবং মক্কা হল এর ধর্মীয় কেন্দ্র। মুসলমানদের বেদীর দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হত বলে কাবা থেকে সমস্ত মূর্তি সরিয়ে ফেলা হল। অল্পসময়ের মধ্যে মহম্মদ এক নতুন ধর্ম, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের ছায়ায় আরব দেশের এক বৃহৎ অংশকে একতাবদ্ধ করতে সমর্থ হলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় বহুদিন ইসলামীয় রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা ছিল আরব জাতি ও গোষ্ঠীগুলির একটি জোট ব্যবস্থা।

খলিফাতন্ত্র ঃ বিস্তৃতি, গৃহযুদ্ধ গোষ্ঠী গঠন

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুর পর কোন আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবী করেননি। তার ফলে কোন স্থায়ী উত্তরাধিকার নীতির অভাবে মহম্মদের রাজনৈতিক ক্ষমতা তার অনুগত সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়। এটি একদিকে নতুন প্রথা প্রবর্তনের সুযোগ ঘটালেও অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট দলাদলির সৃষ্টি করল। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল খলিফাতন্ত্রের সৃষ্টি। এই প্রথা অনুযায়ী সম্প্রদায়ের নেতা পয়গম্বরের সহকারী বলে বিবেচিত হত। মহম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্র ধরে প্রথম চারজন খলিফা ক্ষমতায় আসেন এবং তারা মহম্মদ প্রদর্শিত পথ ধরে তার ভাবধারা এগিয়ে নিয়ে যান। খলিফাতন্ত্রের দুটো উদ্দেশ্য ছিল, সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত গোষ্ঠীকে অধীনস্থ রাখা ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা।

মহম্মদের মৃত্যুর পর বহু গোষ্ঠী ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেকে নিজস্ব পয়গম্বরকে তুলে ধরে উম্মার আদলে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম খলিফা আবু-বক্কর, অনেকগুলো অভিযানের মাধ্যমে বিদ্রোহগুলো দমন করেন। দ্বিতীয় খলিফা উমর উম্মার ক্ষমতা বিস্তারের নীতি গঠন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র ব্যবসা ও কর আদায় থেকে যে সামান্য আয় হয় তা দিয়ে উম্মা পরিচালন সম্ভব নয়। লুঠতরাজের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ সম্ভব, একথা অনুধাবন করে খলিফা ও তার সামরিক আধিকারিকেরা পশ্চিদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও পূর্বদিকে সেসেনিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকা অধিকার করতে সচেষ্ট হন। বাইজেন্টাইন এবং সেসেনিয়া সাম্রাজ্য দুটো তাদের ক্ষমতার শিখরে পৌঁছে আরব দেশে তাদের রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য বিশাল এলাকা এবং সম্পদ করায়ত্ব করে রেখেছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য খ্রিস্টান ধর্মকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল এবং সেসেনীয় সাম্রাজ্য ইরানের প্রাচীন ধর্মমত জোরাষ্ট্রীয় ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করত। আরব অভিযানের প্রাক্কালে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ও অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহের ফলে এই দুটি সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তার ফলে

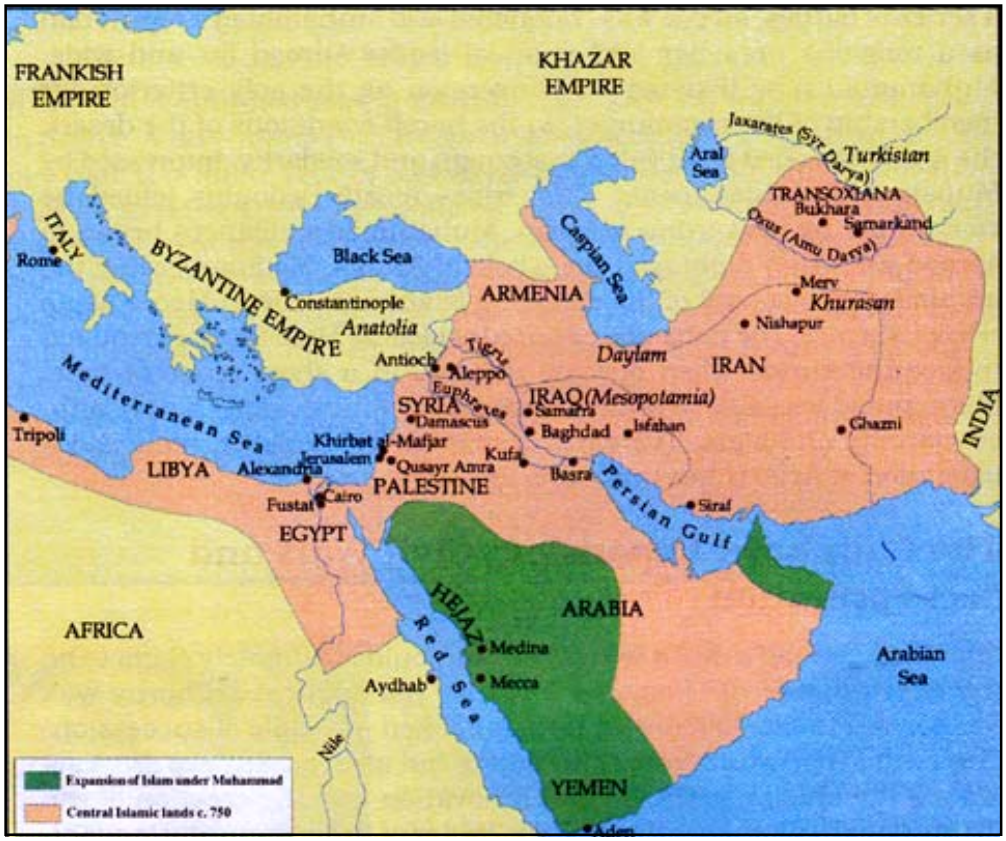

মানচিত্র ১
ইসলামীয় রাজ্য

আরবেরা সহজেই যুদ্ধ ও চুক্তির মাধ্যমে এলাকা দখল করতে পারছিল। তিনটি সফল অভিযানের মাধ্যমে সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও মিশরকে মদিনার অধিকারভুক্ত করা হয়। সামরিক কৌশল, ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বিরোধীপক্ষের দুর্বলতাও আরবদের সাফল্যের সহায়ক হয়েছিল। মধ্য এশিয়া পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য তৃতীয় খলিফা উথমান অভিযান পরিচালনা করেন। মহম্মদের মৃত্যুর এক দশকের মধ্যে আরব ইসলামীয় রাষ্ট্র নীল নদ থেকে অক্সাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখন্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই এলাকাগুলো আজও মুসলমান শসনভুক্ত।

বিজিত রাজ্যগুলোতে খলিফারা এক নতুন ধরনের শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেন। এর শিখরে ছিলেন রাজ্যপাল (amir) এবং গোষ্ঠী অধিপতিরা (ashraf)। মুসলমানদের প্রদত্ত কর ও লুঠতরাজ থেকে আমদানীকৃত সম্পদের অংশ জমা হত কেন্দ্রীয় কোষাগারে। খলিফার সৈন্যদল, বিশেষ করে বেদুইনরা কুঁফা, বসেরা ইত্যাদি মরুভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত নগরগুলোতে বসবাস করত। এতে করে একদিকে খলিফার আদেশ অনুসারে তারা হাজির হতে পারত আবার অন্যদিকে নিজস্ব স্বাভাবিক বাসভূমির সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ বজায় থাকত। শাসকশ্রেণী ও সৈন্যরা মাসোহারা ছাড়াও লুঠতরাজের অর্থের ভাগ পেত। মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বীরা কর (KHARAJ) ও প্রদানের বিনিময়ে সম্পত্তির ও ধর্মাচারণের অধিকার বজায় রাখত। রাষ্ট্র ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সংরক্ষিত প্রজা বলে ঘোষণা করেছিল এবং সাম্প্রদায়িক নীতি নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধিকার প্রদান করা হয়েছিল।

আরব জনগোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক বিস্তৃতি ও একতাবদ্ধতা খুব সহজে লাভ করেনি। রাজ্যবিস্তারের সাথে সাথে সম্পদ ও পদ বণ্টনকে কেন্দ্র করে নানারকম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তার ফলে উম্মার একতা এক সংকটের মুখোমুখি হয়। ইসলামীয় রাজ্যগঠনের প্রথম দিকে মক্কার Kharaj রাই শাসকশ্রেণী গঠন করতেন। নিজের আধিপত্য বিশেষভাবে বজায় রাখবার জন্য তৃতীয় খলিফা (quarsh) শ্রেণীভুক্ত উথমান (৬৪৪-৫৬) শাসকশ্রেণীতে কেবল তার ঘনিষ্ঠ লোকজনদের নিয়োগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই শাসন ব্যাপারে মক্কার আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। ইরাক, মিশর ও মদিনার বিরোধী দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে উথমানকে হত্যা করে। উথমানের মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা হলেন আলী।

আলীর শাসনের পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পায়। এর পরিণতিতে মক্কার অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভূদের বিরুদ্ধে দুটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। আলীর সমর্থক ও বিরোধীরা পরবর্তীতে ইসলামের দুটি মূল গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়-শিয়া ও সুন্নী। কুফাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আলী মহম্মদের স্ত্রী আয়েশার নেতৃত্বে গঠিত সেনাবাহিনীকে কেমেলের (Camel) যুদ্ধে পরাজিত করেন (৬৫৭)। অবশ্য উথমানের অনুগত সিরিয়ার শাসক শাসক মুয়াইয়ার নেতৃত্বে গঠিত গোষ্ঠীকে তিনি দমন করতে সক্ষম হননি। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষে যুদ্ধবিরতিতে আলীর অনুগামীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আলীর প্রতি অনুগত থাকে অন্যরা তাকে ত্যাগ করে খারজী বলে পরিচিত হয়। অল্পদিন পরেই কুফাতে একটি মসজিদে একজন খারজীর হাতে আলীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর আলীর অনুগামীরা তার পুত্র হুসেন ও তার বংশধরদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ৬৬১তে মুয়াইয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন ও উমিয়াদ বংশ স্থাপন করেন। এই বংশ ৭৫০ পর্যন্ত টিকে ছিল।

গৃহযুদ্ধের পর আরব আধিপত্যের ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জনজাতি বিজেতাদের মধ্যেও তাদের বিজিত প্রজাদের অনুসৃত পরিশীলিত সংস্কৃতি গ্রহণ করবার প্রবণতা দেখা দেয়। Quraysh গোষ্ঠীর একটি শাখা উমিয়াদের আমলে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় দফার দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা য়ায়।

উমিয়াদ গোষ্ঠী ও শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ

বিপুল পরিমাণ রাজ্য দখলের ফলে মদিনা ভিত্তিক খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটে। এর স্থলে ক্রমবর্ধমান একনায়কতন্ত্রের উদয় হয়। উমিয়াদরা ধারাবাহিক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবার ফলে উম্মাতে তাদের নেতৃত্ব দৃঢ়তর হয়। প্রথম উমিয়াদ খলিফা মুয়াইয়া তার রাজধানী দামাস্কাসে স্থানান্তরিত করেন ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আদলে রাজসভায় নানা প্রথারও প্রবর্তন করেন। বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও তিনি গড়ে তোলেন। বংশগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রবর্তন করে তিনি বিশিষ্ট মুসলমানদের তাদের পুত্রকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করতে অনুরোধ করেন। এই নতুন ব্যবস্থা পরবর্তী খলিফারাও মেনে চলেন। এর ফলে উমিয়াদরা ৯০ বছর এবং আব্বাসিদরা দু-শতাব্দী ব্যাপী ক্ষমতাসীন থাকেন।

উমিয়াদ রাষ্ট্র এখন শুধুমাত্র সরাসরি ইসলাম কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, এটি সিরিয়

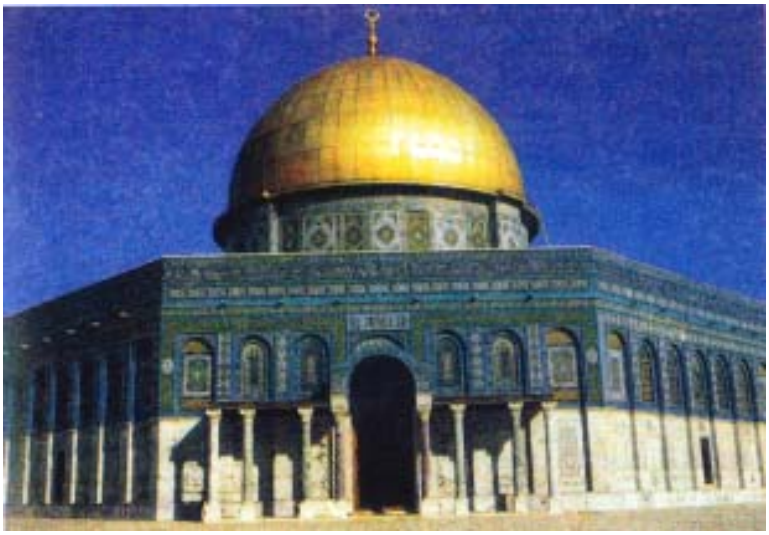

প্রথম যুগের ইসলামীয় স্থাপত্যের নিদর্শন আবাদ আল মালিক নির্মিত প্রস্তরের গম্বুজ। জেরুজালেম নগরীতে মুসলমানদের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ এই স্মারকটির সঙ্গে মহম্মদের স্বর্গের পথে রাত্রিকালীন যাত্রার কথা জড়িয়ে আছে।

সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য ও শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শাসনতন্ত্রের মধ্যে ছিলেন খ্রিস্টান উপদেষ্টা ও জোরথু স্ত্রীয় লিপিকর ও আমলারা। উমিয়াদরা সবসময় একতার জন্য আবেদন জানাতেন ও ইসলামের নামে সব ধরনের বিদ্রোহকে দমন করতেন। তারা তাদের আরবীয় সামাজিক পরিচিতিটাও বজায় রাখতেন। আবাদ-আল-মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলে আরবী ও ইসলামীয় দুই ধরনের পরিচয়ের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হত। আবাদ-আল-মালিকের গ্রহণ করা কর্মপন্থাগুলোর মধ্যে ছিল—শাসনক্ষেত্রে আরবীয় ভাষার প্রবর্তন এবং ইসলামীয় মুদ্রার প্রবর্তন। বাইজেন্টাইন এবং ইরানীয় মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত সোনার দীনার এবং রূপোর দীরহাম ছিল খলিফাতন্ত্রে প্রচলিত মুদ্রা। আগুনের বেদী ও ক্রুস চিহ্নিত মুদ্রাগুলোতে গ্রীক ভাষা ও ইরানে প্রচলিত পহেলবী ভাষা মুদ্রিত ছিল। এই চিহ্নগুলিকে অবলুপ্ত করে মুদ্রায় আরবীয় লিপির প্রচলন করা হয়। জেরুজালেমে Dome of the rock নির্মাণ করে আবাদ-আল-মালিক আরব-ইসলামীয় পরিচিতির বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

আবাদ আল মালিকেরা মুদ্রা সংক্রান্ত পরিবর্তন

বাইজেন্টেনীয় থেকে আরব ইসলামীয় মুদ্রার বিবর্তন তিনটি মুদ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় মুদ্রাটিতে তরোয়াল হাতে শ্মশ্রু ও দীর্ঘ কেশ শোভিত খলিফার পরিধানে পরম্পরাগত আরবী পোষাক। পরবর্তী আমলে শিল্পচর্চায় জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আবাদ আল মালিকের মুদ্রাসংক্রান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যোগসূত্র ছিল। তার সফল মুদ্রানীতির ফলে পরবর্তী শতকগুলোতে তৃতীয় চিত্রে প্রতিফলিত মুদ্রার আকার ও ওজনের মুদ্রা তৈরি হত। সম্রাট হেয়াক্লিয়াস্য এবং তার দুই পুত্রের চিত্র সম্বলিত মুদ্রা আবাদ-আল-মালিকের লিপি অংকিত।

Byzantine gold solidus (denarius aureus) showing the emperor Heraclius and his two sons.

Portrait gold dinar struck by Abd al-Malik with is name and image.

The reformed dinar was purely epigraphic. It carries the kalima: 'There is no God but Allah and He has no partner (sharik)'

আব্বাসিদ বিদ্রোহ

মুসলমান শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের সফলতার জন্য উমিয়াদদের প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে দাওয়া নামক সুসংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে উমিয়াদদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তাদের জায়গায় মক্কাকেন্দ্রীক আব্বাসিদ বংশ ক্ষমতায় আসে। আব্বাসিদরা উমিয়াদ শাসনকালকে কুশাসন বলে প্রচার করে পয়গম্বরের প্রদর্শিত আদত ইসলামকে ফিরিয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করে। এই বিপ্লবের ফলে শুধু বংশগতই নয়, ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়।

পূর্ব ইরাণে সুদুর খোরাসান অঞ্চলে আব্বাসিদ বিদ্রোহ গড়ে উঠে দামাস্কাস থেকে দ্রুতগামী ঘোড়াতে খোরাসান ছিল ২০ দিনের পথ। এখানকার মিশ্রিত আরব ইরাণী জনগণকে যেকোনও কাজের জন্য ব্যবহার করা যেত। আরব সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল ইরাক থেকে আগত এবং তারা সিরিয়দের আধিপত্য অপছন্দ করত। খোরাসানে বসবাসকারী সাধারণ আরবদের উমিয়াদ শাসনব্যবস্থার প্রতি কোনও আস্থা ছিল না। কারণ তারা কর মকুব ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দানের আশ্বাস দিয়ে তা কাজে পরিণত করেনি। জাত-সচেতন আরবদের ঘৃণার পাত্র হয়ে ইরানীয় মুসলমানরা (Mawali) উমিয়াদদের ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য যেকোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল।

আব্বাসিদরা ছিলেন মহম্মদের কাকা আব্বাসের বংশধর। তারা বিভিন্ন বিদ্রোহী দলের সমর্থন লাভ করেছিলেন। মহম্মদের পরিবারের (ahl-al-bayt) এক সদস্য ত্রাতারূপে (mahdi) অত্যাচারী উমিয়াদ শাসন থেকে সমস্ত গোষ্ঠীকে রক্ষা করবে, এরকম প্রতিজ্ঞা করে আব্বাসিদরা ক্ষমতা লাভ করেন। আবু মুসলিম নামে একজন ইরানী ক্রীতদাসের নেতৃত্বে পবিত্র আব্বাসি দলের সেনাবাহিনী শেষ উমিয়াদ খলিফা মারোয়ানকে zab নদীর যুদ্ধে পরাজিত করে।

আব্বাসিদ শাসনকালে আরবদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায় ও ইরানী সংস্কৃতি গুরুত্ব লাভ করে। ইরানী নগর Ctesiphon এর ধ্বংসাবশেষের পাশে বাগদাদে আব্বাসিদের তাদের রাজধানী স্থাপন করে। ইরাক ও খোরাসানের লোকেদের যোগদানের সুযোগ করে দেবার জন্য সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র নতুনভাবে গঠিত হয়। আব্বাসিদ শাসকেরা খলিফাতন্ত্রের ধর্মীয় মর্যাদা ও কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ইসলামীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ও ইসলামীয় পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে সরকার ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে তাদের রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শাসন পদ্ধতি বজায় রাখতে হয়। উমিয়াদদের চমৎকার রাজকীয় স্থাপত্য এবং রাজসভায় অনুসৃত প্রথাগুলোও বহাল থাকে। রাজতন্ত্রকে অপসারণ করবার কৃতিত্বের যারা দাবিদার ছিলেন তারাই আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হলেন।

দ্বিতীয় আব্বাসিদ রাজধানী সামারাতে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আল মুত্তাওয়াকিল মসজিদ। মেসোপটেমিয়ার স্থাপত্যের আদলে ৫০ মিটার উঁচু ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভটি বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ বলে পরিচিত ছিল।

খলিফাতন্ত্রের পতন এবং সুলতানতন্ত্রের

কার্যক্রম - ১

খলিফা আমলের বিভিন্ন রাজধানীর স্থান নির্দেশ কর। তোমার ধারণা অনুযায়ী কোনটি সবচাইতে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল?

উত্থান

নবম শতাব্দী থেকে আব্বাসিদ রাষ্ট্রের দূর্বলতা দেখা দিতে থাকে। তার কারণ ছিল, দূরবর্তী রাজ্যগুলোর উপর বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাওয়া ও সামরিক বাহিনীতে ও আমলাতন্ত্রে আরব পন্থী ও ইরানীয় পন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুণ আল রসিদের পুত্র আমীন ও মামুনের সমর্থকদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হয়। এর ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় এবং তুর্কী দাস আধিকারিকদের (mamluk) নিয়ে একটি নতুন ক্ষমতা গোষ্ঠী তৈরি হয়। সিয়ারা আবার সুন্নি রক্ষণশীলতার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। খোরাসান ও ট্রানসক্সিয়ানায় তাহিরিদ ও সামানিদ এবং মিশর ও সিরিয়ায় টালানিডসের মতন অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজবংশের উদয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই আব্বাসিদদের প্রতিপত্তি মধ্য এবং পশ্চিম ইরানে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বায়াদ নামে ইরানের কাস্পিয়ান এলাকার একটি সিয়াগোষ্ঠী বাগদাদ দখল করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আধিপত্যটুকুও অন্তর্হিত হল। প্রাচীন বায়াদ শাসকেরা ইরানী পদবি শাহেনশা সহ সহ অন্য আরও অনেক পদবি গ্রহণ করলেও খলিফা পদবি তারা গ্রহণ করেননি। আব্বাসিদ খলিফাকে তারা সুন্নি প্রজাদের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলে স্থান দিয়েছিলেন।

খলিফাতন্ত্র বিলোপ না করবার সিদ্ধান্ত ছিল বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ফাতিমাবাদী বলে পরিচিত অন্য একটি সিয়া বংশ সমগ্র ইসলামীয় এলাকা শাসন করবার জন্য উৎসাহী ছিল। ফাতিমাবাদীরা ছিল সিয়াপন্থী ইসলামীয় উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত এবং তারা নিজেদের মহম্মদের কন্যা ফাতিমার বংশধর ও ইসলামের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত শাসক বলে দাবী করত। উত্তর আফ্রিকাতে তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে তারা ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিশর অধিকার করে ফাতিমাবাদী খলিফাতন্ত্র স্থাপন করে। মিশরের প্রাক্তন রাজধানী ফুস্তাদ থেকে সরিয়ে মঙ্গল গ্রহ উদয়ের দিনে কায়রোতে নতুন রাজধানী স্থাপন করা হয়। দুটি বিরোধী রাজবংশ বায়াদ ও ফাতিমাবাদীরা সিয়াপন্থী শাসক, কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করত।

৯৫০ থেকে ১২০০ র মধ্যে ইসলামীয় সমাজ কোন একটা রাজনৈতিক বা ভাষিক সূত্রে গ্রথিত ছিল না। এর একতার মূলে ছিল অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ধারা। রাষ্ট্র ও সমাজের পৃথক সত্ত্বা, ইসলামীয় সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে পার্সি ভাষার ক্রমোন্নতি এবং বৌদ্ধিক পরম্পরার আদান প্রদানের ফলে রাজনৈতিক ভেদাভেদের মধ্যেও একতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। মধ্য ইসলামীয় ভূমিতে পণ্ডিত, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের অবাধ চলাফেরা ধ্যান ধারণা ও রীতি নীতির প্রসার ঘটিয়েছিল। কিছু ধ্যান ধারণা ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে গ্রাম স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। উমিয়াদ শাসনকালে ও আব্বাসিদ শাসনের প্রথম দিকে ইসলাম জনসংখ্যা ছিল ১০ শতাংশেরও কম। ক্রমে এই সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। অন্য ধর্ম থেকে পৃথক একটি ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ধারা হিসেবে ইসলামের পরিচয় স্থাপিত হয়। এর ফলে ধর্মান্তকরণ অর্থবহ হয়ে ওঠে ও এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতানতন্ত্রের উত্থানের ফলে আরব ও ইরানীদের সঙ্গে একটি তৃতীয় জাতিগোষ্ঠী যুক্ত হল। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানের চারণভূমির যাযাবর গোষ্ঠী বলে পরিচিত তুর্কীরা ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। দক্ষ ঘোড়সওয়ার ও যোদ্ধা বলে খ্যাত তুর্কীরা আব্বাসিদ, সামানিদ, বায়াদ শাসনকালে ক্রীতদাস ও যোদ্ধা হিসেবে যোগদান করে। তারা তাদের আনুগত্য ও সামরিক দক্ষতার ফলে উঁচু পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আল্পটগিন প্রতিষ্ঠিত গজনীর সুলতান তন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়। গজনীর মাহমুদের কালে (৯৯৮-১০৩০)। বায়াদদের মতন গজনীরাও ছিল একটি সামরিক বংশ। তুর্কী

এবং ভারতীয় (তিলক নামে একজন ছিলেন মাহমুদের সেনাপতি) সেনাদের নিয়ে গঠিত একটি পেশাদারি সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের অধীন। কিন্তু তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল খোরাসান ও আফগানিস্থানে এবং আব্বাসিয় খলিফারা তাদের শত্রু ছিলেন না বরং ছিলেন তাদের বৈধতার উৎস। মহম্মদ তার দাস পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং খলিফার কাছ থেকে সুলতান পদবি লাভ করবার জন্যও তিনি ব্যগ্র ছিলেন। সিয়াদের ক্ষমতাকে প্রতিহত করবার জন্য খলিফা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত গজনীদের সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

সালজুক তুর্কীরা সামানিদ ও কোরা খান্দিসদের (দূর প্রাচ্যের অমুসলমান তুর্কী) সেনাবাহিনীতে যোদ্ধা হিসেব যোগদান করে তুরাণে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে তুঘরীল ও চামরীবেগ নামে দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে তারা একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। গজনীর মাহমুদের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে সালজুকরা ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে খোরাসান জয় করে নিশাপুরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারলিক-ইসলামীয় শিক্ষাকেন্দ্র। ওমর খৈয়ামের জন্ম ভূমি তাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর সালজুকরা পশ্চিম পার্সিয়া ও ইরাকের দিকে মনোনিবেশ করে। ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে তারা বাগদাদ অধিকার করে এই এলাকাকে সুন্নি শাসনভুক্ত করে। খলিফা আল কায়েম তুঘরীল বেগকে সুলতান উপাধি দান করেন। এই ঘটনা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিচ্ছিন্নকরণ সূচিত করে। জনজাতিদের পারিবারিক শাসন প্রথার অনুকরণে দুই সালজুক ভাই একত্রে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। তুঘরিলের পর ক্ষমতায় আসেন তার ভাগ্নে আলপ্ আরসালান। আলপ্ আরসালানের রাজত্বকালে সালজুক সাম্রাজ্য আনাটোনিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

* একটি গুরুত্বপূর্ণ পারসিক-ইসলামীয় শিক্ষাকেন্দ্র। ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি।

১১০০ থেকে ১৩০০ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের সঙ্গে আরব রাজ্যগুলোর যে ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব হয়েছিল নীচে আমরা সে আলোচনা করব। ১৩০০ শতাব্দীর শুরুতে, মুসলিম জগৎ মোঙ্গলদের আক্রমণে এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। শেষ যাযাবর আক্রমণ হলেও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার প্রতি এ ছিল এক চরম আঘাত। (প্রসঙ্গ ৫ দেখ)

ধর্মযুদ্ধ

খিস্টানদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ (The New Testament বা Injil) ছিল বলে মধ্যযুগীয় ইসলামীয় সমাজে তাদের কেতাবী লোক বলে মনে করা হত। মুসলমান রাজ্যগুলোতে ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, দূত অথবা পরিব্রাজক হয়ে চলাফেরা করবার সময় খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা প্রদান করা হত। একদা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই এলাকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পবিত্র প্যালেস্টাইন ভূমি। জেরুজালেম ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবদের অধিকারভুক্ত হলেও খ্রিস্টানদের মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে ধারণাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠে। নরম্যান, হাঙেরিয়ান ও কিছু সংখ্যক স্লাভ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও মুসলমানরাই প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচিত হল। এই শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে কিছু পরিবর্তন হয় যার ফলে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বৈরিতা বৃদ্ধি পায়। যাজক সম্প্রদায় ও যোদ্ধা শ্রেণী কৃষি ও ব্যবসার উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল। Peace of God

আন্দোলন প্রতিযোগী সামন্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে সামরিক দ্বন্দ্বের ও লুটতরাজের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। পূজো-অর্চনার জায়গায় মত বিশেষ জায়গায়, ও চার্চের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্র সময়ে, যাজক সম্প্রদায় ও সাধারণ জনগণের মত অরক্ষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম সামরিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। এই আন্দোলন খ্রিস্টান জগতের প্রতি বা ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সমস্ত আগ্রাসী মনোভাব দূর করবার চেষ্টা করে। এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু অনুমোদিতই ছিল না, প্রশংসনীয়ও ছিল।

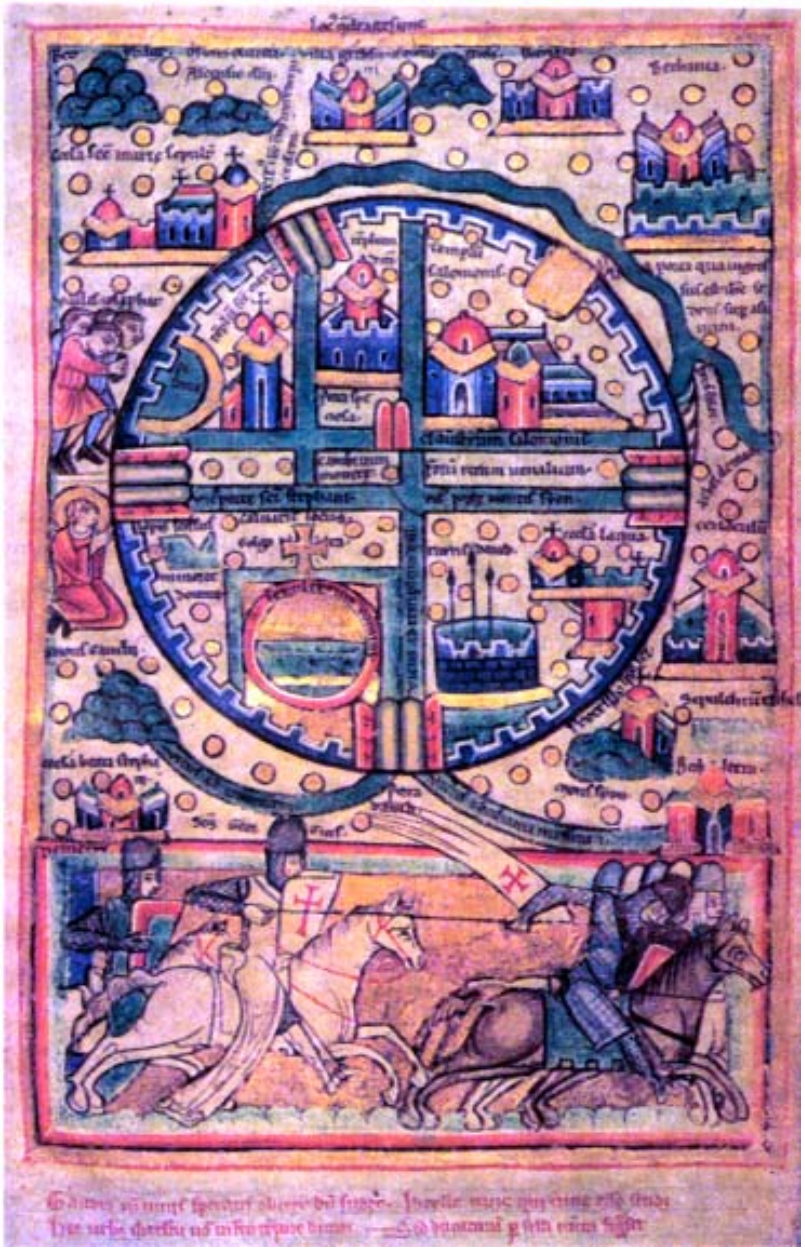

আলেপ্প, ৬৩৬-এ আরবদের অধিকৃত একটি হাইতীয়, আসিরিয়ান এবং হেলেনীয় কেন্দ্র। পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে এটিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব চলেছিল। ছবিতে সক্রিয় যোদ্ধাদের দেখা যাচ্ছে।

১০৯২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সালজুক সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি বাইজেন্টাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সাসের কাছে এশিয়া মাইনর ও উত্তর সিরিয়া পুনর্দখল করবার সুযোগ সৃষ্টি করে। পোপ দ্বিতীয় আর্বানের জন্য এটি ছিল খ্রিস্টান ধর্ম পুনর্জাগরণ ঘটাবার সুযোগ। পবিত্র ভূমি উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে যোগ দিয়ে ভগবানের নামে যুদ্ধের আহ্বান জানান। ১০৯৫ থেকে ১২৯১র মধ্যে পশ্চিম ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলের মুসলমান রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধগুলি পরবর্তীতে ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত হয়।

প্রথম ধর্মযুদ্ধে (১০৯৮-৯৯) ফ্রান্স ও ইটালির সৈন্যবাহিনী সিরিয়ার অ্যান্টিয়ক দখল করে জেরুজালেম দখলের দাবি জানায়। খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই যুদ্ধের বিজয়োৎসবের অঙ্গ হিসেবে মুসলমান ও ইহুদীদের নিধনের কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমান লেখকেরা খ্রিস্টানদের আগমণকে ফ্রাঙ্কীয় আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। ফ্রাঙ্কীয়রা সিরিয়া-প্যালেস্তাইন অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যে

চারটি ধর্মযোদ্ধা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই এলাকাগুলো একত্রে Outremer বলে পরিচিত হল এবং পরবর্তী ধর্মযুদ্ধগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এই Outremer এর সুরক্ষা এবং বিস্তার। Outremer কিছুদিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার পর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীরা এডেসা দখল করলে পোপ দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের জন্য আবেদন জানান। জার্মানী ও ফ্রান্সের যৌথ সেনাবাহিনী দামাস্কাস দখলের চেষ্টা করো কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এর পর থেকে Outremer এর শক্তির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনার জায়গায় বিলাসী জীবনযাত্রা ও খ্রিস্টান শাসকদের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই শুরু হয়। একটি মিশরীয় সিরিয় সাম্রাজ্য গঠন করে সালাল আলদিন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধ জিহাদ বা পবিত্র যুদ্ধের আহ্বান জানান এবং ১১৮৭ তে তাদের পরাজিত করেন। প্রথম ধর্মযুদ্ধের প্রায় এক শতাব্দী পর তিনি জেরুজালেম উদ্ধার করেন। সেসময়কার নথিপত্র থেকে জানা যায় সালাল আলদিন খ্রিস্টান জনগণের সঙ্গে মানবিকতা পূর্ণ ব্যবহার করতেন। এর পূর্ববর্তী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের ও ইহুদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন সালাল আলদিন সে ব্যাপারে একটি পার্থক্য সূচিত করেন। যদিও তিনি পবিত্র Sepulchre গীর্জার দায়িত্ব খ্রিস্টানদের উপর ন্যস্ত করেন, তার আমলে অজস্র গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করা হয় ও জেরুজালেম আবার একটি মুসলমান নগরে পরিণত হয়।

* যারা যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, পোপ তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র ক্রুশ প্রদান করতে আদেশ দেন।

এতে খ্রিস্টানরা ১১৮৯-তে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু প্যালেস্টাইনে কয়েকটি উপকূলবর্তী ছোট শহর অধিকার করা ও খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের অবাধে জেরুজালেমে প্রবেশের অধিকার আদায় করা ছাড়া যোদ্ধারা আর কোনও কিছু লাভ করতে সমর্থ হননি। মিশরের মামলুক শাসকেরা শেষ পর্যন্ত ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযোদ্ধা খ্রিস্টানদের সমগ্র প্যালেস্টাইন থেকে বহিষ্কার করে। ইউরোপে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তাদের সামরিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে ও তার জায়গায় এদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহিত হয়ে উঠে।

খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের উপর ধর্মযুদ্ধ দুভাবে দীর্ঘ প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে মিশ্র ধর্মীয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলে সুরক্ষার প্রয়োজন ও দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি মুসলমান রাষ্ট্রের একটি কঠিন মনোভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে মুসলমানরা ক্ষমতায় আসার পরেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসার ব্যাপারে ইটালিয় বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য বজায় থাকে।

সিরিয়াতে ফ্রাঙ্কগণ

ফ্রাঙ্কীয় প্রভুরা অবদমিত মুসলমান প্রজাদের প্রতি সবসময় একই ধরনের ব্যবহার করতেন না। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনকারী প্রথমদিকের ধর্মযোদ্ধারা, এখানে পরবর্তীতে আগত তাদের সমগোত্রীয়দের চাইতে মুসলমান জনগণের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সহনশীল ছিলেন। দ্বাদশ শতকের একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী ওসামা ইবন্ মানকিদ তার নতুন প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে বলেছেন—

"Among the Franks there are some who have settled down in this country and associated with Muslims. These are better than the newcomers, but they are exceptions to the rule, and no inference can be drawn from them

Here is an emample. Once I sent a man to Antioch on business. At that time, Chief Theodore Sophianos [an he and I were friends. He was then all powerful in Antioch. One day he said to my man, "One of my Frankish friends has invited me. Come with me and see how they live." My man told me : "So I went with him, and we came to the house of one of the old knights, those who had come with the firstr Frankish Expedition. He had already retired from state and military service, and had a property in Antioch from which he lived. He produced a fine table, with food both tasty and cleanly served. He saw that I was reluctant to eat, and saidl : "Eat to your heart's content, for I do not eat Frankish food. I have Egyptian women cooks and eat nothing but what they prepare, nor does swine flesh ever enter my house." So I ate, but with some caution, and we took our leave.

A crusader castle in Syria. Built during the crusades (1110), it was an important base to attack Arab-controlled areas. The towers and aqueducts were built by the Mamluk sultan, Baybars, when he captured it in 1271.

Later I was walking through the market, when suddenly a Frankish woman caught hold of me and began jabbering in their language, and I could not understand what she was saying. A crowd of Franks collected against me, and I was sure that my end had come. Then, suddenly, that same knight appeared and saw me, and came up to that woman, and asked her: "What do you want of this Muslim?" She replied: "He killed my brother Hurso." This Hurso was a knight of Afamiya who had been killed by someone from the army of Hama, Then the knight shouted at her and said, "This man is a *burjasi* [bourgeois, that is, a merchant]. He doen not fight or go to war." And he shouted at the crowd and they dispersed; then he took my hand and went way. So the effect of that meal that I had was to save me from death."

– *Kitab al-Itibar.*

অর্থনীতি ঃ কৃষি, নগরায়ন ও ব্যবসা

নতুনভাবে অধিকৃত এলাকাগুলোতে বসবাসকারী জনগণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। এব্যাপারে ইসলামীয় রাষ্ট্র কোনও পরিবর্তন সাধন করেনি। বড় ও ছোট কৃষকেরা ও কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছিল জমির মালিক। ইরাক ও ইরানে বিস্তৃত জমি কৃষকেরা চাষ করত। সেসেনীয় ও ইসলাম আমলে জমিদাররা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কর আদায় করতেন। চারণ ভূমি থেকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হওয়া এলাকাগুলোতে জমি ছিল সামগ্রিকভাবে গ্রামের সম্পত্তি। সবশেষে ইসলামীয় রাজ্য জয়ের পর যে সমস্ত বড় খামার তাদের মালিকেরা পরিত্যাগ করেছিলেন সেগুলো রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। এ সমস্ত ভূমি মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণী, বিশেষ করে খলিফার পরিবারের সদস্যদের হস্তান্তরিত করা হয়।

রাজ্যজয়ের পর্ব শেষ হবার পর সামগ্রিকভাবে কৃষিজমির উপর রাষ্ট্রের অধিকার স্থাপিত হল। আদায়ীকৃত করের অধিকাংশই আসত কৃষি জমি থেকে। আরবদের অধিকৃত অংশে যে সমস্ত জমি মালিকদের হাতে রয়েছিল তাদের খরাজ বলে বিশেষ কর দিতে হত। এই করের পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী অর্ধেক থেকে এক পঞ্চমাংশের মধ্যে ধার্য্য হত। মুসলমানদের অধিকৃত বা কর্ষিত জমিতে উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ কর হিসেবে আদায় করা হত। যখন কম কর দেবার উদ্দেশ্যে অ-মুসলমানরা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করল, তখন রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ কমে গেল। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য প্রথম অবস্থায় খলিফারা ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহ করলেন। এবং পরবর্তীতে অভিন্ন কর প্রথার প্রচলন হয়। দশম শতাব্দী এবং পরবর্তী সময়ে ইকতা নামক অঞ্চলগুলো থেকে প্রাপ্ত কৃষিকর রাষ্ট্রের কর্মীদের মাসোহারা হিসেবে বরাদ্ধ করা হয়।

শষ্য রোপনের দৃশ্য। শ্রমিকদের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে।

–Arabic version of the Pseudo-Galen's Book of Antidotes, 1199 (see the story of Doctor Galen, p. 63).

কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির হাত ধরে আসে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। অনেক জায়গায়, বিশেষ করে নীল নদ উপত্যকায় রাষ্ট্র জলসেচ, বাঁধ তৈরি, খাল ও কূপ খনন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সমস্ত ব্যবস্থা অধিক ফলনের সহায়ক। যারা জমিতে কৃষিকাজ শুরু করেছিল, ইসলামি আইনগুলোতে তাদের কর মুকুবের ব্যবস্থা ছিল। কৃষকদের উদ্যোগে ও রাষ্ট্রের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য কারিগরী পরিবর্তন ছাড়াও কৃষিজ জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেক নতুন ধরনের ফসল যেমন তুলো, কমলা, কলা, লাউ, পালংশাক, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়, এমনকি এগুলো ইউরোপেও রপ্তানি হতে থাকে।

নগরগুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামীয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বিশেষভাবে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ আরব সৈন্যদের বসবাসের জন্য

অনেক নতুন নগরের পত্তন হল। সৈন্যদলের জন্য তৈরি Misr বলে পরিচিত এই নগরগুলোর মধ্যে ছিল ইরাকের কুফা এবং বসরা, মিশরের ফুস্তান এবং কায়রো। আব্বাসিদ খলিফাতন্ত্রের (৮০০) রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার অর্ধ শতকের মধ্যে বাগদাদের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটিতে পৌঁছয়। এই নগরগুলো ছাড়াও দামাস্কাস, ইস্পাহান ও সমরখন্দের মত পুরনো নগরগুলোরও পুনরুজ্জীবন ঘটে। খাদ্যশস্য ও নগরকেন্দ্রিক শিল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তুলো, চিনি ইত্যাদি কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই নগরগুলোর জনসংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পায়। একটি শহরের সঙ্গে অন্যটির যোগাযোগ ঘটিয়ে এক বিশাল নাগরিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠে।

বাগদাদে নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি স্থাপত্য — মসজিদ ও কেন্দ্রীয় বাজার-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করত। প্রকাণ্ড মসজিদটি বহু দূর থেকে নজরে পড়ত ও বাজারটিতে ছিল শ্রেণীবদ্ধ বিপণি, ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ও মুদ্রা বিনিময়কারীদের কর্মস্থল। শাসকগোষ্ঠী, বিদ্বজ্জন ও ব্যবসায়ীদের আবাস ছিল নগরগুলোর কেন্দ্রস্থলে। পরের অংশে থাকতেন সাধারণ নাগরিকেরা ও সৈন্যরা। তাদের প্রত্যেকের বাসস্থানের নিকটবর্তী জায়গায় ছিল মসজিদ, গীর্জা অথবা সিনাগগ, বাজার, গণস্থানাগার ও একটি সভাস্থল। শহরের বাইরের অংশে ছিল গ রীব জনসাধারণের বাসগৃহ, শহরতলী থেকে আনা শাকসব্জি ও ফলের বাজার, দলবদ্ধভাবে চলাচলের উপযুক্ত গাড়ীর স্টেশন, চামড়া ও মাংসের মত পণ্যের অপরিচ্ছন্ন দোকান ইত্যাদি। নগরীর প্রাকারের বাইরে ছিল সরাইখানা ও গোরস্থান। নগরীর দ্বার রুদ্ধ থাকাকালীন এসমস্ত সরাইখানায় সাধারণ লোকের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। প্রাকৃতিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরম্পরা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে এই সমস্ত আয়োজনের নানা পরিবর্তন হত।

ভারতীয় চালক ও আরব যাত্রীসহ বসেরার উদ্দেশ্যে নৌকাযাত্রা। প্রাক-আধুনিক যুগে জলপথে যাত্রী ও মাল পরিবহন ছিল নিরাপদ ও সুলভ।

রাজনৈতিক একতাবদ্ধতা এবং খাদ্য ও বিলাসী দ্রব্যের নাগরিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে আদান প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়িক এলাকায় বিস্তৃত মুসলমান সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সুবিধাজনক। পাঁচ শতক ব্যাপী চীন, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর আরব ও ইরানী ব্যবসায়ীদের একাধিপত্য বজায় থাকে। এই ব্যবসা মূলতঃ লোহিত সাগর, ও পারস্য উপসাগরের পথ ধরে চালিত হত। মশলা, কাপড়, পোর্সেলিন ও বারুদ ছিল বহুমূল্য ব্যবসায়িক পণ্য। এগুলোকে দূর যাত্রায় ভারতবর্ষ ও চীন থেকে জাহাজ যোগে লোহিত সাগরের এডেন ও আয়ধ্যাব বন্দর ও উপসাগরের সিরাফ ও বসেরা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হত। এখান থেকে স্থলপথে উটের গাড়ীতে

চাপিয়ে পণ্যসামগ্রী, স্থানীয় ব্যবহার বা চালানের জন্য বাগদাদ, দামাস্কাস বা আলেপ্পর গুদামঘরে পাঠানো হত। মক্কার ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তারা অনেক সময়ে হজযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হত। ভারত মহাসাগরের জলযাত্রার সময় হজযাত্রা সংঘটিত হলে এরকম পরিস্থিতি হত ও মরুভূমিতে চলমান দলের জনসংখ্যা বেড়ে যেত। এই ব্যবসা পথের ভূমধ্যসাগরীয় শেষকেন্দ্রে ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর। এখান থেকে ইউরোপে পণ্য রপ্তানির দায়িত্ব পালন করত ইহুদীরা। Genzia সংগ্রহে রক্ষিত চিঠিপত্র থেকে অনুমান করা যায় যে এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে সরাসরি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করত। তবে দশম শতাব্দী থেকে ইটালির ব্যবসায়িক নগরগুলোতে প্রাচ্য দেশীয় জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে কায়রোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় লোহিত সাগরের ব্যবসায়িক পথ অধিক গুরুত্ব লাভ করল।

কার্যক্রম - ২

বসেরার একটি সকালের বর্ণনা দাও।

কাগজ, গেলিজা তথ্য এবং ইতিহাস

কাগজ আবিষ্কারের পর মধ্য ইসলামীয় ভূমিতে লিখিত তথ্য বহুলভাবে বিস্তার লাভ করে। চীনে আবিষ্কৃত কাগজ অত্যন্ত (লিলেন থেকে তৈরী) গোপন পদ্ধতিতে তৈরী হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে সমরখন্দের মুসলমান শাসক ২০,০০০০ চীনদেশী ? আক্রমণকারীকে বন্দী করেন। তাদের মধ্যে আনেকে কাগজ তৈরীতে দক্ষ ছিল। পরবর্তী ১০০ বছর সমরখন্দ থেকে কাগজ রপ্তানী হত। ইসলাম ধর্মে একাধিপত্য নিষিদ্ধ হওয়ায়, অন্যান্য ইসলামীয় দেশেও কাগজ তৈরী শুরু হল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় সর্বত্র প্যাপিরাসের বদলে কাগজের ব্যবহার দেখা যায়। নীল নদের উপত্যকায় জন্মানো এক বিশেষ ধরনের গুল্মের আঁস থেকে তৈরী প্যাপিরাস লিখবার কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রমে কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ১১৯৩ থেকে ১২০৭ পর্যন্ত মিশরে বসবাসকারী বাগদাদের একজন চিকিৎসক তার লেখার মধ্যে বর্ণনা করেছেন কেমন করে মিশরীয় কৃষকেরা কবর খুড়ে জিনিস উদ্ধার করত। তার লিনেন দিয়ে তৈরী জমির আচ্ছাদনগুলো সরিয়ে নিয়ে কাগজ তৈরীর কারখানায় বিক্রী করত।

ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক নথিপত্র তৈরী করবার কাজেও কাগজ ব্যবহৃত হত। কুস্তাতের রেন এজরা লিনাগগের একটি বদ্ধ ঘরে (গেলিজা) ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মধ্যযুগীয় ইহুদী নথিপত্রের এক বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। ঈশ্বরের নামোল্লিখিত যেকোন কাগজ বিনষ্ট না করবার যে ইহুদী প্রথা ছিল, তার ফলেই এ সমস্ত নথি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। গেলিজাতে প্রাপ্ত অজস্র নথিগুলোর মধ্যে সুদূর মধ্য অষ্টম শতকের নথিও ছিল। তবে অধিকাংশই ছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের অর্থাৎ ফাতেমাবাদী, আয়ুববাদী ও মামলুক শাসনের প্রথম আমলের। এই সমস্ত নথির মধ্যে ছিল ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত চিঠিপত্র, পারিবারিক চিঠি, দলিল, পত্র সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞাপত্র ইত্যাদি। হিব্রু অক্ষর ও আরবীয় ভাষার সমন্বয়ে সৃষ্টি হওয়া ইহুদী - আরবীয় (JUDAEO-ARABIC) ভাষা রেশীর ভাগ নথির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইহুদীদের মধ্যে এ ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। গেলিজাতে প্রাপ্ত এই নথিগুলো থেকে এমন নানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়, তেমনি ভূমধ্যসাগরীয় ও ইসলামীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও এখানে অনেক তথ্য রয়েছে। এগুলো পাঠ করে অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগীয় ইসলাম ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক দক্ষতাও তাদের অবলম্বন করা বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলো সে সময়কার ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দক্ষতা ও তাদের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলোর চাইতে ছিল উন্নততর। গোয়েটীন (Goitein) এ সমস্ত গেলিজা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি বিশাল ইতিহাস রচনা করেছেন। অমিতাভ ঘোষ তার বই 'In an Antique Land' এ একজন ভারতীয় ক্রীতদাসের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানেও লেখকের প্রেরণার উৎস ছিল গেলিজা থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি।

পূর্বপ্রান্তে ইরানী ব্যবসায়ীদের শকট বাহিনী বাগদাদ থেকে রেশম পথ ধরে বুখারা ও সমরখন্দের মত মরুদ্যান নগর হয়ে চীনদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিত। তাদের লক্ষ্য ছিল কাগজ সহ অন্যান্য মধ্যদেশীয় ও চীন দেশীয় জিনিস আমদানী করা। ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পথ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। উত্তরে রাশিয়া ও স্ক্যাণ্ডেনিভিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথ ইউরোপীয় পণ্য ও স্লাভ বন্দিদের আদান প্রদানের সহায়ক ছিল। এই সমস্ত পণ্যের জন্য দেয় ইসলামীয় মুদ্রা ভোল্গা নদীর ধারে ও বাল্টিক অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। খলিফা ও সুলতানদের সভার জন্য প্রয়োজনীয় মহিলা ও পুরুষ তুর্কী দাসও এ সমস্ত বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। রাজস্ব ব্যবস্থা ও বাজার অর্থনীতির ফলে মধ্য ইসলামীয় অঞ্চলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পণ্য ও পরিষেবার মূল্য দেবার জন্য সোনা, রূপো ও তামার মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। আফ্রিকা থেকে সোনা এবং মধ্য এশিয়া থেকে রূপো আমদানী করা কত। প্রাচ্য দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসার বিনিময়ে ইউরোপ থেকে মূল্যবান ধাতু ও মুদ্রা আমদানী করা হত। মুদ্রার ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে লোকে পুঞ্জীভূত সম্পদ বাজারজাত করতে বাধ্য হয়। মুদ্রার পাশাপাশি ঋণ ব্যবস্থাও ব্যবসা বাণিজ্যকে পুষ্ট করে। উন্নতমানের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মূল্য প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলে মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে মুসলমানেরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। এক জায়গা বা এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য জায়গা বা ব্যক্তির কাছে পণ্যের মূল্য প্রদানের সময় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কাররা ঋণপত্র বা বিনিময়পত্র ব্যবহার করতেন। বাণিজ্য পত্রের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে ব্যবসায়ীদের মুদ্রা সহ চলাচল করতে হত না, এরফলে তাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। খলিফাও কর্মীদের মাসোহারা বা কবি ও উচ্চপদাধিকারীদের পুরস্কার দেবার বেলায় ঋণপত্র ব্যবহার করতেন।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারিবারিক ব্যবসা প্রবর্তন ও দাসদের নিয়োগ করবার প্রথা সাধারণ ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, তবে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অংশীদারেরা ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করতেন। এক্ষেত্রে বোঝাপড়া অনুযায়ী তারা লাভ ক্ষতি ভাগ করে নিতেন। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কিছু বিধিনিষেধ মেনে চললে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনে কোন বাঁধা ছিল না। বিধিনিষেধের মধ্যে সুদসহ আদান প্রদান ছিল আইন বহির্ভূত, যদিও কিছু লোক অসদুপায় অবলম্বন করতেন। তারা এক ধরনের মুদ্রায় ধার করে অন্য ধরনের মুদ্রায় তা শোধ করতেন। এক্ষেত্রে সুদকে মুদ্রা বিনিময়ের দালালি বাবদ প্রাপ্য অর্থ বলে দেখানো হত। সহস্র এক আরব্য রজনীর অনেক গল্পে আমরা মধ্যযুগীয় ইসলাম সমাজের প্রতিফলন দেখতে পাই। সেখানে নাবিক, ক্রীতদাস, বণিক, মুদ্রা বিনিময়কারী ইত্যাদি চরিত্র অঙ্কন করে তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

বিভিন্ন ধরনের জনগনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মুসলমানরা নানারকম ধর্মীয় এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। তার ফলে ঈশ্বর ও পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়। জনজীবনে এবং একান্তে একজন মুসলমান ধর্মীয় আদর্শ আচরণ কেমন হতে

পারে? সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কি এবং কিভাবে মানুষ জানতে পারে ঈশ্বর তার সৃষ্টির কাছে কি প্রত্যাশা করেন? কেমন করে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য সম্বন্ধে জানতে পারে? মুসলমানদের সামাজিক পরিচয় দৃঢ়তর করবার জন্য এবং নিজেদের বৌদ্ধিক কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণির মুসলমানেরা সুসংহতভাবে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া গেল।

ধর্মীয় পণ্ডিতদের (উলমা) কাছে কোরাণ থেকে আহরিত জ্ঞান এবং পয়গম্বরের আদর্শ আচরণই ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানবার উপায় ও এই জগতে চলার পথের সঠিক নির্দেশ। মধ্যযুগে উলেমারা তফসির ও মহম্মদের প্রামাণ্য হাডিথ রচনার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। তাদের মধ্যে অনেক নিয়ম ও প্রথার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের আইনি বিধি প্রস্তুত করেছেন। তারা সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বরের সম্পর্কের দিক নির্দেশও করেছেন। নগরায়ণের ফলে জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হতে থাকে। এছাড়া কোরাণ ও হাডিথে সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাই ইসলামী আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রণেতারা নিজেদের বিচারশক্তি প্রয়োগ করেছেন।

আইনের সূত্র নির্দেশ ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতের ফলে অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চার ধরনের আইনের ধারা গড়ে উঠে। বিখ্যাত আইন প্রণেতাদের নাম অনুসারে এই চার ঘরানার আইনের নাম মালিকি, হানাফি, সাফি এবং হানবালি। এদের মধ্যে হানবালি ঘরানা ছিল সব চাইতে গোড়া। শরিয়া আইন সুন্নি সমাজে সমস্ত সম্ভাব্য আইনি বিষয়ের দিক নির্দেশ করত। তবে এই আইনগুলোতে ব্যবসায়িক, ফৌজদারি ও সাংবিধানিক বিষয়ের চাইতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয়গুলো ছিল বেশী স্পষ্ট। চূড়ান্ত আকার দেওয়ার আগে শরিয় আইন স্থানীয় প্রচলিত আইন এবং সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনগুলো পর্যালোচনা করেছে। তা সত্ত্বেও শহরতলীতে প্রচলিত আইনের আধিপত্য বজায় ছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন কন্যা সন্তানের জমির উত্তরাধিকার পাবার মতন বিষয়ে শরিয় আইনের চাইতে প্রচলিত আইন অধিক গ্রাহ্য ছিল। প্রায় সমস্ত শাসনকালেই শাসক বা তার

১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের মাস্তানসিরিয়া মাদ্রাসার লাগোয়া উদ্যান। মক্তবের পাঠ সাঙ্গ হলে ছাত্রেরা মাদ্রাসায় পড়তে আসত। সাধারণতঃ মাদ্রাসাগুলো মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বড় মাদ্রাসাতে মসজিদ সংলগ্ন থাকত।

কোরাণ

'And if all the trees on earth were pens and the ocean were ink with seven oceans behind it to add to its supply,
yet would not the words if Allah be exhausted in the writing.'
(Quran, chapter 31, verse 27)

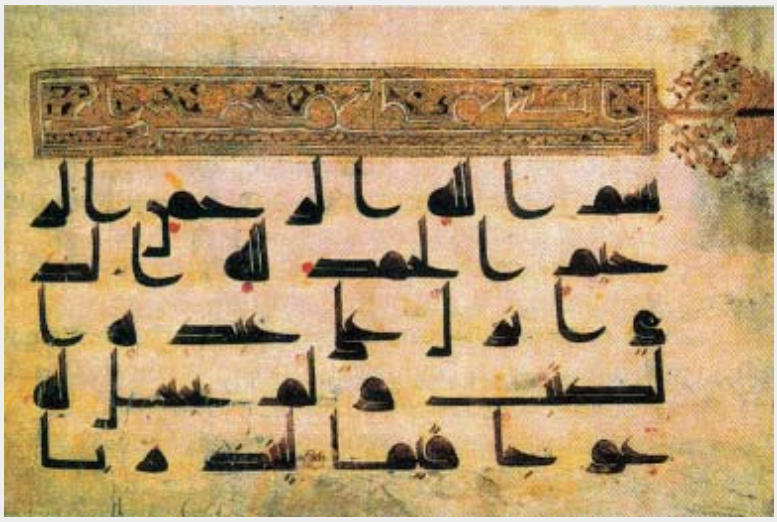

Page from a Quran written on vellum in the ninth century. It is the beginning of Sura 18, 'al-Kahf (The Cave) which refers to Moses, the Seven Sleepers of Ephesus and Alexander (Zulqar Nayn). The angular Kuft script has vowerl signs in red for the correct pronunciation of the language.

কোরাণের একটি পাতা। কৌণিক আকৃতির অক্ষরগুলোতে লাল দিয়ে VOWEL গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণে সাহায্য হয়।

কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত এবং ১৪টি অধ্যায়ে (সুরা) সমন্বিত ধর্মপুস্তক। অধ্যায়গুলোতে লিখনের দৈর্ঘ্য বড় থেকে ক্রমাগত ছোট হয়ে আসে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম প্রথম সুরা, যেখানে রয়েছে ছোট একটি প্রার্থনা। মুসলমান পরম্পরা অনুযায়ী পয়গম্বর মহম্মদের মক্কা ও মদিনা বাসকালে, ৬১০ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার কাছে ভগবানের পাঠানো বার্তা কোরাণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বার্তাগুলোকে একত্রিত করবার কাজ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ কোরাণটির সময়কাল নবম শতাব্দী। এছাড়াও কিছু প্রাচীনতর খণ্ডিতাংশ বিভিন্ন জায়গায় খোদিত আছে। Dome of Rock-এ এবং সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রায় খোদিত অংশ বিশেষ প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

প্রাচীন ইসলামের ইতিহাস নির্মাণের জন্য কোরাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। কোরাণের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদ ও যুক্তিবাদীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীদ খলিফা আলমামুন প্রচার করেন যে কোরাণ ভগবানের উক্তি নয়, ভগবানের সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ কোরাণ কোন ঘটনার বিবরণ না দিয়ে শুধু সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে থাকে। মধ্যযুগীয় ইসলামীয় পন্ডিতেরা সেজন্য হাডিথের সাহায্য নিয়ে কোরাণ পাঠ করেছেন। কোরণ পাঠের সাহায্যের জন্যেও অনেক হাডিথ লিখা হয়েছে।

আধিকারিকেরা রাষ্ট্রীর নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করতেন। মাত্র কিছু নির্বাচিত বিষয় বিচারের জন্য কাজির কাছে পাঠানো হত। প্রত্যেক নগরে বা এলাকাতে রাষ্ট্র কাজিদের নিযুক্ত করত। কঠিন হাতে শরিয় আইন প্রয়োগ না করে অনেক ক্ষেত্রেই কাজিরা মধ্যস্থতা করতেন।

মধ্যযুগীয় ইসলাম সমাজে একটি বিশেষ ধর্মভাবাপন্ন গোষ্ঠী সুফি বলে পরিচিত ছিলেন। তারা তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে গূঢ় ও বিশদ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করতেন। সমাজ যত বস্তুতান্ত্রিক বিলাসে নিমজ্জিত হচ্ছিল, সুফিরা ততই জগতের উর্ধ্বে উঠে ভগবানের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করছিলেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সর্বেশ্বরবাদ ও ভালোবাসার প্রভাবে তপস্যার স্তর কৃচ্ছসাধনের স্তরে উন্নীত হয়। সর্বেশ্বরবাদ ঈশ্বর ও তার সৃষ্টির একই অস্তিত্ব সূচিত করে। তারা বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা তার স্রষ্টার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। বসরা অঞ্চলের সাধ্বী রাবেরা তার কবিতাগুলোর মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাই মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হতে সাহায্য করে। যেকোন ব্যক্তির নিজেকে ঈশ্বরে নিমজ্জিত করবার গুরুত্ব প্রথম প্রচার করেছিলেন, বাইয়াজিদ বিষ্টামি নামক একজন ইরানী সুফি। সুফিরা উদ্দামতা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ভালোবাসা ও করুণা জাগানোর জন্য সঙ্গীতের ব্যবহার করতেন।

ইরাণী পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত চিত্র। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ।

ধর্মীয় পরিচিতি, মর্যাদা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার কাছে সুফিদের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। মিশরের পিরামিডের পাশে আজও ধূলনান মিস্ত্রির (৮৬১) কবর দেখতে পাওয়া যায়। ইনি আব্বাসিদ কলিফা আল মুক্তাক্কিলের কাছে বলেছিলেন যে একজন জলবাহকের কাছে তিনি সত্যিকারের শৌর্যের ও একজন বৃদ্ধা মহিলার কাছে আদর্শ ইসলামের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দর্মচর্চাকে ব্যক্তিগত স্তরে রূপান্তরিত করবার ফলে সুফি প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠে গোড়া ইসলাম ধর্মকে প্রশ্নের সামনে দাড় করিয়ে দেয়।

গ্রীসদেশীয় দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রভাবে ইসলামীয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঈশ্বর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নতুন দারণা সৃষ্টি হয়। সপ্তম শতকে বাইজেন্টাইন এবং সেসেনিয়ান সাম্রাজ্যে মৃতপ্রায় গ্রীসদেশীয় সভ্যতার অবশিষ্টাংশ লক্ষ্য করা যেত। এক সময়ে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের অংশ আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গ্রীসদেশীয় দর্শন গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। উমিয়াদ এবং আব্বাসিদ খলিফারা খ্রিস্টান বইগুলোর অনুবাদ করাতেন। আল মামুদ বাগদাদের

গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রটির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার আমলে এখানে বাস করে পণ্ডিতেরা সুসংগঠিতভাবে অনুবাদের কাজ করতেন। অনুবাদের মাধ্যমে আরবি পণ্ডিতদের কাছে অ্যারিস্টটলের জ্ঞান ভান্ডার, ইউক্লিড ও টলেমির সৃষ্টিকর্ম তুলে ধরা হয়। একই সময়ে ভারতবর্ষের জ্যোতিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্ত্র আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এ সমস্ত জ্ঞানভান্ডার, ইউরোপে পৌঁছে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি ইউরোপীদের উৎসাহিত করে তোলে।

ইসলামীয় বৌদ্ধিক জগতে নতুন বিষয়গুলোর পাঠ গভীর অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলবার পাশাপাশি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মোতাজিলা গোষ্ঠীর মত ধর্মতাত্ত্বিকেরা ইসলামীয় বিশ্বাসগুলোকে সমর্থন করবার জন্য গ্রীসদেশীয় দর্শন ও যুক্তির পথ ব্যবহার করত। দার্শনিকেরা নানা প্রশ্নের অবতারণা করে তার উত্তর খুঁজে বেড়াত। ইবন লিনা নামে একজন চিকিৎসক ও দার্শনিক শেষ বিচারের দিনে দেহের পুনরুত্থানের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্মতাত্ত্বিকেরা তার প্রবল বিরোধিতা করেন। ইবন সিনার চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলো বহুলভাবে পাঠ করা হত।

কার্যক্রম - ৩
আলোচিত এই বিষয়টি আজকের যুগোপযোগী বলে কি তুমি মনে কর?

একজন আদর্শ ছাত্র

দ্বাদশ শতাব্দীর বাগদাদের একজন আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ তার আদর্শ ছাত্রের উদ্দেশ্যে বলেন—

"I Commend you not to learn your sciences from books unaided, even though you may trust your ability to understand. Resort to teachers for each science you seek to acquire; and should your teacher be limited in his knowledge take all that he can offer, until you find another more accomplished than he. You must venerate and respect him. When you read a book, make every effort to learn it by heart and master its meaning. Imagine the book to have disappeared and that you can dispense with it, unaffected by its loss. One should read histories, study biographies and the experiences of nations. By doing this, it will be as though, in his short life space, he lived contemporaneously with peoples of the past, was on intimate terms with them, and knew the good and bad among them. You should model your conduct on that of the early Muslims. Therefore, read the biography of the Prophet and follow in his footsteps. You should frequently distrust your nature, rather than have a good opinion of it, submitting your thoughts to men of learning and their works, proceeding with caution and avoiding haste. He who has not endured the stress of study will not taste the joy of knowledge. When you have finished your study and reflection, occupy your tongue with the mention of God's name, and sign His praises. Do not complain it the world turns its back on you. Know that learning leaves a trail and a scent proclaiming its possessor; a ray of light and brightness shining on him, pointing him out."

al-Qanum fil Tibb বলে তার দশলক্ষ শব্দ সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপিতে সে সময়ে প্রচলিত ৭৬০ টি ওষুধের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি নিজের হাতে হাসপাতাল গুলোতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, সেগুলোর ও বর্ণনা রয়েছে। খাদ্য ও পথ্যের গুনাগুণ, স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব, কিছু ছোঁয়াচে রোগের বিবরণ ইত্যাদিও তার লিখার মধ্যে পাওয়া যায়। এটি ইউরোপে পাঠ্য বই হিসেবে প্রচলিত ছিল ও এখানে লেখকের পরিচিতি ছিল Avicenna বলে। বিজ্ঞানী ও কবি ওমর খৈয়াম তার মৃত্যুর ঠিক আগে এই বইটি পড়েছিলেন বলে মনে করা হয়। দর্শনশাস্ত্র অধ্যায়ের দুটি পাতার মধ্যে সদ্য ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়।

ভাষাজ্ঞান ও সৃজনশীল চিন্তা ক্ষমতা মধ্যযুগীয় ইসলামীয় সমাজে যে কোনও ব্যক্তির সবচাইতে উল্লেখযোগ্য গুণ বলে পরিগণিত হত। এই গুণগুলোর অবস্থান যে কোনও ব্যক্তিকে আদাবের স্তরে উন্নীত করত। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিশীলন বোঝাতে আদাব শব্দটি ব্যবহৃত হত। বিশেষ উপলক্ষ্যে স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করবার উপযুক্ত গদ্য ও পদ্যের প্রকাশভঙ্গী ছিল আদাবের বিশেষত্ব। প্রাক ইসলাম পর্বের সবচাইতে জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের নাম Ode. এগুলোতে আব্বাসিদ যুগের কবিরা তাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের গুণকীর্তন করেছেন। আরবদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ (প্রত্যাহ্বান) জানিয়ে পারসীক কবিরা আরবি কাব্যসম্ভারকে পুনঃ রুজীবিত ও পুনর্জীবিত করেন। পার্সি কবি আবু নওয়াজ আনন্দ উপভোগ করার জন্য, সুরা ও মানবীয় প্রেমের মত ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয়কে উপজীব্য করে কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যগুলো এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। আবু নওয়াজের পরবর্তী কবিরা তাদের পছন্দের বিষয়কে, স্ত্রীজাতীয় হলেও, পুরুষজ্ঞানে তুলে ধরেছেন। এই ধারা অনুসরণ করে সুফিরা সুরা ও ঐশ্বরিক ভালোবাসার থেকে সৃষ্ট মাদকতাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

আরবেরা ইরাণ অধিকার করবার কালে প্রাচীন ইরানে ধর্ম পুস্তকগুলোতে ব্যবহৃত পহলবী ভাষার প্রচলন কমে আসছিল বলে পরিচিত প্রচুর আরবি শব্দ সম্বলিত পহেলবী ভাষা দ্রুত প্রসার লাভ করে। খুরাসান এবং ট্রানসস্কিয়ানাতে সুলতানী শাসন প্রবর্তন এই নব্য পার্সীয়কে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। সামানিদ সভাকবি রুদাকীকে নব্য পার্সী ভাষার জনক বলা হত। গীতধর্মী কবিতা ও চতুষ্পদী কবিতা ছিল এই বাষার অন্তর্গত। রুবায়েতের প্রথম দুই ছত্রে কবিতার পটভূমি রচনা, তৃতীয় ছত্রে কবিতার আবেগ এবং চতুর্থ ছত্রে মূল ভাব পরিস্ফুট হয়। পরিধির তুলনায় তার ব্যঞ্জনা বহুধাবিস্তৃত। প্রিয়জনের রূপবর্ণনা, পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা অথবা দার্শনিকের ভাবনা প্রকাশ করার জন্য এই কবিতা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সময়ে বুখারা, সমরখন্দ এবং ইস্পাহানে বাস করা জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়াম দ্বারা রুবাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

একাদশ শতকে গজনী পারসিক সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। রাজসভার চাকচিক্য স্বাভাবিক ভাবেই কবিদের আকর্ষণ করে। নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য শাসকেরাও মহাকাব্যিক পদ রচয়িতাদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কবিদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফিরদৌস (১০২০) ইনি ৫০,০০০ দুই লাইনের শ্লোক সম্বলিত শাহনামা গ্রন্থটি রচনা করেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলোর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল 'রুস্তাম'। সৃষ্টির সময় থেকে আরবের অধিকারভুক্ত হবার সময় পর্যন্ত ইরানের কাহিনী কাব্যের আকারে সাহনামাতে চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তীতে গজনীর ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

পার্সি ভাষা ভারতবর্ষে শাসন ও সংস্কৃতির ভাষা বলে পরিগণিত হয়।

ইবন নাদিম নামে বাগদাদের এক পুস্তক ব্যবসায়ীর পুস্তক তালিকাতে পাঠকদের নৈতিক শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য লিখিত অসংখ্য গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে সবচাইতে পুরনো হচ্ছে কালিলা ওয়া দিমনা নির্মাণ করেছিলেন। শিকার ও বিনোদনের সময় এই বিলাসবহুল বাসস্থানগুলো ব্যবহার করা হত। রোমান ও সেসেনিয়ান নামে একটি পশুর উপাখ্যান। এই বইটি পঞ্চতন্ত্রের পহেলবী সংস্করণের আরবি অনুবাদ। সবচাইতে বেশী প্রচলিত সাহিত্যকর্মগুলো ছিল আলেকজান্ডার ও সিন্দাবাদের মত বীরদের অভিযান কাহিনী বা qays (মজনু) এর মত দুঃখী প্রেমিকদের কাহনী। এগুলো ছিল শতাব্দী প্রাচীন মৌখিক বা লিখিত পরম্পরা। তার স্বামীর কাছে শাহরজাদের রাতের পর রাত ধরে বর্ণনা করা কাহিনীগুলো সহস্র এক আরব্য রজনী বলে অন্যত্র সংকলিত হয়। মূলতঃ ইন্দো পারসিক এই সংকলনটি অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে আরবি ভাষায় সংকলিত হয়। পরবর্তীতে মামলুক যুগে কায়রোতে আরও কিছু আখ্যান যোগ করা হয়। এই আখ্যানগুলোতে চিত্রিত বিভিন্ন ধরেনর লোকচরিত্র— উদার, মূর্খ, সহজ ও ধূর্ত, একইসঙ্গে শিক্ষা ও বিনোদনের উপাদান। বসেরার জাহিজ তার কিতাব আল বুখালাতে কৃপণদের সম্বন্ধে মজাদার ঘটনাবলী সংকলিত করে লোভের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেছেন।

ত্রয়োদশ শতকের আরবি পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত চিত্র।

নবম শতাব্দী থেকে জীবনী, নীতিশাস্ত্রের নিয়মাবলী, রাজপুত্রদের জন্য রাজ্য পরিচালনার নিয়মাবলী, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি আদাবের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকে। শিক্ষিত মুসলমান সমাজে ইতিহাস রচনার পরম্পরা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস বই পণ্ডিতেরা বা ছাত্রেরা ছাড়াও বৃহত্তর শিক্ষিত জনসাধারণও পাঠ করতেন। শাসক ও আমলাদের কাছে ইতিহাস রাজ্য শাসন প্রথা, রাজবংশের গৌরব ও কৃতিত্বের কথা তুলে ধরত। বালাধুরীর আনসার-আল আশবাক ও তাবারির তারিক-আল-রসুল ওয়াল মুলুক নামক দুটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে ইসলামীয় যুগকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। খলিফা তন্ত্রের পতনের সঙ্গে স্থানীয় ইতিহাস রচনার ধারা শুরু হয়। ইসলাম জগতে বৈচিত্র ও ঐক্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করবার জন্য পার্সি ভাষায় রাজবংশের, নগরের ও অঞ্চল বিশেষের ইতিহাস রচনা করা হয়। আদাবের একটি বিশেষ দিক ছিল ভূগোল এবং ভ্রমণলিপি rihla। এরমধ্যে ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের মন্তব্য সহ গ্রীস, ইরান ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় তথ্য থাকত। গাণিতিক ভূগোল অনুযায়ী আমাদের আবাসযোগ্য ভূমি, অক্ষরেখার সমান্তরালে তিনটি মহাদেশের সদৃশ সাতটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নগরীর অবস্থান জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী স্থির করা হয়েছে। Mury Dhakab এ ভূগোল ও ইতিহাসের

সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সমস্ত পৃথিবীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের চিত্র আঁকা হয়েছে। একাদশ শতকের মুসলমান লেখক আল বিরুণী তার Jahqiq malil hind এ মুসলমান জগতের গন্ডি অতিক্রম করে অন্যান্য সংস্কৃতির মূল্যায়ণ করেছেন।

দশম শতক নাগাদ পর্যটকদের চোখের সামনে মুসলমান জগতের চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ধর্মীয় হর্ম্যগুলো ছিল সেই জগতের বাহ্যিক রূপ। স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মসজিদ, দেবালয় ও সমাধিগুলোর নির্মাণশৈলী ছিল একই রকম। খিলান, গম্বুজ, স্তম্ভ ও উন্মুক্ত উদ্যান শোভিত এই হর্ম্যগুলোর মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় ও বাস্তব চাহিদার কথা প্রকাশিত হত।

অষ্টম শতকে প্যালেস্টাইনের প্রাসাদের মেঝে।

প্রথম ইসলামীয় শতাব্দীতে মসজিদের একটি বিশেষ গঠনশৈলী নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অঞ্চল বিশেষে এর কিছুটা পরিবর্তন দেখা যেত। প্রত্যেকটি মসজিদে একটি পুকুর বা ফোয়ারা সহ উন্মুক্ত উদ্যানের পর একটি বিশাল কক্ষ থাকত। সেই কক্ষে সারিবদ্ধভাবে উপাসকেরা এবং একজন প্রার্থনা পরিচালক (ইমাম) দাঁড়াতে পারতেন। এছাড়াও এই কক্ষের দুটো বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন মক্কার দিক নির্দেশ করে দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গি এবং শুক্রবার দুপুরের প্রার্থনা চলাকালীন উপদেশ পাঠ করে শোনাবার জন্য একটি মঞ্চের অবস্থান। মসজিদ সংলগ্ন একটি স্তম্ভ নতুন ধর্মমতের চিহ্ন বহন করত এবং এখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানানো হত। পাঁচবেলা প্রার্থনা ও সাপ্তাহিক প্রার্থনার দ্বারা শহর ও গ্রামে সময় চিহ্নিতকরণ করা হত। অঙ্গনের চারদিক ঘিরে ইমারৎ গড়ে তুলবার ধারাটি হাসপাতাল ও প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ও অনুসরণ করা হত। উমিয়াদরা প্যালেস্টাইনের Khirbatal Mafjas এবং জর্ডনের Qusays Amra এর মত কিছু সংখ্যক মরুপ্রাসাদ রীতিতে তৈরী এই প্রাসাদগুলো অপর্যাপ্ত ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সজ্জিত ছিল। আব্বাসিদরা সামরিতে উদ্যান ও জলরাশির মধ্যে একটি নতুন রাজকীয় নগর নির্মাণ করেছিলেন। হারুণ-আল-রশিদকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে এই নগরটির বর্ণনা আছে।

চতুর্দশ শতকে সিরিয়াতে প্রাপ্ত বাতিদান ইসলামীয় কারুশিল্পীদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করছে।

মুসলমানদের ধর্মীয় শিল্পে কোন জীবন্ত প্রাণীর স্থান না থাকায় এখানে নতুন দুটি ধারার বিকাশ হয়— হস্তলিপি বিদ্যা ও জ্যামিতিক এবং উদ্ভিজ্জ নক্সা। হর্ম্যগুলোকে সজ্জিত করবার জন্য নানা ধরনের ধর্মীয় উক্তি লিপিবদ্ধ করা হত। অষ্টম ও নবম শতাব্দীর কোরাণের পাণ্ডুলিপিতে হস্তলিপি শিল্প সংরক্ষিত হয়েছে। Kitalal Aghani, Kalia na Dima,

'God is the Light (nur) of the heavens and the earth His light is like a niche (mishkat) with a lamp (misbah) The lamp is in a glass which looks as if it were a glittering star Kindled from a blessed olive (zaitun) tree that is neither eastern nor western Whose oil ould always shine even if no fire (nar) touched it' (Quran, chapter 24, verse 35).

Maganat এর মত বইগুলোতে নানা রকম চিত্র অঙ্গন করা হয়েছে। এছাড়াও বইগুলো বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উজ্জ্বলতর করা হত। অট্টালিকা ও বই দুয়েতেই গাছপালা, ফুল ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়েছে।

মধ্য ইসলামীয় ভূমির ইতিহাস মানব সভ্যতার তিনটি দিক নির্দেশ করে— ধর্ম, সম্প্রদায় ও রাজনীতি। এই তিনটি দিক তিনটি বৃত্তের আকারে এসে সপ্তম শতাব্দী এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীতে বৃত্তগুলো আলাদা হয়ে যায়। আমাদের পঠিত সময়ের শেষে রাষ্ট্র ও সরকারের উপর ইসলামের প্রভাব ছিল অতি ক্ষীণ। রাজনীতিতে বহু জিনিস যুক্ত হয় যার কোনও ধর্মীয় অনুমোদন নেই। এক্ষেত্রে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বৃত্ত এক জায়গায় মিলে যায়। সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় ব্যক্তিগত এবং প্রথাগত ব্যাপারে শরিয়ত বিধি মেনে চলত। শাসন ব্যাপারে শরিয়তের কোনও ভূমিকা না থাকলেও ধর্মীয় ব্যাপারে এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। একমাত্র প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল। দার্শনিক এবং সুফিরা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা। তারা সুশীল সমাজের স্বশাসন ও আচার আচরণের উর্দ্ধে ধর্ম বিশ্বাসকে স্থান দিয়েছেন।

কার্যক্রম - ৪
এই পরিচ্ছেদে কোন চিত্রটি, কেন তোমার সবচাইতে ভাল মনে হয়েছে?

৫৯৫	খাদিজা নাম্নী একজন মক্কাবাসী বিত্তশালী মহিলাকে মহম্মদ বিবাহ করেন। খাদিজা পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মকে সমর্থন করেন।
৬১০-৬১২	মহম্মদের প্রথম বক্তৃতা, ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য প্রচার (৬১২-৬২১) মদিনাবাসী ধর্মান্তরিতদের সঙ্গে আকাবাতে প্রথম বোঝাপড়া।
৬২২	মক্কা থেকে মদিনাতে গমন। আরব জনগোষ্ঠী কর্তৃক মক্কা ত্যাগীদের আশ্রয় দান।
৬৩২-৬১	প্রথম খলিফাতন্ত্র, সিরিয়া, ইরাক ইরান ও মিশর বিজয়, গৃহযুদ্ধ।
৬৬১-৭৫০	উমিয়াদ শাসন, দামাস্কাস রাজধানীতে পরিণত।
৭৫০-৯৪৫	আব্বাসিদ শাসন, বাগদাদ রাজধানীতে পরিণত।
৯৪৫	বায়াদরা বাগদাদ অধিকার করে, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসার।
১০৬৩-৯২	ক্ষমতাসম্পন্ন সলজুক ওয়াজীর নিজামুল মুলকের শাসন। তিনি Nizamiyya নামে মাদ্রাসার বিস্তার করেন। তাকে হত্যা করেন Hashi Shayn।
১০৯৫-১২৯১	ধর্মযুদ্ধ, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যোগাযোগ।
১১১১	যুক্তিবাদের বিরোধিতাকারী প্রভাবশালী ইরানী পণ্ডিত Hashi Shayn-এর মৃত্যু।
১২৫৮	মোঙ্গলরা বাগদাদ অধিকার করে।

অনুশীলনী ঃ

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—

১) সপ্তম শতকের প্রথমভাগে বেদুইনদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য কি ছিল?
২) আব্বাসিদ বিদ্রোহ বলতে কি বোঝ?
৩) আরবীয়, ইরানী ও তুর্কীদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলোর বহুজাতিক চরিত্রের উদাহরণ দাও।
৪) ইউরোপ ও এশিয়াতে ধর্মযুদ্ধগুলোর ফলাফল কি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ ঃ-

৫) রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইসলামীয় সাম্রাজ্যের স্থাপত্যের পার্থক্য কি ছিল?
৬) যাত্রাপথের নগরীগুলোর নাম উল্লেখ করে সমরখন্দ থেকে দামাস্কাস যাত্রার বিবরণ দাও।

প্রসঙ্গ ৫

যাযাবর সাম্রাজ্য

যাযাবর সাম্রাজ্য শব্দটি প্রথম অবস্থায় পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। যাযাবরেরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও তাদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো থাকে অপরিবর্তিত। ন্যূনতম রাজনৈতিক সংগঠনও তারা গঠন করে থাকে। অন্যদিকে সাম্রাজ্য শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি স্থায়ী স্থানগত অবস্থান, জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা স্থায়িত্ব এবং একটি বিশদ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত বিস্তৃত ক্ষেত্র। তবে আমরা যখন যাযাবর গোষ্ঠীদের দ্বারা গড়ে তোলা কয়েকটি সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করি তখন উপরের দুটি সংজ্ঞার মধ্যেকার দূরত্ব অনেকটাই ঘুচে যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা মধ্য ইসলামীয় অঞ্চলে রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আরব উপমহাদেশের যাযাবর পরম্পরা ছিল এসমস্ত রাষ্ট্রের ভিত্তি। এ অধ্যায়ে আমরা মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল নামক যাযাবর গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করব। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। চীনদেশের কৃষিভিত্তিক সাম্রাজ্যের তুলনায় প্রতিবেশী মঙ্গোলিয়ার যাযাবররা একটি অতিথি সাধারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মধ্য এশিয়ার যাযাবর সমাজগুলো শুধুমাত্র ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত দুর্ভেদ্য ছিল না। এই সমাজগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং বৃহত্তর জগতের সঙ্গেও ছিল তাদের বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক। পরম্পরাগত সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রথাগুলোকে পরিবর্তিত করে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা যে একটি প্রতাপশালী সামরিক শক্তি ও পরিশীলিত শাসন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল এ অধ্যায়ে তা আলোচিত হবে। নানা জাতি, প্রথা, অর্থনৈতিক অবস্থা অধ্যুষিত অঞ্চলে সফল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য মঙ্গোলদের অনেক ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম বা প্রথার সঙ্গে আপোস করতে অথবা নতুন প্রথার প্রবর্তন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা যে যাযাবর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল ইউরেশিয়ার ইতিহাসে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে ও অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ গঠন ও সমাজচরিত্রও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সমতলবাসী এই জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেনি। সুতরাং যাযাবর সমাজ সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের নগরকেন্দ্রিক লেখকদের দ্বারা প্রস্তুত নথি, ভ্রমণলিপি ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। এধরনের লেখকদের রচনা অনেক সময় ছিল অজ্ঞানতাপ্রসূত ও পক্ষপাতদুষ্ট। তবে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্যবাদী সাফল্য অনেক লেখকদের আকর্ষণ করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ভ্রমণলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। অনেকে মোঙ্গলদের অধীনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন পটভূমি থেকে উঠে এসেছিলেন যেমন— বৌদ্ধ,

কনফুসিয়াস, খ্রিস্টান, তুর্কী এবং মুসলমান। মোঙ্গল রীতিনীতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলেও তাদের মধ্যে অনেকেরই রচনা ছিল মোঙ্গলদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বা প্রশংসাব্যঞ্জক। তার ফলে মোঙ্গলদের প্রতি নগরবাসীদের যে বিরূপ ও অবজ্ঞার মনোভাব ছিল তার পরিবর্তন হয়। সুস্থির সমাজ যে মোঙ্গলদের আদি ম বর্ব্বর বলে উল্লেখ করত তার কারণ হয়ে উঠে মোঙ্গলদের ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার শাসকেরা মধ্য এশিয়াতে তাদের আধিপত্য কায়েম করে। সম্ভবতঃ রাশিয়ার পণ্ডিতেরাই মোঙ্গলদের সম্বন্ধে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। একটি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ভ্রমণার্থী, সৈন্য, বণিক ও প্রাচীনতত্ত্বের গবেষকরা এ নিরীক্ষাপত্রগুলো প্রস্তুত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ অঞ্চলে সোভিয়েত গণরাজ্য বিস্তার লাভ করবার পর একটি নতুন মার্ক্সবাদী ইতিহাস রচিত হয়। এই নতুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রচলিত উৎপাদন প্রথাই সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র নিরূপণ করে। ইতিহাসের এই ধারা অনুযায়ী জনজাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন যে ধারা, চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গল সাম্রাজ্য তারই অঙ্গ। পরিবর্তন দেখা যায় সামাজিক ক্ষেত্রেও যেখানে শ্রেণিহীন সমাজ থেকে প্রভু, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান যুক্ত সমাজ গড়ে উঠে। ইতিহাসের বিশেষ ধারা অনুসরণ করা ছাড়াও Boris Yakovlevich Viadimirstov এর মত পণ্ডিত, মোঙ্গলদের ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। এছাড়া সিলি ভ্লাদিমিরওভিক বারটল্ডের মত পণ্ডিতেরা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করেননি। যে সময়ে স্টালিন সরকার আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিল, তখন বারটল্ড চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীদের আমলে মোঙ্গলদের কার্যকলাপের সহানুভূতিপূর্ণ, সদর্থক বিশ্লেষণ করেছেন। এরজন্য লেখকে নানা ধরনের বিধি নিষেধের মুখোমুখি হতে হয়। সে সময় রচনাটির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬০ এর দশকে ক্রুশ্চেভ যুগে বা তার পরে বারটল্ডের রচনা নয়টি পর্বে প্রকাশিত হয়।

মোঙ্গল সাম্রাজ্য একাধিক মহাদেশে বিস্তৃত থাকবার ফলে এই সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে আসে সেগুলো বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, চীনা, মঙ্গোলীয়, পার্সি ও আরবী ভাষায় লিখিত তথ্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও ইটালীয়, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় লিখিত সূত্রগুলোও যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ। আবার অনেক সময় দুটি ভাষায় লিখিত একই প্রসঙ্গে তথ্যের অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন চেঙ্গিস খানের জীবনের প্রথম দিককার বিবরণ (The secret history of the Mongols) মঙ্গোলীয় ও চীনা ভাষায় আনূদিত হয়েছে। এই দুটি অনুবাদেই নানা ধরনের তথ্যভিত্তিক অসঙ্গতি পাওয়া যায়।

একই অভিজ্ঞতা হয় মঙ্গোলীয় রাজসভায় মার্কপোলোর আগমন সংক্রান্ত ইটালীয় ও ল্যাটিন বিবরণ পাঠ করে। মোঙ্গলদের নিজেদের লিখিত সাহিত্য খুব কম ছিল। বিদেশী লেখকেরা মোঙ্গলদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভাষাগত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। লেখক Igor De Rachewiltz এর The secret His-

*The term 'barbarian' is derived from the Greek *barbaros* which meant a non-Greek, someone whose language sounded like a random noise: 'barbar'. In Greek texts, barbarians were depicted like children, unable to speak or reason properly, cowardly, effeminate, luxurious, cruel, slothful, greedy and politically unable to govern themselves. The sterotype passed to the Romans who used the term for the Germanic tribes, the Gauls and the Huns. The Chinese had different terms for the steppe barbarians but none of them carried a positive meaning.

tory of the Mongols এর Gerhard Doerfer এর পালিভাষাতে মোঙ্গল ও তুর্কী পরিভাষার অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই দুটি রচনাতেই যাযাবরদের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা স্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়টি পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখব যে চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গলদের যথেষ্ট অবদান ও কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ভূমিকা ঃ

মধ্য এশিয় সমভূমিতে চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা একতাবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলো এই নতুন শক্তির উত্থানে শংকিত হয়ে উঠে। চেঙ্গিস খান শুধুমাত্র মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদেরই একতাবদ্ধ করতে চাননি। তার বিশ্বাস ছিল যে তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত। মোঙ্গলদের সংঘবদ্ধ করে ও উত্তরচীন, ট্রানসাক্সনিয়া, আফগানিস্থান, পূর্ব ইরান ও রাশিয়ার সমভূমিতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে চেঙ্গিস খানের সমস্ত জীবন কেটে যায়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করে তার উত্তরাধিকারীরা চেঙ্গিস খানের স্বপ্ন পূরণ করেন।

মানচিত্র ১
মোঙ্গল সাম্রাজ্য

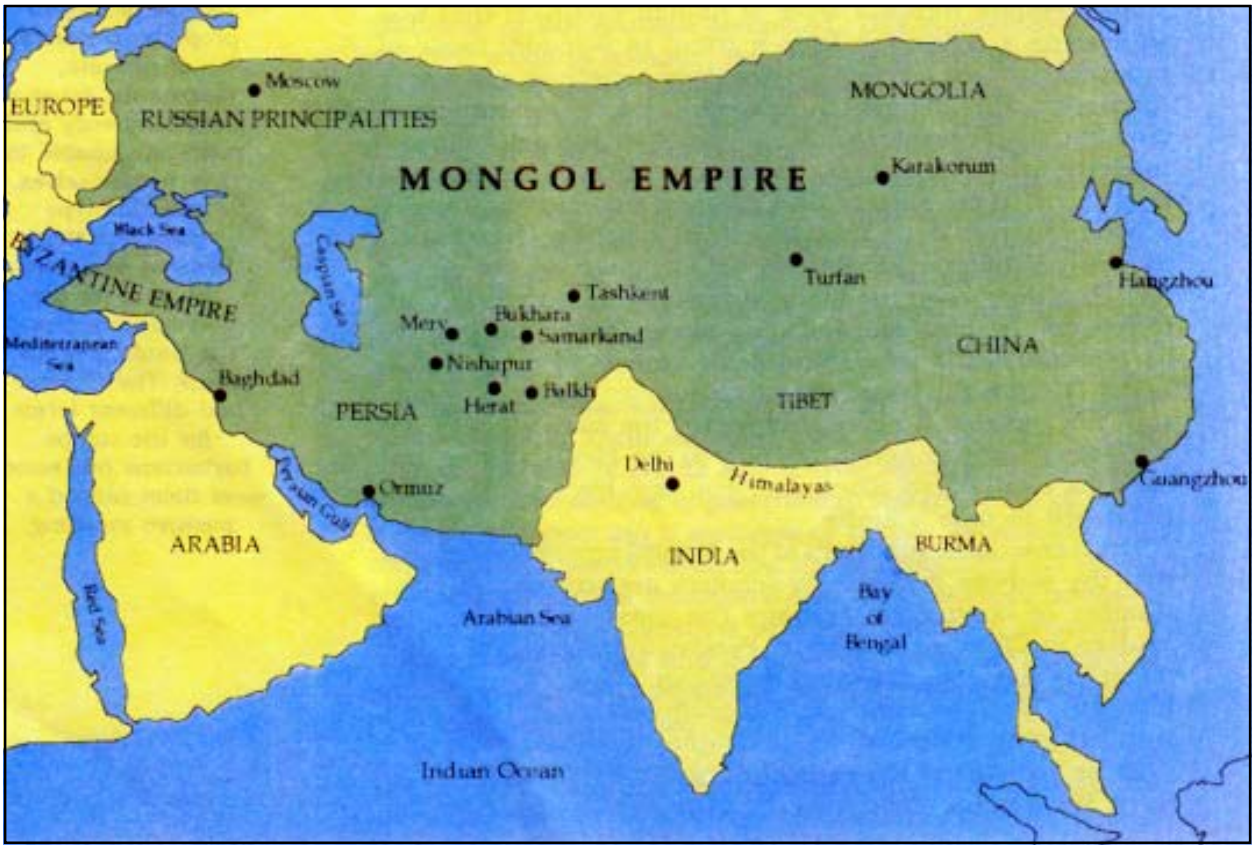

চেঙ্গিস খানের আদর্শ অনুসরণ করে তার পৌত্র মঙ্কে ফরাসী রাজা নবম লুইকে সতর্ক করে বলেছিলেন "স্বর্গের শাশ্বত আকাশের মতন মর্ত্ত্যের একমাত্র প্রভু হলেন স্বর্গের পুত্র চেঙ্গিস খান.....।" স্বর্গীয় শক্তির মহিমায় যখন সমগ্র পৃথিবী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শান্তিতে ও আনন্দে থাকবে, তখনই আমরা কি করতে যাচ্ছি তা স্পষ্ট হবে; 'আমাদের দেশ বহুদূর, আমাদের পাহাড়গুলো সুদৃঢ়, আমাদের বিশাল সমুদ্র' বলে যদি তোমরা সেই ঐশ্বরীক আদেশ অগ্রাহ্য কর এবং এই বিশ্বাস থেকে আামাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, সে ক্ষেত্রে আমরা জানি, আমরা কী করতে পারি। কে কঠিনকে সহজ করেছে এবং দূরকে নিকট করেছে তা শাশ্বত স্বর্গের অজানা নয়।" এ ধরনের ভীতি প্রদর্শন একেবারে অমূলক ছিল না। ১২৩৬ থেকে ১২৪১ পর্যন্ত চেঙ্গিস খানের অপর পৌত্র বাটু মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত রাশিয়ার অংশ ধ্বংস করেন, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরী অধিকার করে ভিয়েনার বাইরে স্থিত হন। ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে, চীন দেশের বহু অংশ, মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপ মোঙ্গল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং এ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সত্য অর্থেই 'ঈশ্বরের ক্রোধের' মুখোমুখি হয়।

মোঙ্গলদের কৃতিত্বের তুলনায় অপর বিশ্বজয়ী বীর আলেকজান্ডারের কৃতিত্বকেও খাটো বলে মনে হয়। প্রশ্ন জাগে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগেও কেমন করে মঙ্গোলরা এই বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করে এখানে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল? কেমন করে বিশাল সাম্রাজ্যে বসবাসকারীদের ভিন্ন সামাজিক এবং ধর্মীয় সত্বার মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল? চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গলদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে আমরা কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করব।

বুখারা বিজয়

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের একজন পারসাক ঐতিহাসিক জুয়ানী ইরাণের মোঙ্গল শাসকদের সম্বন্ধে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তার বিবরণে আমরা পাই ১২২০ এ মোঙ্গলদের বুখারা বিজয়ের চিত্র। জুয়ানী বলেছেন, নগরীটি অধিকার করবার পর চেঙ্গিস খান উৎসব প্রাঙ্গণে যান। সেখানে সম্পন্ন নাগরিকদের উপস্থিতিতে তিনি বলেন 'O people know that you have committed great sins. If you ask me what proof I have for these words, I say it is because I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would no have sent a punishment like me upon you;

বুখারা বিজয়ের পর সেখানকার একজন নাগরিক বুখারা থেকে পালিয়ে সমরখন্দে উপস্থিত হন। বুখারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'They came they [mined the walls], they burnt, they slew departed'.

মোঙ্গল বলতে কাদের বোঝায়? তারা কোথায় বাস করত? কাদের সঙ্গে মোঙ্গলদের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল এবং কেমন করে আমরা তাদের সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে জানতে পারি?

কার্যক্রম ১

ধরে নেওয়া যাক জুয়ানীর বুখারো অধিকার করার বিবরণটি সঠিক। তুমি যদি বুখারা ও খোরাসানের একজন নাগরিক হিসেবে সেই বক্তৃতাগুলো শুনতে তবে তা তোমার উপর কী প্রভাব সৃষ্টি করত?

সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

পূর্বদিকে তাতার, খিতান এবং মাঞ্চু এবং পশ্চিমে তুর্কী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাষাগত সাদৃশ্য থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে মোঙ্গল বলে আভিহিত করা হয়। কিছু সংখ্যক মোঙ্গল ছিল পশুপালক, অন্যেরা ছিল শিকারের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহকারী। পশুপালকেরা ঘোড়া, ভেড়া এবং অল্প সংখ্যায় গরু-মহিষ, ছাগল ও উট পালন করত। মধ্য এশিয় অঞ্চলে রাষ্ট্রের সমভূমি ছিল মোঙ্গলদের বিচরণক্ষেত্র। দিগন্তবিস্তৃত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল পশ্চিমে তুষারমণ্ডিত আলাই পাহাড় বেষ্টিত ঢেউখেলানো তৃণভূমি, দক্ষিণে শুষ্ক গোবি মরুভূমি। আবার উত্তর ও পশ্চিমে অসংখ্য বরফ গলা জলের ঝরণা ও ওনন ও সালেঙ্গা নদী বিধৌত উপত্যকা। ঋতু বিশেষে তৃণভূমি পশুচারণের উপযুক্ত হয়ে উঠত ও শিকারের উপযুক্ত পশুও পাওয়া যেত। সাইবেরিয়ার জঙ্গলে চারণভূমির উত্তরদিকে খাদ্য সংগ্রাহকেরা বাস করত। গ্রীষ্মকালে শিকার করা পশুর চামড়া ও লোমের ব্যবসা ছিল তাদের জীবিকা। বছরের অল্প কিছুটা সময় চারণভূমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হলেও মোঙ্গলরা এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না। পশুপালন বা পশু শিকারের মাধ্যমে যে রোজগার হত তার সাহায্যে এ অঞ্চলের ঘনবদ্ধ জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব ছিল না। তার ফলে এখানে কোন বড় নগর গড়ে উঠেনি। মোঙ্গলরা অস্থায়ী তাবুতে বাস করত এবং তাদের পালিত পশুর দলকে নিয়ে তারা শীতকালীন চারণভূমি থেকে গ্রীষ্মকালীন চারণভূমির দিকে যাত্রা করত।

মোঙ্গলরা জাতিগত ও ভাষাগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এবং তাদের সমাজ ছিল

বন্যার সময় ওনন নদীর অববাহিকা

পিতৃতান্ত্রিক। আয়তনে বড় পরিবারগুলোতে পালিত পশুর সংখ্যা ছিল বেশী এবং তাদের মালিকানাধীন চারণভূমির পরিমাণও ছিল অধিক। যথেষ্ট সংখ্যক অনুগামী থাকায় স্থানীয় রাজনীতিতেও তাদের প্রভাব ছিল বেশী। সময় বিশেষে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা দুর্ভিক্ষের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যেত, তৃণভূমি শুকিয়ে যেত ও শিকারের উপযুক্ত পশুরও অভাব দেখা দিত। সে রকম পরিস্থিতিতে পশুখাদ্যের সন্ধানে তৃণভূমি দখল বা খাদ্যের সন্ধানে অভিযানকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব দেখা দিত। ঐ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য অথবা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করবার জন্য কিছু সংখ্যক পরিবার দলবদ্ধভাবে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করত। কিন্তু সাধারণতঃ এ ধরনের গোষ্ঠী দীর্ঘস্থায়ী হত না। মোঙ্গল এবং তুর্কী জাতিগুলোকে নিয়ে চেঙ্গিস খান বিশাল গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। এর সঙ্গে একমাত্র পঞ্চম শতকে অ্যাটিলার (৪৫৩) গঠিত গোষ্ঠীর তুলনা করা যেতে পারে।

অ্যাটিলার সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে যে চেঙ্গিস খানের তৈরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশী দৃঢ় এবং সংগঠকের মৃত্যুর পরেও এই ব্যবস্থা টিকে ছিল। এই শাসন চীন, ইরান ও পূর্ব ইউরোপের উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করতে সমর্থ ছিল। এ সমস্ত অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মোঙ্গলরা নগরকেন্দ্রীক বাসভূমি ও জটিল অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছে। যদিও তাদের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় এ ধরনের সুস্থির সমাজের ধারণা ছিল না।

যাযাবর এবং কৃষিজ অর্থনীতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র ভিন্ন ধরনের হলেও দুটি সমাজ পরস্পরের অজানা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সমতল তৃণভূমির সীমিত সম্পদ সেখানকার আধিবাসীদের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই মোঙ্গল ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য যাযাবর জাতিগুলো প্রতিবেশী চীনদেশের সুস্থির নাগরিকদের সঙ্গে ব্যবসা বা বিনিময়ে লিপ্ত হত। এরফলে উভয় দলই লাভবান হত; চীন দেশের কৃষিজাত দ্রব্য ও লোহার বাসনের বিনিময়ে ঘোড়া, পশুর লোম ও পশু ইত্যাদি চীনারা আহরণ করত। দু'দলই অধিক লাভ করতে সচেষ্ট থাকায় অনেক সময়ই ব্যবসাতে অশান্তি দেখা দিত। দলবদ্ধ মোঙ্গলেরা চীনাদের উপর বেশী লাভজনক শর্ত আরোপ করতে চেষ্টা করত ও কখনো বা ব্যবসায়িক শর্ত ভুলে তারা লুণ্ঠনে লিপ্ত হত। অন্যদিকে মোঙ্গলদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে চীনারা তাদের শর্ত আরোপ করত। এ ধরনের সীমান্তযুদ্ধ সুস্থির সমাজকে দুর্বলতর করে তুলত। এরফলে কৃষিকাজ ব্যাহত হত, নগরীগুলো হত লুণ্ঠনের শিকার। অন্যদিকে যাযাবরেরা যুদ্ধের অংগন থেকে সামান্য ক্ষতিসহ পশ্চাদ্ধাবন করে আসত। ইতিহাসের সমস্ত যুগেই চীনদেশ যাযাবর অনুপ্রবেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে সমস্ত যুগেই শাসকেরা তাদের প্রজাদের সুরক্ষার জন্য প্রাকার তৈরী করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে এ সমস্ত প্রাকারকে সংযুক্ত করে একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তৈরী করা হয়। উত্তর চীনের কৃষিভিত্তিক সমাজে যাযাবর অভিযানের ফলে যে অশান্তি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার সাক্ষ্য বহন করছে বর্তমানকালের এই চীনের প্রাচীর' Great Wall of China।

তুর্কী ও মোঙ্গলদের কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম নীচে উল্লেখ করা হল। তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন প্রক্রিয়া যেমন এক ছিল না তেমনি তারা কোন একটি বিশেষ অঞ্চল ও অধিকার করেনি। যাযাবর শ্রেণির ইতিহাস তাদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু চীন ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে তাদের প্রভাব সমানভাবে পড়েনি।

সিয়াং নু Hsiung - nu ২০০ খ্রিঃ পূঃ) (তুর্কী)

জুয়ান জুয়ান Juan Juan (৪০০ খ্রিঃ) (মোঙ্গল)

এপ্থালেট হুন Epthalite Huns (৪০০ খ্রিঃ) (মোঙ্গল)

তু - চুয়ে Tu - Chueh (৫৫০ খ্রিঃ) (তুর্কী)

উইগরিস Vighurs (৭৪০ খ্রিঃ) (তুর্কী)

খিতান Khitan (৯৪০ খ্রিঃ) মোঙ্গল

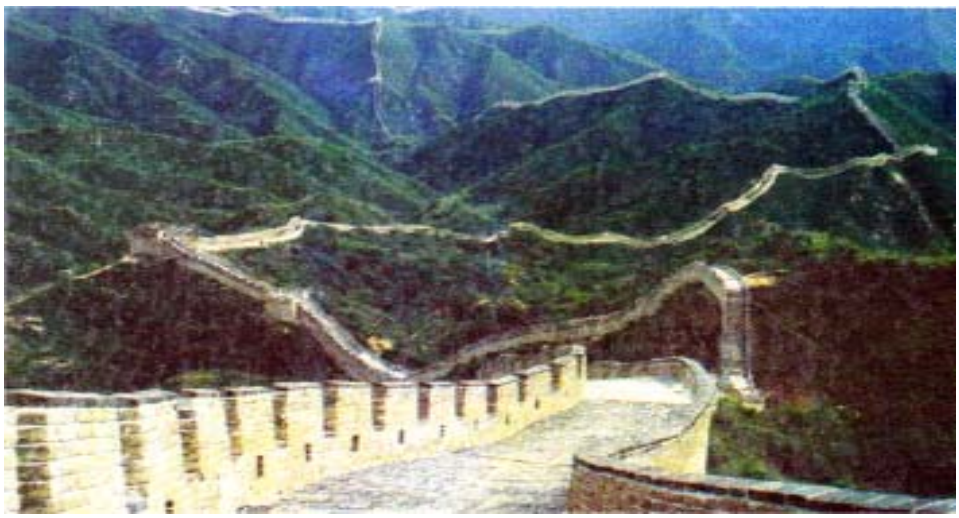

চিত্র চীনের প্রাচীর

চেঙ্গিস খানের জীবন ও কাজ

বর্তমান মঙ্গোলিয়ার উত্তরে ওনন নদীর তীরে ১১৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চেঙ্গিস খানের জন্ম হয়। Kiyat নামে Borjigid গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত একটি পরিবার গোষ্ঠীর নেতা Yesugei এর পুত্রের নম ছিল তেমুজিন। অল্প বয়সে তাদের পিতাকে হত্যা করা হলে তেমুজিন তার ভাই ও সৎভাইদের তার মা Oelun-eke প্রভূত কষ্টের সঙ্গে লালন পালন করেন। পরবর্তী দশ বছর ছিল বিড়ম্বনাময়; তেমুজিনকে বন্দী করে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল, তার বিয়ের পরই তার স্ত্রী Borte কে অপহরণ করা হলে তাকে উদ্ধার করবার জন্য তেমুজিনকে যুদ্ধ করতে হয়। এই কষ্টকর সময়েও তেমুজিন কয়েকজন বন্ধু লাভ করেন। তার প্রথম বন্ধু অল্পবয়সী Boghurchu চিরকাল তেমুজজিন-এর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তেমনই ছিলেন তার জ্ঞাতিভ্রাতা (anda) Jamuqaij তার পিতার জ্ঞাতিভাই Kereyits এর শাসক Tughril/Ong Khan-এর সঙ্গে তেমুজিন পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

পুরনো বন্ধু Jamuqa শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হলে তেমুজিন ১১৮০ এবং ১১৯০ এর দশক জুড়ে Ong Khan এর সাহায্যে তাকে পরাজিত করেন। তাকে পরাজিত করবার পর তেমুজিন অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। তাকে Tatar ও Kereyits দের সঙ্গে এবং ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং Ong Khan এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে Naimen জাতি ও শক্তিশালী Jamuqa কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবার পর তেমুজিন সে অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন। মোঙ্গল নেতাদের সভায় তেমুজিনকে 'Great KHan of the Mongol's (Qaan) স্বীকৃতি দিয়ে Genghis Khan (The Oceanice Khan বা Universal Ruler) উপাধি প্রদান করা হয়।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে qurultai এর পূর্বে চেঙ্গিস খান মোঙ্গলদের একটি কর্মক্ষম, নিয়মানুবর্তী সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। এই শক্তি তার পরবর্তী অভিযানগুলোতে সাফল্য লাভ করতে সাহায্য করেছে। চেঙ্গিস সর্বপ্রথম চীন জয়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। সে সময় চীন তিনটি শাসন ভাগে বিভক্ত ছিল।—তিব্বতী বংশোদ্ভুত Hsi Hsia- রা রাজত্ব করত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, পিকিং থেকে চীন বংশ রাজত্ব করত উত্তর চীনে। দক্ষিণ চীনের উপর আধিপত্য ছিল সাং বংশের। ১২০৯ এর মধ্যে Hsi-Hsia-রা পরাজিত হয়, ১২১৩ তে চীনের প্রাচীরের

অংশ বিশেষ ভেঙ্গে ফেলা হয়, এবং ১২১৫ তে পিকিং লুট করা হয়। পরিতৃপ্ত চেঙ্গিস তার অধস্তনদের হাতে বিজিত অঞ্চলের সামরিক দায়িত্ব অর্পন করে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে তার বাসভূমি মঙ্গোলিয়াতে ফিরে আসেন।

১২১৮ তে চীনের উত্তর পশ্চিমে টিয়েনসান পার্বত্য অঞ্চলের অধিপতি (Qara Khita) র পরাজয়ের পর মোলঙ্গলদের রাজ্য (Amu Darya) এবং ট্রানসাক্সনিয়া ও খুরাজাম প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোঙ্গল দূতদের হত্যা করে খুরাজামের শাসক সুলতান মাহমুদ চেঙ্গিস খানের রোষের স্বীকার হন। ১২১৯ থেকে ১২২১ পর্যন্ত সামরিক অভিযানে ওট্রার, বুখারা, সমরখন্দ, বাল্ক, গুরগঞ্জ, মার্ভ, নিশাপুর ও হিরাট নগর মোঙ্গলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। যে সমস্ত নগর বাধার সৃষ্টি করল সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়। নিশাপুর অবরুদ্ধ করে রাখবার সময় সেখানে একজন মোঙ্গল রাজপুত্রকে হত্যা করা হয়। ক্রুদ্ধ চেঙ্গিস খান ঘোষণা করেন যে কৃষি কাজের উপযোগী করে নিশাপুর শহরকে ধ্বংস করতে হবে; সেখানকার কোন কুকুর বিড়ালও যেন বেঁচে না থাকে।

মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলার বিবরণ

প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, যে সমস্ত নগরী চেঙ্গিস খানের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকার করে, সেখানে অসংখ্য লোককে হত্যা করা হয়। এভাবে নিশাপুরে ১২২০ খ্রিস্টাব্দে ১,৭৪৭,০০০, ১২২২ খ্রিস্টাব্দে হীরাটে ১,৬০০,০০০, এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ৮,০০০,০০০ লোক প্রাণ হারান। তুলামূলকভাবে ছোট শহরগুলো, যেমন নাসা, বাইহাঁক ও টুনে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৮,০০০,৭০,০০০ ও ১২,০০০।

প্রশ্ন উঠতে পারে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকেরা এ সমস্ত তথ্য কোন সূত্র থেকে যোগাড় করলেন? পারসীক লেখক জুয়ানীর বয়ান অনুযায়ী মার্ভে ১,৩০০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়। তিনি বলেছেন প্রতিদিন ১০০,০০০ করে মৃতদেহ গণনা করেও সমস্ত মৃতদেহ গণনা করতে ১৩ দিন লেগেছিল।

সুলতান মাহমুদের পশ্চাদ্ধাবন করে মোঙ্গল বাহিনী আজারবাইজানে প্রবেশ করে। ক্রিমিয়াতে রাশিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করে তারা কাস্পিয়ান সাগর অবরোধ করে। অন্য একটি বাহিনী সুলতানের পুত্র জালাল উদ্দিনকে অনুসরণ করে আফগানিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সিন্দু নদীর তীরে এসে চেঙ্গিসখান উত্তর ভারত ও আসামের ভিতর দিয়ে মঙ্গোলিয়াতে ফিরে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু প্রখর তাপ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং কিছু অশুভ লক্ষণ তার সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য করে।

জীবনের অধিকাংশ সময় সামরিক অভিযানে ব্যয় করে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের মৃত্যু হয়। সমতল তৃণভূমিতে যুদ্ধ করে অভ্যস্ত বাহিনীকে তিনি একটি চূড়ান্ত কর্মক্ষম সামরিক বাহিনীতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি প্রচুর সামরিক অভিযানে জয়ী হন। মোঙ্গল ও তুর্কীদের অশ্বচালনার দক্ষতা করে তোলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এই দক্ষতা সেনাবাহিনীকে গতিময়করে তুলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এই দক্ষতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমভূমিতে অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। তাতে নির্ভর করে তারা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমাট বরফের উপর দিয়ে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অশ্বচালনা করে শত্রুনগরীতে বা শিবিরে পৌঁছে যেত। যাযাবরেরা স্বভাবতই সুদৃঢ় সামরিক শিবিরের মোকাবিলা করতে অদক্ষ ছিল। কিন্তু চেঙ্গিস খান এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন। তার রাজত্বের প্রযুক্তিবিদরা

হালকা ও সহজে চালনাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন এবং এ সমস্ত অস্ত্র শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হত, যার ফল হত বিধ্বংসী।

১১৫৭ খ্রিঃ	তেমুজিনের জন্ম
১১৬০ এর দশক থেকে	
১১৭০ এর দশক পর্যন্ত	দাসত্ব ও কষ্টের যুগ
১১৮০ দশক থেকে	
১১৯০ এর দশক পর্যন্ত	গোষ্ঠীগঠনের যুগ
১২০৩-২৭	বিস্তার এবং বিজয়
১২০৬	তেমুজিনের চেঙ্গিসখান নাম গ্রহণ, মোঙ্গলদের শ্রেষ্ঠ শাসক
১২২৭	চেঙ্গিস খানের মৃত্যু।
১২২৭-৬০	তিনজন শ্রেষ্ঠ খান বংশীয় শাসকের রাজত্ব, মোঙ্গলদের একতাবদ্ধতা
১২২৭-৪১	ওগোদী, চেঙ্গিস খানের পুত্র
১২৪৬-৪৯	গায়াক, ওগোদীর পুত্র
১২৫১-৬০	চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র তলুই এর পুত্র মঙ্কে।
১২৩৬-৪২	চেঙ্গিস খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জোশীর পুত্র বাটুর আমলে রাশিয়া, হাঙ্গেরী, পোলান্ড এবং অস্ট্রেয়া অভিযান।
১২৫৩-৫৫	মঙ্কের নেতৃত্বে চীন এবং ইরানে নতুন অভিযান শুরু।
১২৫৮	বাগদাদ অধিকার ও আব্বাসিদ খলিফাতন্ত্রের পতন। মঙ্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুলেগুর নেতৃত্বে ইরানে ইরানে ইল-খানিদ রাজ্য স্থাপন। জোশীদ ও ইলখানদের মধ্যে দ্বন্দ্বের শুরু।
১২৬০	পিকিংএ কুবলাই খানের রাজ্যারোহণ। চেঙ্গিস খানের উত্তর সূরীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব; বিভিন্ন স্বাধীন প্রশাখায় মোঙ্গল রাজত্বের ভাঙন—তলুই চাঘাটাই এবং জোশী। (ওগোদীর শাখা পরাজিত হয়ে তলুইদ শাকার অন্তর্ভুক্ত হয়) তলুইদ ঃ চীনের ইউয়ান বংশ এবং ইরানের ইলখানিদ রাজ্য ট্রানসাক্সনিয়ার উত্তরে এবং তুর্কীস্থানে চাঘাটাইদের আধিপত্য। রাশিয়ার সমভূমিতে জোশী প্রশাখার অবস্থান টীকাকারদের দ্বারা 'Golden Horde' বলে বর্ণিত।
১২৫৭-৬৭	বাটুর পুত্র বার্কের রাজত্ব। 'Golden Horde' এবং শিরের মধ্যে সখ্যতা এবং ইলখানেদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব।
১২৯৫-১৩০৪	ইরানে ইলখানিদ শাসক গজন খানের শাসন। তার বৌদ্ধধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তকরণের পর অন্যান্য ইল খানিদ শাসকেরাও সেই পথে এগিয়ে যান।
১৩৬৮	জীনদেশে ইউয়ান রাজবংশের শাসনের অন্ত।

একজন ইউরোপীয় শিল্পীর কল্পনায় বর্বর জাতি

১৩৭০-১৪০৫	চেঙ্গিস খানের বংশ পরিচয়ের দাবীদার তৈমুরের শাসন। তলুই, চাগঠাই এবং জোশীর রাজত্বের অংশ বিশেষ নিয়ে সাম্রাজ্য গঠন। তৈমুর চেঙ্গিস খানের বংশের এক কন্যাকে বিয়ে করে নিজেকে 'Guregen'–'Royal son-in-law' বলে ঘোষণা করলেন।
১৪৯৫-১৫৩০	চেঙ্গিস খান ও তৈমুরের বংশধর জাহিরুদ্দিন বাবর তৈমুরের ফারগানাও সমরখন্দের উত্তরাধিকার লাভ করেন—বিতাড়িত হন—কাবুল অধিকার করেন ও ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।
১৫০০	জোশীর কনিষ্ঠ পুত্র শিবানের বংশধর শায়েবানী খান ট্রানসক্সিয়ানা অধিকার করেন। কতৃত্ব স্থাপন করে সে অঞ্চল থেকে বাবর ও অন্যান্য তৈমুর বংশীয়দের উৎখাত করেন। (শায়েবানীদের উজবেক বলেও বর্ণনা করা হয়, যা থেকে বর্তমান উজবেকিস্তান)।
১৭৫৯	চীনদেশীয় মাঞ্চুরা মঙ্গোলীয়া অধিকার করে।
১৯২১	মঙ্গোলীয়ায় প্রজাতন্ত্র।

চেঙ্গিস খানের পরবর্তী মোঙ্গলেরা

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি ঃ প্রথম পর্যায়ে ১২৩৬-৪২ পর্যন্ত মোঙ্গলেরা রাশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল, বুলগার, কিভ, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরী অধিকার করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে **তারা** ১২৫৫-১৩০০ পর্যন্ত সমগ্র চীন, (১২৭৯) ইরান, ইরাক ও সিরিয়া দখল করে। এই সফল অভিযানগুলোর পর সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল স্থিতিশীল হয়।

১২০৩ এর পরবর্তী দশকগুলোতে মোঙ্গল সামরিক বাহিনী কয়েকটি জায়গায় বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে ১২৬০ এর পর পশ্চিম প্রান্তে মোঙ্গলেরা তাদের দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। যদিও ভিয়েনা, তার পরবর্তী পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চল এবং মিশর মোঙ্গলদের অধীনস্থ থাকে, হাঙ্গেরীয় সমভূমি অঞ্চল থেকে তাদের পশ্চাৎ অপসারণ এবং মিশরীয় বাহিনীর হাতে পরাজয় নতুন রাজনৈতিক ধারার উন্মেষ সূচিত করে। এই পরিবর্তনের দুটো দিক ছিল—প্রথমতঃ মোঙ্গলদের মধ্যে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ কলহ দেখা দেয়। জোশী এবং ওগোদীর উত্তরাধিকারীরা একতাবদ্ধ হয়ে চেঙ্গিস খানের শাসনযন্ত্র অধিকার করতে সচেষ্ট হন। ইউরোপে অভিয়ান পরিচালনা করবার চাইতেও তাদের কাছে ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তলুইদ শাখা জোশী এবং ওগোদীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র তলুই এর উত্তরাধিকারী মঙ্কে সিংহাসনে আরোহন করে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করেন। কিন্তু ১২৬০ এর দশকে শাসকদের মধ্যে চীন জয় করবার আগ্রহ দেখা দিলে সৈন্য এবং রসদ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়। ফলতঃ মিশরীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মোঙ্গলদের পশ্চিম অংশে বিস্তারে ইতি টানে। পাশাপাশি তলুইদ এবং তলুইদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাশিয়া ও ইরানের সীমান্ত এলাকা জুড়ে দ্বন্দ্বের ফলে জোশীদরা পরবর্তী ইউরোপ অভিযানের পথ থেকে সরে আসে।

ইউরোপ অভিযানে ইতি টানলেও মোঙ্গলরা ঐক্যবদ্ধভাবে চীন অভিযানে এগিয়ে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে চীনদেশে মোঙ্গল অভিযানের চূড়ান্ত সাফল্যের সময়ই তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোঙ্গলদের সাফল্য ও পাশাপাশিভাবে এতে বাধাদানকারী শক্তিগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান

মোঙ্গল এবং অন্যান্য যাযাবর সমাজে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সমর্থ ব্যক্তিরই সামরিক শিক্ষা ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। বিভিন্ন মোঙ্গল গোষ্ঠীর একতাবদ্ধতা এবং নানা জাতির বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের ফলে চেঙ্গিস খানের সৈন্যবাহিনীতে নতুন সদস্যরা যোগদান করে। তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র, ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনী নানা জাতির যোগদানের ফলে বহুরকম জটিলতার সম্মুখীন হয়। এদের মধ্যে ছিল তুর্কী Uighurs রা যারা ইচ্ছাকৃতভাবে চেঙ্গিস খানের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। Kereyits দের মত পরাজিত জাতির লোকেদের তাদের পূর্ববর্তী অবাধ্যতা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে

নিয়োগ করা হয়।

চেঙ্গিস খান তার সঙ্গে যোগদানকারী সমস্ত দলের পুরনো গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচয় লুপ্ত করে তাদের সুবিন্যস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার সেনাবাহিনী পুরনো দশমিক একক অনুযায়ী, ১০, ১০০, ১০০০, এবং ১০০০০, এর এককে সংগঠিত করা হয়। পুরনো রীতি অনুযায়ী একটি এককে গোষ্ঠী ও জাতির লোকেরা এক সাথে অবস্থান করত। চেঙ্গিস খান পুরনো জাতিভিত্তিক বিভাজন প্রথা ভেঙ্গে সদস্যদের নতুন সামরিক এককে বিভক্ত করে দেন। কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তার নিদি:ষ্ট দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদান করতে চাইলে কঠোর সাজার সম্মুখীন হত। প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের বৃহত্তম বাহিনীতে নানা ধরনের জাতি গোষ্ঠীর সদস্য থাকত। এই পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী সামাজিক ক্রমের জায়গায় নানা জাতি গোষ্ঠীর মিলনে একটি নতুন সামাজিক পরিচয় সৃষ্টি হয়। এই নতুন সত্ত্বার আদিপুরুষ ছিলেন চেঙ্গিস খান।

চেঙ্গিস খানের চার পুত্র ও বিশেষভাবে নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষদের (Noyan) অধীনে এই নতুন সৈন্যদলকে যোগদান করতে হত। বহু বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চেঙ্গিস খানের অনুগত থেকে তাকে সাহায্য করে যাওয়া একটি গোষ্ঠী এই নতুন শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে চেঙ্গিস খান তার blood brother এর সম্মান দেন। অপেক্ষাকৃত নীচু শ্রেণির কিছু স্বাধীন লোককে তার naukar পদবী দান করেন। এই পদবী চেঙ্গিস খানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশিত করত। এই শ্রেণি বিন্যাসে পুরনো গোষ্ঠীপতিদের অধিকার রক্ষিত হল না। চেঙ্গিস খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্র ধরে নতুন আভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। এই নতুন শ্রেণি ব্যবস্থায় নতুন ভাবে জয় করা জাতিগুলোর শাসনের দায়িত্ব চেঙ্গিস খান তার চার পুত্রের উপর ন্যস্ত করেন। তাদের অধীনে থাকা 'Ulus' বলে পরিচিত চারটি অঞ্চলের ভূমিখণ্ড খুব সুবিন্যস্ত ছিল না। চেঙ্গিস খানের সমস্ত জীবনই রাজ্যজয় ও রাজ্যবিস্তারে অতিবাহিত হওয়ায় কখনো তার কোন নির্দিষ্ট রাজ্যসীমা গড়ে উঠেনি। যেমন, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোশী রাশিয়ার সমভূমি অঞ্চলের অধিকারী হলেও তার অধিকৃত ভূখণ্ডের শেষসীমা ছিল অনির্দিষ্ট জোশী অধিকৃত ভূখণ্ডের বিস্তার ছিল পশ্চিম দিকে তার ঘোড়ার চারণভূমির শেষ সীমা পর্য্যন্ত। এই ভূখণ্ডের শেষ সীমা ছিল অনিদিষ্ট জোশী আধিকৃত ভূখণ্ডের বিস্তার ছিল পশ্চিম দিকে তার ঘোড়ার চারণ ভূমির শেষ সীমা পর্য্যন্ত। এই ভূখণ্ডের লাগোয়া পামির পর্বতশ্রেণীর উত্তর ভাগের অংশ এবং ট্রানসাক্সনিয়ান সমভূমি অঞ্চল লাভ করেন চেঙ্গিসখানের দ্বিতীয় পুত্র চাঘাটাই। ধারণা করা যায় জোশীর পশ্চিম প্রান্তে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভ্রাতার প্রাপ্ত এলাকার সীমানা পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। চেঙ্গিস খানের ইচ্ছা অনুসারে তার তৃতীয় পুত্র ওগোদী তার পিতার উত্তরাধিকারী হন এবং সিংহাসনে আরোহন করে তিনি কারাকোরামে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র তলুই মঙ্গোলিয়ার পৈতৃক ভূমির অধিকার লাভ করেন। চেঙ্গিস খানের ধারণা ছিল যে তার পুত্ররা সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করবে। এই বিশ্বাস থেকে তিনি প্রত্যেক পুত্রের প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীকে প্রতিটি 'ulu' তে স্থাপিত করেন। সাম্রাজ্য সম্বন্ধে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ধারণা গোষ্ঠিপতিদের সম্মেলনে আলোচিত হত। ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযান, লুণ্ঠনের সামগ্রী বণ্টন, চারণ ভূমি এবং

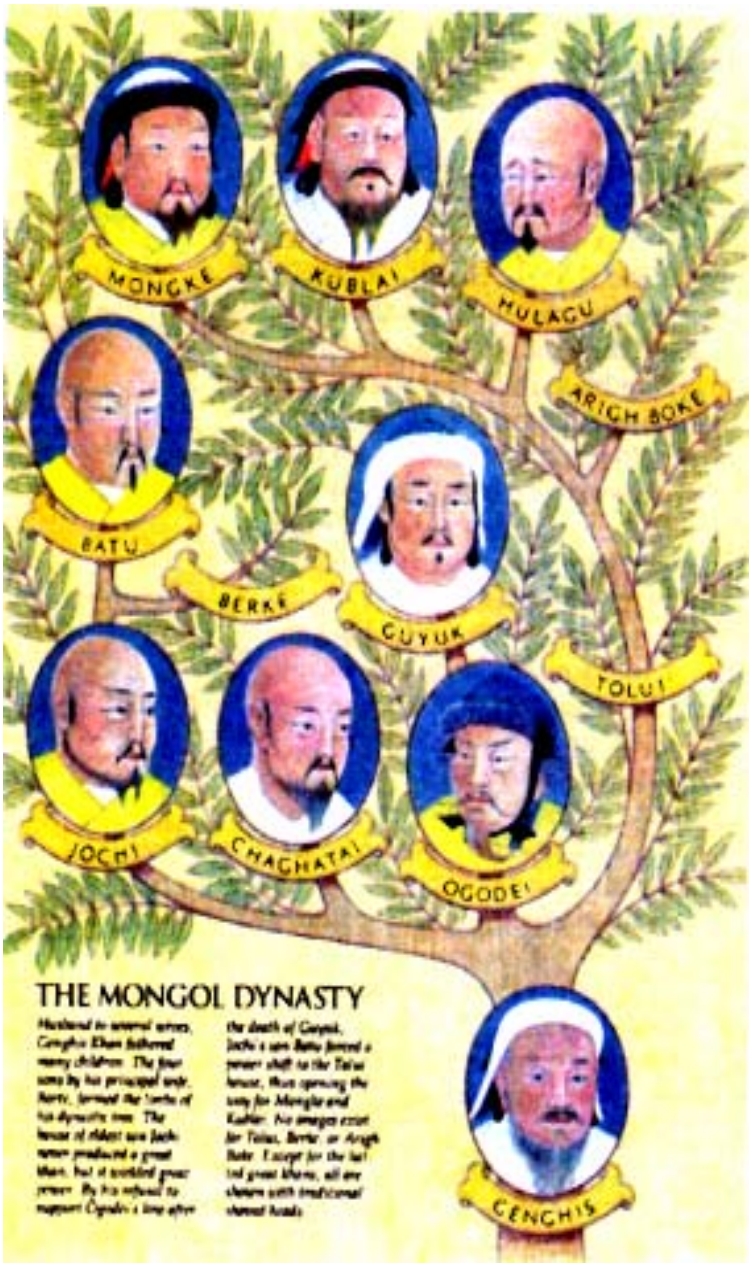

চিত্র চেঙ্গিস খানের বংশতালিকা

উত্তরাধিকারের মত প্রতিটি বিষয় ছাড়াও পারিবারিক বিষয়গুলোও এই সম্মেলনে আলোচিত হত।

তার রাজত্বের দূরতম প্রান্তগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য চেঙ্গিস খান একটি দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। নিয়মিত দূরত্বে চৌকি স্থাপন করে সেখানে দক্ষ ঘোড়সওয়ারদের মোতায়েন রাখা হত। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোঙ্গল যাযাবর জাতিগুলো তাদের পালিত পশুর খাদ্যের এক দশমাংশ দান করত। যাযাবর জাতিগুলোর ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদান করা এই করকে বলা হত qubcur tax. এর বিনিময়ে তারা নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করত। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা হয়, এবং এর গতি ও নির্ভরযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। এই ব্যবস্থার ফলে শাসকেরা বিভিন্ন মহাদেশ জুড়ে তাদের সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তের ঘটনাবলী সম্বন্ধেও অবহিত থাকতেন। তবে বিজিত জাতিগুলো তাদের নতুন যাযাবর শাসকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারত না। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম অর্ধের সামরিক অভিযানগুলোর ফলে বিভিন্ন নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কৃষি জমি বিনষ্ট হয়, ব্যবসা এবং হস্তশিল্প উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়। অগণিত লোকের মৃত্যু হয়, তার অধিক সংখ্যক লোক ক্রীতদাসে পরিণত হয়। বুদ্ধিজীবী থেকে কৃষিজীবী—সমস্ত শ্রেণির লোক লাঞ্ছনার স্বীকার হয়। অস্থির পরিস্থিতিতে শুষ্ক ইরানি মালভূমিতে নির্মিত ভূগর্ভস্থ খালগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ক্রমে মরুভূমি এগুলোকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, খোরাসানের কিছু অংশ কখনও সেই বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

সামরিক অভিযানের অস্থিরতা স্থিত হয়ে এলে ইউরোপ এবং চীন ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত হয়। মোঙ্গল রাজ্যবিস্তারের ফলে যে শান্তি স্থাপিত হল তার ফলে ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। মোঙ্গলদের শাসনকালে রেশম পথ ধরে ব্যবসা এবং পর্যটন চূড়ান্ত

সীমায় পৌঁছয়। এ সময় এই পথটি চীনদেশ ছাড়িয়েও বিস্তার লাভ করে।

রেশম পথ এ সময় উত্তর দিকে মতোলীয়া ও নতুন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু কারাকোরাম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। রোমান সাম্রাজ্যকে অটুট রাখবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অনায়াস ভ্রমণের সুবিধা। ভ্রমণকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ অনুমোদন পত্র দেওয়া হত। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সুরক্ষার জন্য baj tax বলে একটি কর প্রদান করতেন। অর্থাৎ মোঙ্গল বংশীয় খানদের শাসন সকল শ্রেণির জনগণের স্বীকৃতি পেয়েছিল।

মানচিত্রে মোঙ্গল সামরিক অভিযান

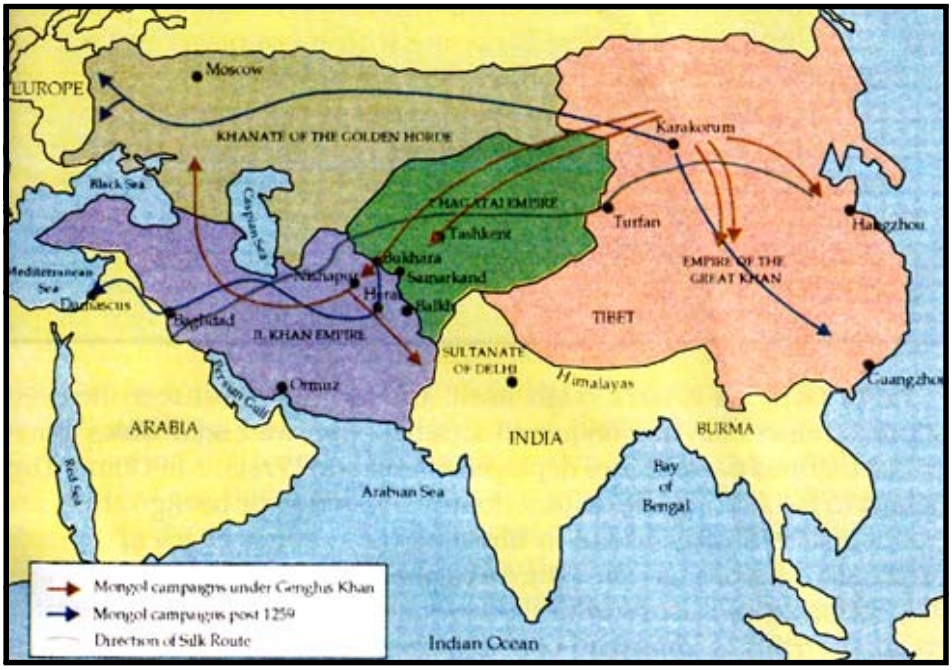

ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ভিতর যাযাবর এবং সুস্থিত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অপসারিত হতে থাকল। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে ১২৩০ এর দশকে মোঙ্গলেরা উত্তর চীনের চীন বংশের বিরুদ্ধে একটি সফল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সে সময় মোঙ্গল নেতাদের মধ্যে একটি অংশ কৃষকশ্রেণিকে ধ্বংস করে কৃষি জমিকে চারণ ভূমিতে পরিণত করতে আগ্রহী ছিলেন। ১২৭০ এর দশকে সুঙ্ বংশকে পরাজিত করে দক্ষিণ চীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। তখন চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খান কৃষকদের এবং নগরীগুলোর সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। ১২৯০ এর দশকে ইরানের মোঙ্গল শাসক ছিলেন চেঙ্গিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র তলুই এর বংশধর গজন খান (১৩০৪)। তিনি তার পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য সেনাপতিদের কৃষকদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করবার বিষয়ে সতর্ক করে দেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন সুস্থিত জনগণকে তুষ্ট না করে সুদৃঢ় সমৃদ্ধ রাজত্ব গড়ে তোলা যায় না।

এলাকাতে ছড়িয়ে দেওয়া হত, যেমন চীনদেশীয় সচিবদের ইরান বা পারসিক সচিবদের চীনদেশে নিয়োগ করা হত। এই প্রথা দূরবর্ত্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে উপযোগী ছিল। এছাড়া এ সমস্ত আমলাদের পটভূমি ও শিক্ষা সুস্থির সমাজের প্রতি যাযাবর

কার্যক্রম-২

রেশম পথটি চিহ্নিত করে এ পথে ব্যবসায়ীদের প্রাপ্ত পণ্যসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত কর। মোঙ্গলদের আমলে এই পথের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি নগীর এখানে দর্শানো হয়নি। এই নগরীটি মানচিত্রে স্থাপন কর। দ্বাদশ শতকে এই নগরীটি রেশম পথে অবস্থান না করবার কারণ কী ছিল? চেঙ্গিসখানের রাজত্বের সময় থেকেই মোঙ্গলেরা বিজিত সমাজগুলো থেকে প্রশাসক নিয়োগ করতে থাকে। অনেক সময় প্রশাসকদের বিভিন্ন

কার্যক্রম-৩

পশুপালক ও কৃষকদের মধ্যে কী কারণে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়? যাযাবর নেতাদের প্রতি চেঙ্গিস খানের বক্তৃতায় কি এ ধরনের কোন দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়?

গজন খানের বক্তৃতা

ইলখানিদ শাসকদের মধ্যে প্রথম ইসলামে ধর্মান্তরিত হন গজন খান। মোঙ্গল-তুর্কী যাযাবর দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত বক্তৃতাটি প্রদান করেন। সম্ভবতঃ বক্তৃতাটি গজন খানের পারসীক ওয়াজীর রসীদুদ্দিন লিপিবিদ্ধ করে দেন।

'I am not on the side of the Persian peasantry. If there is a purpose in pillaging them all, there is no one with more power to do this than I. Let us rob them together. But if you with to be certain of collecting grain and food for your tables in the future, I must be harsh with you. You must be taught reason. If you insult the peasantry, take their oxen and seed and trample their crops into the ground, what will you do in the future? ... The obedient peasantry must be distinguished from the peasantry who are rebels.'

গোষ্ঠীর যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা দূর করতেও কার্য্যকরী হত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সমস্ত প্রশাসকেরা তাদের প্রভুদের জন্য যথেষ্ট রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হতেন, মোঙ্গলেরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। শাসনকার্য্যে প্রশাসকদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ১২৩০-এর দশকে ওগোদীর কিছু উগ্র কার্য্যকলাপ চীনা মন্ত্রী yeh-luchu-ts'ai দমন করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে ইরানে Juwaini পরিবার একই ধরনের ব্যবহার শুরু করে। শতকের শেষপ্রান্তে ওয়াজির রসিদ উদ্দিনের লিখিত একটি বক্তৃতা গাজন খান তার মোঙ্গল সহযোগীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। তার আবেদন ছিল কৃষকদের নিষ্পেষণ না করে তাদের সুরক্ষা দিতে হবে।

মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি দূরবর্তী নব্য বসতি এলাকাগুলোতে সুস্থিত জীবন গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হত। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পৈতৃক সম্পত্তির যুগ্ম উত্তরাধিকারের মনোভাব দূর হয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিজস্ব এলাকার (Ulus) মধ্যে নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। চেঙ্গিস খানের উত্তর পুরুষদের মধ্যে তার স্থান অধিকার করবার জন্য যে দ্বন্দ্ব তার ফলশ্রুতি এই ভাঙন। তলুই এর উত্তরাধিকারীরা yuan এবং ইল-খানিদ বংশে বিভক্ত হয়ে চীন এবং ইরান শাসন করতে থাকেন। জোশীর বংশধরেরা Golden Horde গঠন করে রাশিয়ার সমভূমি অঞ্চল শাসন করে। ট্রানসক্সিয়ানার সমভূমি এবং বর্ত্তমান তুর্কীস্থান শাসন করেন চাঘাটাই-এর বংশধরেরা। লক্ষ্যণীয় যে মধ্য এশিয়ার সমভূমি অঞ্চল এবং রাশিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে যাযাবর পরম্পরা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ ও নতুন গোষ্ঠী সৃষ্টির প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে পুরনো পরিবারের ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের ধারণারও পরিবর্তন ঘটছিল। এই ভাঙন ছিল জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবের ফলাফল।

তলুইদ শাখার পৃষ্ঠপোষকতায় যে ইতিহাস রচিত হয়, সেখানে এই ভাঙনের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই ইতিহাসে সুদক্ষভাবে তলুইদদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। চীন ও ইরানের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্বৎজনের পৃষ্টপোষকতা করবার ফলে তলুইদ—শাখা এই ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্বতন রাজাদের সঙ্গে তুলনায় বর্ত্তমান শাসকদের সদর্থক দিকগুলো হয়তো পূর্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চেঙ্গিস খানও এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে রচিত পারসিক গাঁথায় চেঙ্গিস খান কর্ত্তৃক সংগঠিত হত্যালীলার এক বিস্তৃত বিবরণ এবং মৃতের সংখ্যার অতিরঞ্জন করা হয়েছে। যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ৪০০ জন রক্ষী কর্তৃক বুখারার দুর্গ সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ইল-খানিদ গাঁথা থেকে জানা যায় এই দূর্গ অধিকার করতে গিয়ে ৩০,০০০ সৈন্যকে হত্যা করা হয়। ইল-খানিদ গাঁথায় চেঙ্গিস খানের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে তারা এ কথাও সংযোজিত করেছে যে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের হত্যালীলারও অবসান হয়েছে। চেঙ্গিস খানের যুগের অবসান হলেও তার উত্তর পুরুষদের পক্ষে সুস্থির সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা কঠিন ছিল।

Yasa (১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের যে আইনি শাসন প্রবর্তন করবার কথা ছিল) সম্বন্ধীয় David Ayalan কৃত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় কেমন করে চেঙ্গিস খানের বংশধরেরা তার স্মৃতি উজ্জ্বল রেখেছেন। প্রথম অবস্থায় লিখিত Yasaq সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে শাসনের বিভিন্ন দিক—সংহত শিকার প্রক্রিয়া, সামরিক বাহিনী এবং ডাক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মোঙ্গলরা Yasa শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করে। এর ব্যাপক অর্থ ছিল 'চেঙ্গিস খানের আইনি শাসন'।

সমসাময়িক কালে সংঘটিত অন্যান্য পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করলে আমরা শব্দটির অর্থের পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করতে পারব। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মোঙ্গলরা ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য গঠন করে। তারা এক অত্যন্ত পরিশীলিত নাগরিক সমাজের উপর তাদের শাসন কায়েম করে, যে সমাজের ছিল নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আইন। যদিও রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের উপর মোঙ্গলদের আধিপত্য স্থাপিত হয়, সংখ্যার দিক থেকে তারা ছিল ক্ষুদ্রতর। তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পবিত্র আইনের মাধ্যমে তারা তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। yasa ছিল মোঙ্গল সমাজে প্রচলিত প্রথাগুলোর সংকলিতরূপ। কিন্তু এই আইনগুলোকে চেঙ্গিস খানের প্রবর্তিত আইন বলে উল্লেখ করে, মোঙ্গলরা তাদের মধ্যে Moses বা Solomon এর মতন একজন আইন প্রণেতার অবস্থান ছিল বলে দাবি করতেন। তারা এই আইনগুলো তাদের প্রজাদের প্রতি প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। yasa মোঙ্গলদের ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছিল; সুস্থিত সমাজের বিভিন্ন ধারা গ্রহণ করা সত্ত্বেও চেঙ্গিস খান ও তার বংশধরদের সঙ্গে মোঙ্গলদের একাত্মতা স্বীকার করেছিল। মোঙ্গলদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয় ধরে রাখতে ও বিজিত জাতিদের উপর তাদের আইন চাপিয়ে দিতে ভরসা জুগিয়েছি

yasa, yasa -কে কেন্দ্র করে ক্ষমতায়ন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছেছিল। চেঙ্গিস খানের ধারণাতে এ ধরনের আইন বিধির স্থান না থাকলেও, তার চিন্তাধারাই এই বিধির প্রণয়নে প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং সার্বিক মোঙ্গলীয় রাষ্ট্র গঠনে এই yasa র স্থান ছিল গরুত্বপূর্ণ।

কার্যক্রম-৪

চার শতকব্যাপী yasa -এর চরিত্র বদল কি আব্দুল্লা খান থেকে চেঙ্গিস খানকে বিচ্ছিন্ন করেছিল?

Hafiz-i-Tanish কেন মুসলিম ফেস্টিভাল গ্রাউণ্ডে আব্দুলা খানের প্রার্থনার সূত্রে চেঙ্গিস খানের yasa -র উল্লেখ করেন?

ইয়াসা

১২২১ এ বুখারা বিজয়ের পর চেঙ্গিস খান উৎসব প্রাঙ্গণে সেখানকার সম্পন্ন মুসলমান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাদের পাপী বলে উল্লেখ করেন ও নির্দেশ দেন যে পাপের ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যে তাদের গুপ্ত সম্পদ হস্তান্তর করা উচিৎ। এই নাটকীয় ঘটনাটি বহুদিন লোকের মনে গেঁথেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জোগীর উত্তরাধিকারী আব্দুল্লা খান সেই একই প্রাঙ্গণে তার ছুটির দিনের প্রার্থনার আয়োজন করেন। লিপিকার হাফিজ-ই-তানিস এ ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে চেঙ্গিস খানের ইয়াসা অনুসরণ করে আব্দুল্লা খান এ প্রার্থনার আয়োজন করেন।

উপসংহার ঃ চেঙ্গিস খানের অবস্থান এবং পৃথিবীর ইতিহাসের মোগলরা

বর্তমানে চেঙ্গিস খান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সামনে তার রাজ্যজয়ী, নগর ধ্বংসকারী এবং অসংখ্য লোকের হত্যাকারী রূপটাই ফুটে উঠে। ত্রয়োদশ শতকে চীন, ইরাণ ও পূর্ব ইউরোপের শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সমভূমি থেকে আগত দলটির প্রতি আতঙ্ক ও ঘৃণার মনোভাব ছিল। তবুও মোঙ্গলদের কাছে চেঙ্গিস খান ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তিনি মোঙ্গলদের একতাবদ্ধ করেছিলেন, কালক্ষয়ী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও চীনদেশীয় শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন, তাদের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়েছিলেন, একাধিক মহাদেশ জুড়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন এবং মার্কোপোলোর মত পর্য্যটকদের আকর্ষণ করবার মতন ব্যবসাপথ এবং বাজার পুনর্গঠিত করেছিলেন। পরস্পর বিরোধী দুই সত্ত্বা সামনে রেখে আমরা লক্ষ্য করি যে একটি প্রবল সত্ত্বা অন্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বিজিত সুস্থির জনগোষ্ঠীর মতামতকে পাশে সরিয়ে রেখে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ শতকে বিভিন্ন জাতি ও বিশ্বাসের জনগণকে একত্রিত করে এক বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। মোঙ্গল শাসকেরা সে-সময় বিভিন্ন ধর্মীয় সত্ত্বা যেমন—শামন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ঘটনাচক্রে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তবে তারা কখনো জননীতি গঠনে তাদের

ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেননি। মোঙ্গল শাসকেরা সমস্ত ধর্ম ও গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্য থেকে সেনাবাহিনীতে ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করতেন। তাদের বহুজাতি, বহুভাষী এবং বহু ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা বিবিধ সত্ত্বার সম্মুখেও ছিল নিরাপদ। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। কেমন করে মোঙ্গলেরা একটি অনুকরণীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা আজও ঐতিহাসিকদের চর্চার বিষয়।

বিভিন্ন খণ্ডিত দলকে সংঘবদ্ধ করে একটি সাম্রাজ্য গঠন করবার অনুপ্রেরণা মোঙ্গলরা জাগিয়েছিল। কোন পথে তার এই কার্য্য সফল হয়েছিল তৎকালীন লিখিত তথ্য থেকে তা জানা যায় না। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অনেক পরিবর্তন হলেও, সাম্রাজ্যের স্রষ্টার কর্ম পদ্ধতি সবসময়েই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে সুলতান তৈমুর পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিস খানের বংশোদ্ভুত না হবার ফলে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ করেছেন। শুধু পরবর্তীতে চেঙ্গিস খানের পরিবারের জামাতা পরিচয়ে তিনি তার স্বাধীন সাম্রাজ্য গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন।

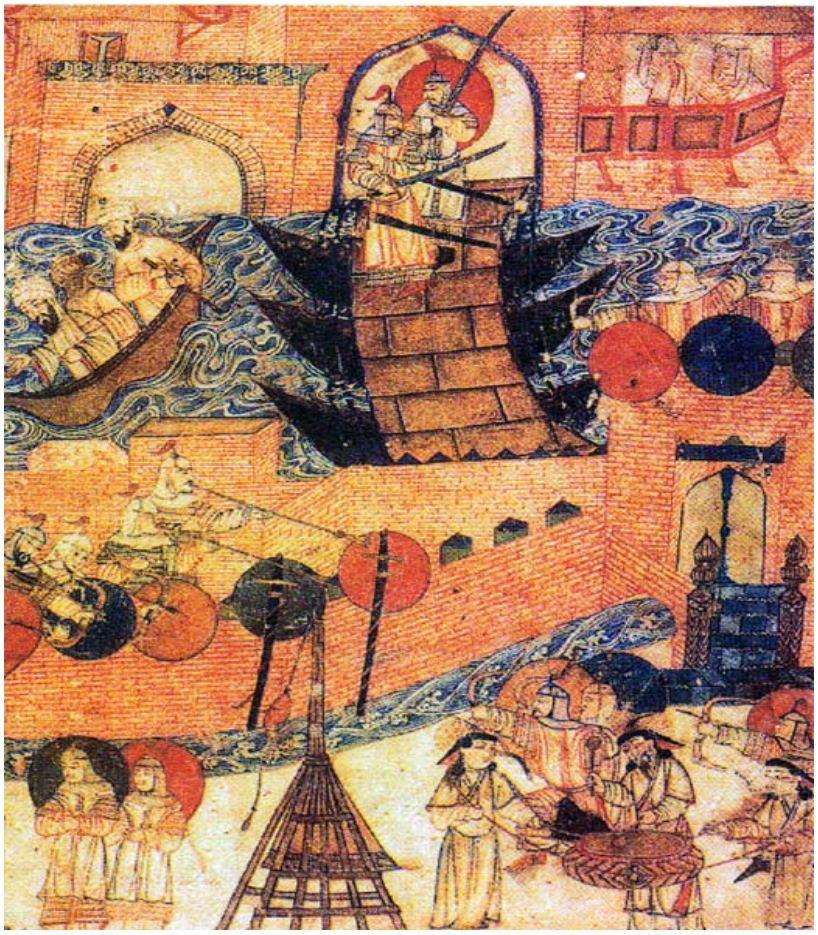

মোঙ্গলদের বাগদাদ অধিকার। চতুর্দশ শতকে রসিদ আল দিনের পুস্তকে অঙ্কিত চিত্র।

বর্তমানে বহু দশক ব্যাপী রাশিয়ার অধীনে থাকবার পর, মঙ্গোলীয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছে। একজন শ্রেষ্ঠ বীররূপে মঙ্গোলীয়রা চেঙ্গিস খানকে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন এবং গর্বের সঙ্গে তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন করেছেন। মঙ্গোলীয়ার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে চেঙ্গিস খানকে একজন অনুকরণীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতীয় পরিচয় সৃষ্টিতে অতীতের ইতিহাস তুলে ধরে মোঙ্গলরা তাদের দেশকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

চিত্র কুবলাই খান

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ ঃ—

১। মোঙ্গলদের কাছে ব্যবসা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

২। চেঙ্গিস খান কেন মোঙ্গল জাতিগুলোকে নতুন সামাজিক ও সামরিক গোষ্ঠীতে বিভাজিত করেছিলেন?

৩। Yasa তে প্রতিফলিত পরবর্তী মোঙ্গলদের কার্য্যকলাপ থেকে চেঙ্গিস খানের প্রতি তাদের কেমন মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়?

৪। 'নগর কেন্দ্রীক রচয়িতাদের রচনার উপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাসে যাযাবর সমাজের উগ্র ভূমিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়'—তুমি কি উক্তিটিকে সমর্থন কর? এই উক্তি থেকে কি পারসিক গাঁথায় বর্ণিত মোঙ্গল আক্রমণের অতি রঞ্জিত বর্ণনা চিত্রণের কারণ খুজে পাওয়া যায়?

সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ ঃ—

৫। মোঙ্গল এবং বেদুইনদের যাযাবর প্রবৃত্তিকে স্মরণে রেখে কেমন করে তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য দেখানো যায়? এই পার্থক্যগুলোর কারণ কী ছিল বলে তুমি মনে কর?

৬। নিম্নোক্ত অংশটি থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের সৃষ্ট যে নতুন মিশ্র জাতিসত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ফ্রান্সিসকান সাধু উইলিয়াম অফ্ রার্বাককে দূত হিসেবে খান শাসক মঙ্কের সভায় পাঠিয়েছিলেন। ১২৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্কের রাজধানী কারাকোরামে পৌছে তিনি প্যাকেট নাম্নী একজন মহিলার সঙ্গ লাভ করেন। হাঙ্গেরী থেকে আনীত এই মহিলা একজন রাজপুত্রের স্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সভায় উইলিয়াম একজন প্যারিসীয় স্বর্ণকারের দেখা পান। বাউচার নামে এই স্বর্ণকারের ভাই প্যারিসের গ্র্যাণ্ড পণ্ট-এ বাস করতেন। রাণী সরঘাক্টানী প্রথমে এই স্বর্ণকারকে নিযুক্তি দিলেও পরবর্তীতে তাকে নিয়োগ করেন মঙ্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উইলিয়াম লক্ষ্য করেছিলেন যে রাজসভায় উৎসবের সময় নেস্টোরিয়ান পুরোহিতেরা প্রথমে প্রবেশ করে রাজাকে আশীর্বাদ করেন। তারপর একে একে আসেন মুসলমান যাজক, এবং বৌদ্ধ ও তাই সাধুরা ..... ।)

৩

পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য
(CHANGING TRADITIONS)

তিনটি শ্রেণী
পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব

পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য

আমরা দেখেছি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এশিয়া ও আমেরিকার একটা বড় অংশ জুড়ে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠে বিস্তার লাভ করেছিল। বিভিন্ন যাযাবর জাতির স্থান পরিবর্তন, কয়েকটা উন্নত নগরের পত্তন ও এগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এই সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃত হয়েছিল।

মেসিডোনিয়ান, রোমান ও আরব সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর (যেমন, ইজিপ্সিয়ান, অ্যাসিরিয়ান, চীনা, মৌর্য্য সাম্রাজ্য) তুলনা করলে দেখা যাবে প্রথমোক্তদের সাম্রাজ্যের পরিধি শেষোক্তদের চাইতে আয়তনে বিশাল ছিল। এবং এর বিস্তার ছিল মহাদেশীয় ও আন্তর্মহাদেশীয়। মোঙ্গলদের সাম্রাজ্যও ছিল তেমনিই এক বিশাল সাম্রাজ্য।

পরবর্তীতে যা ঘটল তা ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের পরিণাম। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের জন্ম বা গঠন সব সময়ই আকস্মাৎ ঘটলেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সাম্রাজ্যগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল বহুদিনের বহু পরিবর্তনের ফলে—যে পরিবর্তনগুলো একটি সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষে সহায়ক ছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে পরম্পরাগত প্রথা বা ঐতিহ্য সম্ভবত নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়কে আমরা আধুনিক সময় বলে ধরে নেই। এই সময়েই পরম্পরাগত প্রথা বা ঐতিহ্যগুলো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছিল। তার কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটেছিল ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নয়; বরং সেগুলো ছিল গবেষণা ভিত্তিক। সরকার গঠনের ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, সেইসঙ্গে অসামরিক সরকারী চাকরীর ব্যবস্থা করা, সংসদীয় কার্যাবলী এবং আইন প্রণয়ণ, শিল্প ও কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার—এ সবই ছিল সময় সাপেক্ষ। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলাফল ইউরোপের বাইরেও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল।

আমরা দেখেছি, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে কয়েকটি অংশে বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ধীরে ধীরে সেখানে রাজত্বকারী জনগোষ্ঠীগুলোর প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নিজস্ব আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল। তবে, পশ্চিম ইউরোপের নগর কেন্দ্রগুলি পূর্ব ইউরোপের চাইতে ছোট ছিল।

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী অবধি নগর এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি, যেমন, আইক্স, লন্ডন, সিয়েনা ইত্যাদি যদিও খুব ছোট ছিল, সেগুলোকে কিন্তু অগ্রাহ্য করা যায়নি। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের গ্রামাঞ্চলে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চার্চ এবং রাজতন্ত্র, রোমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে প্রচলিত প্রথাগুলোর মিশ্রণ ঘটিয়েছিল। নবম শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ জুড়ে গঠিত শার্লেম্যানের সাম্রাজ্য ছিল এক সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি এর দ্রুত পতন এবং হাঙ্গেরি, নরওয়ের সমুদ্র দস্যু (Viking) ইত্যাদির জোর আক্রমণ সত্বেও নগরকেন্দ্র ও বাণিজ্যিক যোগাযোগগুলি সুদৃঢ় ভাবে টিকে রয়েছিল। পরবর্তীতে আমরা পাই সামন্তপ্রথা বা feudaliam জমিদারের খামার বাড়ীকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ জমিতে অনুগত ভূমিদাসদের শ্রমের বিনিময়ে যে কৃষি উৎপাদন হত তাকেই সামন্তপ্রথা বা feudalism বলে চিহ্নিত করা হত। সেই জমিদারদেরও আবার রাজার সামন্ত (Vassal) হিসেবে পরিচিত উচ্চতর শ্রেণীর জমিদারদের প্রতি অনুগত থাকতে হত। চার্চের নিজস্ব অধিকারভুক্ত জমি থাকায় ক্যাথলিক চার্চও এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থক ছিল। যে সময়ে পৃথিবীতে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, ঔষধ সম্বন্ধে মানুষের কোনো উঁচু ধারণা ছিল না এবং মানুষ স্বল্পায়ু ছিল তখন চার্চ মানুষকে তাদের চলার পথের এমন হদিশ দিল যাতে তারা অন্তত মৃত্যুর পরে শান্তি লাভ করতে পারে। চার্চের সহায়তায় অনেক মঠ তৈরি করা হল যেখানে ধর্মভীরু জনগণ ক্যাথলিক চার্চের ভাবধারার অনুসারী হয়ে ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। সেইসঙ্গে চার্চগুলোও বিভিন্ন দেশে এমনকি মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন থেকে বাইজানটিয়াম (Byzantium) পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারা পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় ও তৎপরবর্তী অঞ্চল সমূহের ঐশ্বর্য্যের মহিমা সম্বন্ধে ইউরোপের ছোট ছোট রাজন্যদের অবহিত করেছিল।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ভেনিস এবং জেনেভায় ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের বণিক সম্প্রদায় ব্যবসার বিস্তার ও নগর পত্তনের প্রচেষ্টা করেন। এর প্রভাব পড়েছিল প্রচলিত সামন্ত প্রথার উপর। বণিকদের জাহাজগুলো মুসলমান অধ্যুষিত দেশ এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের

The Palace of the Popes, in Avignon, a fourteenth-century twon in south France.

The Palace of the Doge, in Venice, fifteenth century

অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে যাতায়াত করত। ওই স্থানগুলোর ধন সম্পত্তির লোভে আকৃষ্ট হয়ে, এবং খ্রিস্টীয় ও ইসলামীয় ধর্মস্থানগুলোকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে উৎসাহিত হয়ে ইউরোপীয় রাজারা ধর্মযুদ্ধের সময় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রাজ্যগুলোর ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগর অঞ্চলের বন্দর নগরগুলোতে আয়োজিত মেলা ও ঐ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, মানুষের জীবনধারাও সেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল। ইসলামিক কলা ও সাহিত্য অনুসরণ করে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা শুরু হয়েছিল তেমনি, বাইজান্টাইন থেকে ইউরোপে আমদানীকৃত গ্রীক শিল্প কলা এবং তাদের ধ্যান ধারণা পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখতে ইউরোপীয়দের উৎসাহিত করেছিল। আবার খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতাব্দী থেকে (যে সময়কে Renaissance বা নবজাগরণের সময় বলে ধরা হয়) বিশেষ করে উত্তর ইটালির শহরগুলোতে ধনী ব্যক্তিরা মরণোত্তর জীবন নিয়ে তাদের ভাবনা চিন্তায় ছেদ টানলেন। অন্যদিকে জীবনের আনন্দ মুখর দিকটাই তাদের চিন্তাধারায় প্রাধান্য পেল। স্থপতি, চিত্রশিল্পী এবং লেখকেরা মানবতা এবং নিত্য নতুন জাগতিক আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই ঘটনাগুলো ভ্রমণ এবং আবিষ্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল যা আগে কখনও হয়নি। এই সময়ে আবিষ্কারের ঢেউ আছড়ে পড়ল। উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত স্পেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকেরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)-কে ছুঁয়ে হরেক রকম মশলা পাতির চাহিদা মেটাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে।

ইউরোপে ভারতীয় মশলার যথেষ্ট সুনাম ছিল। কলম্বাস পশ্চিম উপকূল ধরে ভারতবর্ষে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে একটি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে যান, ইউরোপীয়রা যে দ্বীপপুঞ্জের নাম দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অনুসন্ধানী অন্যান্য অভিযাত্রীরা উত্তর উপকূল ধরে ভারতে এবং তারপরে আর্কটিক সাগর হয়ে চীনে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা তাদের যাত্রাপথে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সেইসব মানুষের কাছ থেকে অনেক ব্যাপারে শিক্ষা লাভও করেছিল। পোপ সম্প্রদায় উত্তর আফ্রিকার ভূগোলজ্ঞদের (Geographer) এবং বিশেষভাবে অভিযাত্রী (Hasanal-Wazzan) কে (পরে যিনি লিও আফ্রিকানাস নামে ইউরোপে পরিচিত হয়েছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় পোপ লিও এক্সের জন্যে প্রথম ভূগোল এই লিখেছিলেন) তাদের কাজের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় উইল অ্যাডাম্‌স জাপানের শগুন (Japanese Shogun), Tokugawa Ieyasu-র একজন মিত্র এবং উপদেষ্টা হিসেবে তাদের সহায়তা করেছিলেন। ইউরোপীয়রা আমেরিকায় Hasanal Wazzan-এর মত অন্যান্য যেসব লোকের সংস্পর্শে এসেছিল, তারা ইউরোপীয়দের শুধু উৎসাহিতই করেনি তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যেও এগিয়ে এসেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, একজন আজটেক (Aztec) মহিলা, যিনি পরে ভোগা মার্টিনা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন, তিনি ম্যাক্সিকো বিজয়ী স্পেনিশীয় রাজা কর্টেসের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভাষা তর্জমা ও অন্যান্য কাজে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকটে (বর্তমান কোঝিকোড) ভাস্ক-ডা-গামা পৌঁছানোর পর পর্তুগীজরা যেভাবে ভারত মহসাগরস্থিত দেশগুলো কব্জা করার প্রয়াস নিয়েছিল তেমনি ইউরোপীয়রাও প্রায়ই আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে অস্ত্রের জোরে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা তাদের কর্তৃত্ব প্রয়াসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং নিষ্ঠুরতাকে কাজে লাগিয়ে এমনভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করত যে মনে হত তাদের প্রতিপক্ষরা সত্যই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। ক্যাথলিক চার্চ এই দুটি মনোভাবকেই উৎসাহিত করত। চার্চ অন্যান্য কৃষ্টি ও ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করলেও অখ্রিস্টীয়দের উপর অত্যাচারেও উৎসাহ যোগাত।

ইউরোপীয়দের কথা যদি আমরা ধরি, তাহলে দেখব অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাদের মিশ্র সম্পর্ক ছিল। ইসলামীয় দেশ, ভারত ও চীনের জনগণের মধ্যে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে একটা কৌতুহলের মনোভাব কাজ করছিল। ইউরোপীয়দের ধরে নেওয়া হত বর্হিবিশ্বের জন্য কিছু করার মানসিকতাহীন উদ্ধত বণিক এবং নাবিক হিসাবে, জাপানীরা ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধাজনক দিকগুলো যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি জেনে গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তারা বৃহদাকারের হাত বন্দুক উৎপাদন শিল্প চালু করেছিল। আমেরিকায় আজটেক (Aztec) সাম্রাজ্যের শত্রুরা কখনও কখনও ইউরোপীয়দের সাহায্য নিয়ে আজটেকদের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠত। একই সঙ্গে ইউরোপীয়রা যে ব্যাধিগুলো বয়ে এনেছিল তা মানুষকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যারফলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোনো কোনো জায়গায় ৯০ শতাংশেরও বেশী লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

সময়সূচি ৩
(১৩০০-১৭০০)

১৩০০ খ্রি: — ১৭০০ খ্রি:পর্যন্ত সময় ব্যাপী ইউরোপে কৃষি ও কৃষকদের জীবনের নানারকম পরিবর্তন সহ অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ওই সময় সংস্কৃতিরও বিরাট প্রসার ঘটেছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে ওই সময়টাতে বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একটা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। এই যোগাযোগের তাৎপর্য ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়— উদাহরণ স্বরূপ, বিভিন্ন মহাদেশগুলোর মধ্যে তাদের ধ্যান ধারণা, নানাধরনের আবিষ্কার এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী যেমন তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিত, তেমনি জমি, সম্পদ এবং বাণিজ্যপথ কব্জা করার অভিপ্রায়ে মহাদেশগুলোর মধ্যে হানাহানিরও সৃষ্টি হয়েছিল। ফলস্বরূপ, নরনারীরা প্রায়ই স্থানচ্যুত এবং দাসপ্রথার স্বীকার হয়ে পড়ত। কখনও বা তারা নিখোঁজ হয়ে যেত। কখনও মানুষের জীবন এমনভাবে রূপান্তরিত হত যে তাদের চেনার কোনো উপায় থাকত না।

সময়	আফ্রিকা	ইউরোপ
১৩০০-২৫		আলহাম্ব্রা (Alhambra) ও গ্রানাডা (Granada) স্পেনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল
১৩২৫-৫০	ইজিপ্টে প্লেগ রোগ (১৩৮৪-৫৫)	ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপি যুদ্ধ (১৩৩৭-১৪৫৩) ব্ল্যাক ডেথ পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল (১৩৪৮)
১৩৫০-৭৫	ইব্‌ন বতুতার সাহারা আবিষ্কার	বর্দ্ধিত করের বিরুদ্ধে ফরাসী কৃষকদের প্রতিবাদ (১৩৫৮)
১৩৭৫-১৪০০	ছবি	ব্রিটেনে কৃষক বিদ্রোহ (১৩৮১) জিওফ্রে চৌসার (Geoffrey Chaucer) দ্যা ক্যান্টারব্যরি টেলস (The Canterbury Taler) রচনা করলেন, যেটি ইংরেজী সাহিত্যের আদি রচনাগুলোর অন্যতম (১৩৮৮)
১৪০০-২৫		
১৪২৫-৫০	পর্তুগীজের দাস ব্যবসা শুরু (১৪৪২)	
১৪৫০-৭৫	পশ্চিম আফ্রিকায় সাংহাই (Sanghai) সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল সাহারা ব্যাপি বাণিজ্যিক যোগাযোগ; আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে পর্তুগীজ অভিযান এবং বসতি স্থাপন (১৪৭১ থেকে তৎপরবর্তী সময়)।	ইউরোপে প্রথম পুস্তক মুদ্রণ শুরু হল লিওনার্দে দাভিন্সি (১৪৫২-১৫১৯), ইটালির প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, স্থপতি এবং আবিষ্কর্তা।
১৪৭৫-১৫০০	পর্তুগীজদের দ্বারা বকঙ্গের রাজাকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তকরণ	ইংল্যান্ডে টিউটর বংশের প্রতিষ্ঠা (১৪৮৫)
১৫০০-২৫	আফ্রিকার ক্রীতদাসদের আমেরিকায় ইক্ষু ক্ষেতে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হল (১৫১০); অটোমান তুর্কীদের দ্বারা ইজিপ্ট আক্রমণ (১৫১৭)	দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে প্রথমকফি এল (১৫১৭) এবং তামাক, চকোলেট, টমেটো, মোরণ ইত্যাদি প্রবেশ করল/ প্রবর্তিত হল; মার্টিন লুথারের ক্যাথিলিক চার্চ সংস্কারের (১৫২১)
১৫২৫-৫০		কোপার নিকাশ সৌরজগত সংক্রান্ত তাঁর মতবাদটি তুলে ধরেন (১৫৪৩)
১৫৫০-৭৫		উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নাট্যকার
১৫৭৫-১৬০০		জ্যাগরিয়াস জেনস্যান (Zocharias Janssen) মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করলেন (ষোড়শ শতাব্দীর ৯০ এর দশকে) (১৫৯০)
১৬০০-২৫	ধাতুকার্য্যের কেন্দ্র হিসেবে নাইজেরিয়ার ওয়ো (Oyo) রাজ্য ক্ষমতার শিখরে পৌঁছল	আদি উপন্যাসগুলোর একটি ডন কুইজট (Don Quisote) স্পেনিশীয় ভাষায় লিখিত হয় (১৬০৫)
১৬২৫-৫০		উইলিয়াম হারভে মানবদেহে রক্ত চলাচল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন (১৬২৮)
১৬৫০-৭৫	পর্তুগীজের দ্বারা কঙ্গো রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (১৬৬২)	ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই (১৬৩৮-১৭১৫)
১৬৭৫-১৭০০		পিটার দ্য গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়ার আধুনিকীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সময়	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৩০০-২৫		
১৩২৫-১৩৫০		বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৩৬)
১৩৫০-৭৫	চীনের মিং (Ming) সাম্রাজ্য (১৩৬৮ থেকে তৎপরবর্তী সময়)	
১৩৭৫-১৪০০		
১৪০০-২৫		আঞ্চলিক সুলতানীর উত্থান।
১৪২৫-৫০		
১৪৫০-৭৫	অটোমান তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করল (১৪৫৩)	
১৪৭৫-১৫০০		ভাস্ক ডা-গামা ভারতবর্ষে পৌঁছুলেন (১৪৯৮)
১৫০০-২৫	পর্তুগীজদের চীনে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হল এবং তাদের ম্যাকাওতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল (১৫২২)।	
১৫২৫-৫০		বাবর উত্তর-ভারতকে মোগলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন, পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)
১৫৫০-৭৫		আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করলেন।
১৫৭৫-১৬০০	প্রথম কাবুকি নাটক (Kabuki play) জাপানে মঞ্চস্থ হল (১৫৮৬): পারস্যের শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করলেন।	
১৬০০-২৫	টোকুগাওয়া জাপানে শগুন প্রতিষ্ঠিত করলেন (১৬০৩)	ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল (১৬০০)
১৬২৫-৫০	ওলন্দাজদের ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল (১৬৩৭) ; চীনে ৩০০ বছরের মানচু শাসন (১৬৪৪ থেকে তৎপরবর্তী সময়): ইউরোপে চীনের চা এবং সিল্কের চাহিদা বৃদ্ধি।	তাজমহলের নির্মাণ (১৬৩২-৫৩)
১৬৫০-৭৫		
১৬৭৫-১৭০০		

সময়	আমেরিকা মহাদেশ	অস্ট্রেলিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
১৩০০-৫০ খ্রিঃপূঃ	আজটেক রাজধানী ম্যাক্সিকোর টিনজটিটলাম (১৩২৫), মন্দির নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং হিসেব রক্ষণ পদ্ধতি (কুইপু)।	
১৩২৫-৫০		
১৩৫০-৭৫		
১৩৭৫-১৪০০		
১৪০০-২৫		
১৪২৫-৫০		
১৪৫০-৭৫	পেরু ইনকাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হল (১৪৬৫)	
১৪৭৫-১৫০০	কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিডে পৌঁছলেন (১৪৯২)	
১৫০০-২৫	স্পেনের ম্যাক্সিকো বিজয় (১৫২১)	স্পেনের নাবিক ম্যাগলোন প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছলেন (১৫১৯)
১৫২৫-৫০	ফরাসী অভিযাত্রীরা কানাডায় পৌঁছুলেন (১৫৩৪)	
১৫৫০-৭৫	স্পেনের পেরু বিজয় (১৫৭২)	
১৫৭৫-১৬০০		ওলন্দাজ (ডাচ) নাবিকেরা ভুলবশত অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুলেন।
১৬০০-২৫	ইংল্যান্ড তাদের প্রথম উপনিবেশে উত্তর আমেরিকায় স্থাপন	স্পেনের নাবিকেরা তাহিতিতে পৌঁছুলেন (১৬০৬)
	করল (১৬০৭), পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রথম পর্যায়ের	
	ক্রীতদাসদের ভারজিনিয়ায় নিয়ে আসা হল (১৬১৯)	
১৬২৫-৫০	ওলন্দাজরা (ডাচ) নিউ আমস্টারডামের (বর্তমানে	ওলন্দাজ (ডাচ) নাবিক এ্যাবেল তাসমেনের (Abel Tasmen) নিজের অজান্তেই অস্ট্রেলিয়ার চারিদিকে নৌপ্রদক্ষিণ। তারপর তাঁর Van Diemen (পরবর্তীতে তাসমানিয়া নামে পরিচিত)। এর মাটিতে পদার্পণ।এরপর তিনি নিউজিস্যান্ডেরও পৌঁছান যাকে তিনি বৃহৎ তৃণভূমি অঞ্চলের একটি অংশ বলে ভেবেছিলেন।
১৬৫০-৭৫	ইক্ষু চাষ প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হল (১৬৫৪)	
১৬৭৫-১৭০০	ফরাসীরা মিসিসিপি নদীর অববাহিকাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করল এবং সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর নামে তার নাম হল লুসিয়ানা (Louisiana)	

ACTIVITY

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে যে অস্ট্রেলিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত কম নথিভুক্ত তথ্য রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ঐসব স্থানের মানুষ প্রায়ই অন্য ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করত, যেমন ছবি, যার একটি উপরে দেখানো হয়েছে। পূর্বের প্রত্যেক পাঁচটি কলাম থেকে অন্তত একটি ঘটনা/পদ্ধতির তালিকা প্রস্তুত কর যেগুলো একজন অস্ট্রেলীয় চিত্রকর নির্মাণ করেছিলেন যা নথির সমতুল্য। এমন পাঁচটি বস্তুর তালিকা প্রস্তুত কর যেগুলো সেই চিত্রকরের কাছে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল।

প্রসঙ্গ ৬

তিনটি শ্রেণী

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব, কিভাবে খ্রিস্টীয় নবম এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বেশ কিছু জার্মান গোষ্ঠীর মানুষ ইটালী, স্পেন ও ফ্রান্সের অঞ্চল সমূহ দখল করে নিয়েছিল।

রাজনৈতিক একাত্মতার অভাব থাকায় সামরিক সংঘাত লেগেই থাকত। এতেজমিজমা সংরক্ষণের তাগিদে সম্পদ আহরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফলে জমির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাটাই সামাজিক সংস্থাগুলোর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সামাজিক সংস্থাগুলোর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল রোমান ঐতিহ্য এবং জার্মান প্রথাকে অনুসরণ করে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকেই রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে পরিগণিত খৃস্টধর্মকে রোমের পতন স্থানচ্যুত করতে পারেনি, বরং ধীরে ধীরে মধ্য এবং উত্তর ইউরোপে এই ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। এর ফলে চার্চ ধীরে ধীরে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী হয়ে উঠেছিল।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তিনটি শ্রেণী। এই তিনটি শ্রেণী হচ্ছে তিনটি সামাজিক বিভাগ যথা যাজক সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভূমি আধিকারিক এবং কৃষক শ্রেণী। এই তিনটি সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল।

বিগত শত বর্ষ ধরে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে এমনকি এক একটা গ্রামের ইতিহাস নিয়েও বিস্তর পর্যালোচনা করেছেন। জমির মালিকানার দলিল, জিনিসপত্রের মূল্য এবং আইনি মামলার কাগজপত্র ইত্যাদি অনেক তথ্যগত উপাদান মধ্য যুগ থেকেই তাদের হস্তগত হওয়ায় তারা এই প্রয়াসে অগ্রণী হতে পেরেছিলেন। চার্চ থেকে প্রাপ্ত জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের নথিপত্র থেকে তদানীন্তন পারিবারিক ও জনসংখ্যা গত গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল। চার্চের উৎকর্ণলিপি (inscription) বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর সন্ধান দিয়েছিল এবং সঙ্গীত ও গল্পগাথা ওই সময়ের উৎসব এবং সামাজিক কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছিল।

আর্থ-সামাজিক জীনবধারা এবং দীর্ঘকালীন পরিবর্তন (যথা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি) ও স্বল্পকালীন পরিবর্তন (যথা কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি) জনিত পরিস্থিতিকে জানার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিকেরা উপরোক্ত তথ্য বা দলিলগুলো কাজে লাগাতে পারেন ফ্রান্সের বিদ্যোৎজনদের মধ্যে যাঁরা সামন্ত প্রথা (feudalism) নিয়ে কাজ করেছেন, ব্লক (block) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা সওয়াল করেছিলেন যে ইতিহাস মানে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনীই নয়, বরং তার চেয়েও অনেক বেশি,

তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য মার্ক ব্লক (১৮৮৬-১৯৪৪) মানব ইতিহাসকে (human history) নির্দিষ্ট রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও মনোভাবকে বোঝার প্রয়োজনে তিনি (মার্ক ব্লক) ভূগোল চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

ব্লকের 'feudal society-' বইটি ইউরোপীয়দের নিয়ে লেখা, যেখানে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের ফরাসী সমাজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বইটিতে সামাজিক সম্পর্ক এবং যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা, ভূমি পরিচালন ও ওই সময়ের জনপ্রিয় সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাতসিরা (Nazy) তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে নিহত করে যার ফলে তাঁর কর্মময় জীবন অকালেই ঝরে পড়ে।

'মধ্যযুগ' বলতে ইউরোপীয় ইতিহাসের খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কে বোঝায়।

সামন্ততন্ত্রের প্রবর্তন (An introduction to feudalism) ঃ

মধ্যযুগের ইউরোপে অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা সামন্তপ্রথা বা feudalism শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

জার্মান প্রতিশব্দ 'feud' থেকে নেওয়া 'feudalism' বা সামন্ত প্রথার অর্থ হচ্ছে 'এক টুকরো জমি' যা থেকে আমরা জানতে পারি মধ্যযুগের ফ্রান্সে এবং পরে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ

পশ্চিম ইউরোপের ম্যাপ

ইটালীতে সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে সামন্ততন্ত্র বলতে আমরা সেইরকম কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাই বুঝি যার অনেকটাই নির্ভর করে জমিদার ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরে। কৃষকরা তাদের নিজের জমির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জমিদারদের জমিতে দিনমজুরের কাজ করত এবং এর বিনিময়ে জমিদারদের কাছ থেকে তারা সামরিক নিরাপত্তা পেত। কৃষকদের উপর জমিদারদের আইনগত ব্যাপারে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সামন্তপ্রথা অর্থনীতিকে তো নিয়ন্ত্রণ করতই, তদুপরি এই প্রথা জনজীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করত।

সামন্তপ্রথার শেকড় রোমান সাম্রাজ্যের জনগণের আচার ব্যবহারের মধ্যে এবং ফরাসী রাজা শ্যালম্যাগনে (৭৪২-৮১৪) র রাজত্বকালে, খুঁজে পাওয়া গেলেও, এই প্রথা ইউরোপে যথার্থ প্রতিষ্ঠা পায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে।

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড

রোমান সাম্রাজ্যে 'গ্বল' (Gaul) নামে একটি প্রদেশ দুদিকে বিস্তৃত উপকূল, শ্রেণী, বড় বড় নদী, বনাঞ্চল এবং কৃষিকাজের উপযোগী বিস্তৃত সমতল ভূমিতে সমৃদ্ধ ছিল।

ফ্রাঙ্ক নামক জার্মান জনগোষ্ঠীর নাম অনুসারে 'গ্বল' এর নাম পরবর্তীতে ফ্রান্সে রূপান্তরিত হয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চলটি শাসিত হয়ে আসছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ফ্রাঙ্কিশ (Frankish)/ ফরাসী রাজাদের দ্বারা। ফরাসীদের চার্চের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল, যে সম্পর্কটির পরে আরও শক্তিশালী হয়েছিল ৮০০ খ্রিস্টাব্দে যখন চার্চের পোপ রাজা শ্যার্লম্যাগনের সমর্থন পাওয়ার জন্য তাঁকে 'পবিত্র রোমান সম্রাট' (Holy Roman Emperor) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

কন্সটান্টিনোপলে অবস্থিত পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের অধিকর্তার ঠিক একই রকম সম্পর্ক ছিল বাইজানটাইন শাসকের সঙ্গে।

ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি প্রদেশের একজন ডিউক একটি সংকীর্ণ প্রণালীর উপকূলে অবস্থিত ইংল্যান্ড -স্কটল্যান্ড দ্বীপটি অধিকার করেছিলেন।

ফ্রান্সের প্রাথমিক ইতিহাস ঃ	
৪৮১	ক্লোভিস ফ্রাঙ্কদের রাজা হলেন
৪৮৬	ক্লোভিস ও ফ্রাঙ্ক জনগোষ্ঠীরা উত্তর গ্বল (Gaul) এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন।
৪৯৬	ক্লোভিস ও ফ্রাঙ্কে জনগোষ্ঠীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেন।
৭১৪	চার্লস মর্টেল রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।
৭৫১	মার্টেলের পুত্র পেপিন ফ্রাঙ্কের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হলেন এবং নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন। বিজয়াভিযানের ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি দ্বিগুণতর হয়ে উঠেছিল।
৭৬৮	পেপিনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র শ্যার্লেম্যাগনে / চার্লস দ্য গ্রেট।
৮০০	পোপ ৩য় লিও (Leo III) শ্যার্লেম্যাগনকে 'পবিত্র রোমান সম্রাট' বা 'Holy Roman Emperor' উপাধিতে ভূষিত করেন।
৮৪০ ও তৎপরবর্তী সময়	নরওয়ে থেকে সমুদ্র দস্যু বা ভাইকিংদের আক্রমণ।

তিনটি বিশেষ শ্রেণী

ফরাসী যাজকরা এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন যে মানুষ তাদের নিজস্ব কাজের মান অনুসারে নির্ধারিত তিনটি ক্রমের যেকোনো একটির সদস্য নির্বাচিত হত। একজন বিশপ বা উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক বলেছিলেন, "এখানে কেউ প্রার্থনা করে , কেউ বা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়, আবার কেউ বা কাজ করে যায় ।" অতএব সমাজের তিনটি শ্রেণীকে এভাবে সাজানো যায় — যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও কৃষক শ্রেণী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বিঙ্গেনের এব্বেস হিল্ডে গার্ড লিখেছিলেনঃ
"Who would think of herding his entire cattle in one stable – cows, donkeys, sheep, goats, without difference? Therefore it is necessary to establish difference among human beings, so that they do not destroy each other ... God makes distinctions among his flock, in heaven as on earth. All are loved by him, yet there is no eauality among them "

'Abbey' শব্দের উৎপত্তি সাইরিয়াক (syriac) 'আব্বা' থেকে যার অর্থ পিতা। 'এব্ব' (Abbey) শাসিত হচ্ছিল একজন এব্বোট অথবা একজন এব্বস- এর দ্বারা।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অভিজাত শ্রেণী ঃ

যাজকেরা তাদের নিজেদেরকে প্রথম শ্রেণীতে এবং অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা তাদর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা সামাজিক ক্রিয়া কলাপে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এবং এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পেছনে যে কারণ কাজ করছিল তা হল 'সামন্তদশা' (Vassalage) র প্রচলিত রীতি।

ফ্রান্সের রাজাদের তাদের প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল সামন্তদশার মাধ্যমে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল জার্মানীর জনগণের মধ্যে, ফ্রাঙ্করা যাদের মধ্যে অন্যতম। ক্ষমতাশীল জমিদারেরা এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীরা লোকের যেমন রাজার সামন্ত হিসেবে পরিগণিত হতেন তেমনি কৃষকেরাও ছিল জমিদারদের সামন্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তঁার রাজাকে প্রভু হিসেবে মান্য করতেন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল এই মর্মে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সামন্তরা (vassals) প্রভুর (যিনি তাঁর প্রজাকে খাদ্য যোগাবেন, তিনিই প্রভু) প্রতি অনুগত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত প্রভুরা তাদের সব ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পদান করা এবং চার্চে বাইবেল হাতে নিয়ে অঙ্গীকার করাই ছিল এই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি। এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জমির মালিকানার চিহ্ন স্বরূপ সামন্তরা তাদের প্রভুর কাছ থেকে লিখিত নির্দেশ বা এক ঢেলা মাটি গ্রহণ করত।

French nobles starting for a hund, fifteenth-century painting

অভিজাত শ্রেণীর একজন ব্যক্তি বিশেষ সুবিধা প্রাপকের সামাজিক পদমর্যাদা উপভোগ করতেন। অনির্দিষ্ট কাল ধরে স্বীয় সম্পত্তির উপরে তাঁর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি চাইলে একটি সেনাদল তৈরি করতে পারতেন, যাকে বলাহত সামন্ত তান্ত্রিক সেনা। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিচারালয় স্থাপন করতে পারতেন এবং এমনকি নিজস্ব মুদ্রাও চালু করতে পারতেন।

একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর জমিতে বসবাসকারী লোকদের প্রভু হিসেবে চিহ্নিত হতেন। স্বীয় বিস্তৃর্ণ ভূমিতে যেমন তাঁর বাসস্থান গড়ে উঠত তেমনি ওই জমিতে থাকত ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী জমি ও চারণ ভূমি এবং সেই সঙ্গে থাকত প্রজা ও কৃষকদের বাড়ি ও চাষের উপযোগী ভূমি। তাঁর বাসস্থানকে

সাধারণত খামার বলা হত। কৃষকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জমি কর্ষণ করে দিত এবং সেই কৃষকেরাই আবার তাদের নিজস্ব জমিতে চাষবাস করা ছাড়াও প্রয়োজনে যুদ্ধ বিগ্রহে পদাতিক সৈন্যের দায়িত্ব পালন করত।

জমিদারের খাস খামার সংক্রান্ত ভূসম্পত্তি (The Manorial Estate) ঃ

এক একজন জমিদারের নিজস্ব খাস খামার থাকত। সমস্ত গ্রামগুলোকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। এক একজনের অধীনে শতাধিক গ্রাম থাকত যেখানে কৃষকরা বাস করত। এক একটি ছোট খাস খামারে এক ডজন পরিবার থাকতে পারত আর বড় খামারে থাকতে প্রায় ৫০/৬০টি পরিবার। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় প্রায় সব দ্রব্যই এই খামারগুলোতে পাওয়া যেত। জমিতে শস্যের ফলন হত। কামার ছুতোররা তাদের জমিদারের প্রয়োজনের দ্রব্যসামগ্রী যেমন তৈরি করত,তেমনি তাঁর অস্ত্রশস্ত্রও মেরামত করে দিত, আবার রাজমিস্ত্রীরা তাঁর প্রাসাদ দেখাশোনা করত, এবং শিশুরা

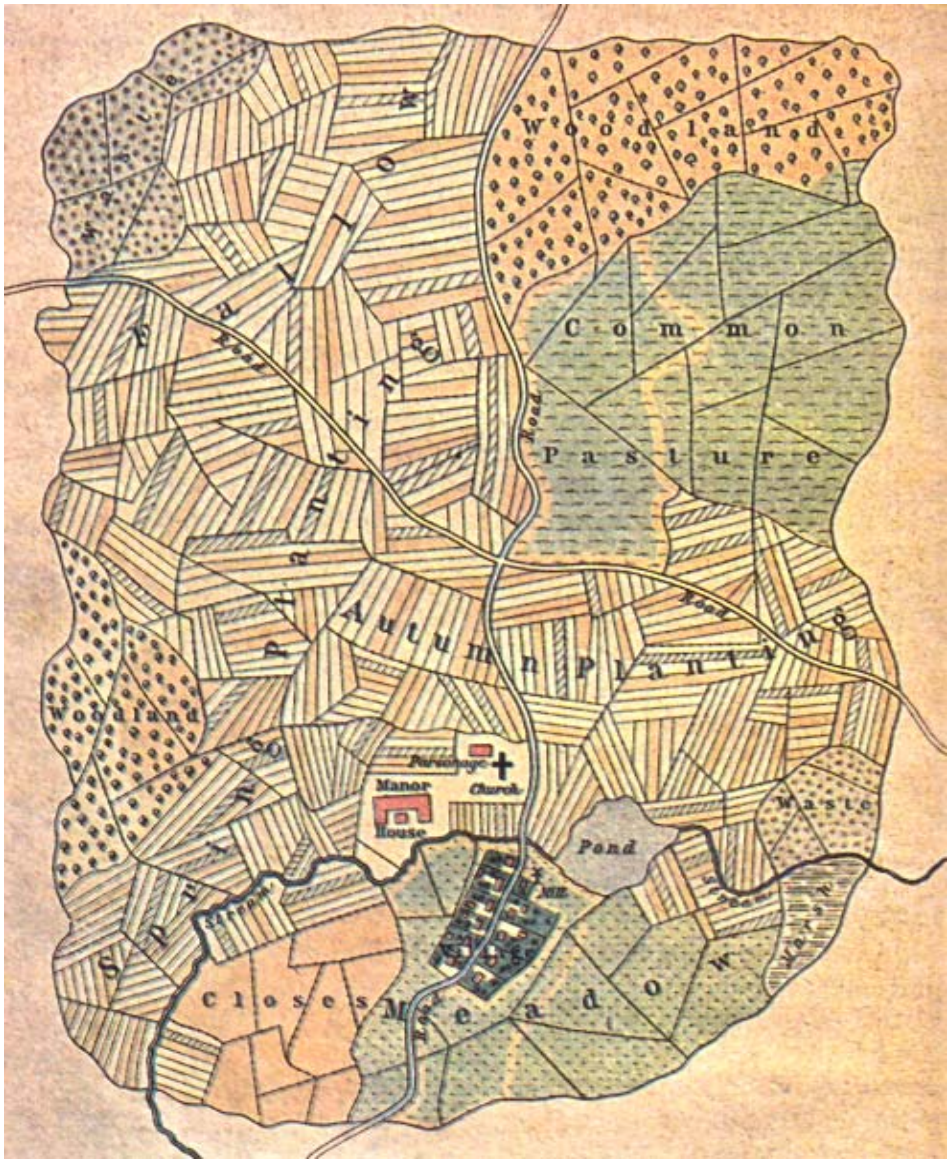

A manorial estate, England, thirteenth century

কাজ করত জমিদারের নিজস্ব পানশালায়। খামারগুলি গাছগাছালি ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, যেখানে জমিদারেরা শিকার করতেন। খামারগুলিতে বিস্তৃত গোচারণ ভূমিও ছিল যেখানে তাদের গরু-বাছুর ও ঘোড়ার পাল চরে বেড়াত। খামারগুলোতে চার্চও থাকত এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনে দুর্গও থাকত। খামারগুলোর পরিধি এত বিশাল ছিল যে সেখানে চার্চ এবং যে কোনো বর্হিআক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দুর্গও তৈরি করে রাখা হত।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এক একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধা পরিবারের বসবাসের জন্য এক একটি দুর্গের আকার বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করে তোলা হয়। বস্তুত নর্মান জয়ের আগে দুর্গের ব্যাপারে ইংল্যান্ডবাসীর কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সামন্ত প্রথাকে অনুসরণ করে রাজনৈতিক পরিচালনা ও সামরিক শক্তির প্রয়োজনীতার কথা মাথায় রেখে ওই দুর্গগুলোকে উন্নত করে তোলা হয়েছিল।

জমিদারের খাস খামারগুলোকে কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায়নি, কারণ লবণ, যাঁতাকলের পাথর ও ধাতুর পাত বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হত। যে সব জমিদারেরা বিলাসবহুল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং স্থানীয় যোগানের অভাব রয়েছে এমনসব দামী আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র ও অলঙ্কার সংগ্রহ করতে চাইতেন, সেগুলোকে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে আমদানি করতে হত।

কার্যক্রম-১

সামাজিক উত্তরাধিকার যা পেশা, ভাষা, সম্পত্তি ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

মেসোপটামিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ফ্রান্সের তুলনা কর।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধাগণ ঃ

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে ইউরোপে স্থানীয়ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। অপেশাদার কৃষক যোদ্ধাদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত অপ্রতুল ছিল এবং প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অপরিহার্যতা অনুভূত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপীয়রা নতুন সম্প্রদায়, যথা নাইটবা সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করল। জমিদারদেরও সেইরকম সম্পর্কই ছিল। জমিদারেরা নাইটদের এক টুকরো জমি প্রদান করতেন (যাকে বলা হত জায়গীর বা fief)। এবং তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতেন। এই জায়গীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যেত। জায়গীরের পরিধি যেমন ছিল ১০০০-২০০০ একর জমি বা আরও বেশি, তেমনি ওই জায়গীরে ছিল যোদ্ধা ও তার পরিবারের জন্য একটি বাসস্থান, একটি চার্চ বা তার উপরে নির্ভরশীল অন্যান্যদের থাকার জন্য ঘরবাড়ি। এছাড়াও ছিল একটি জলচালিত কল (water mill) ও একটি সুরা তৈরির জন্য আঙ্গুরমাড়াই কল (wine press)। সামন্ততান্ত্রিক জমিদারির মত জায়গীরদারের জমিও কৃষকেরা চাষ করে দিত। বিনিময়ে, যোদ্ধারা (knight) তাদের জমিদারদের নিয়মিত ফি (fee) দিতেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহে তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। তাদের দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই যোদ্ধারা প্রতিদিন নকলযুদ্ধে কৌশলগত অভ্যাস রপ্ত করতেন। একজন যোদ্ধার একইসঙ্গে একাধিক জমিদারের সেবা করতে কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু তার প্রধান আনুগত্য ছিল তার নিজের জমিদারের প্রতি।

ফ্রান্সে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চারণ কবিরা খামার থেকে খামারে ঘুরে বেড়াতেন গান গেয়ে গেয়ে, যে গানের উদ্দেশ্য ছিল সাহসী রাজা ও যোদ্ধাদের নিয়ে কিছুটা ঐতিহাসিক এবং কিছুটা কাল্পনিক গল্প গাথা প্রচার করা। একটা যুদ্ধে বেশির ভাগ মানুষই পড়তে জানত না এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও ছিল কম সেইসময় ওই পরিব্রাজক চারণ কবিরা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অনেক খামারের বড় বড় ঘরে ছোট ছোট অলিন্দ থাকত যেখানে খামারের লোকজন ভোজনের জন্য জমায়েত হত। ওই অলিন্দগুলো ছিল চারণ কবিদের গ্যালারি বা চারুশিল্পের প্রদর্শনী স্থান যেখান থেকে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন পান ভোজন করতেন তখন চারণ কবিরা সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে তাঁদের আনন্দ দান করতেন।

'If my dear lord
is slain, his fate
I'll share,
If he is hanged,
then hang me
by his side.
If to the stake he
goes, with him
I'll burn;
And if he's
drowned, then
let drown
with him.

ডুন-ডি- মায়েন্স, একজন ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী কবি, যিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধাদের অভিযান গাথা লিখে গিয়েছিলেন।

প্রথম শ্রেণী সম্প্রদায় (First order: the clergy) ঃ

ক্যাথলিক চার্চগুলোর নিজস্ব আইন কানুন ছিল। তাদের নিজস্ব জমিও ছিল, যেগুলো শাসকেরা তাদের দান করেছিলেন। এমনকি তাদের খাজনা সংগ্রহ করার ও অধিকার ছিল। তাই চার্চগুলো একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের রাজার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত না। পাশ্চাত্যের চার্চগুলোর শীর্ষে যিনি অবস্থান করতেন তিনি ছিলেন পোপ। তিনি রোম নগরীতে বাস করতেন। ইউরোপের খ্রিস্টানরা বিশপ এবং যাজকদের দ্বারা পরিচালিত হতেন, যাদের বলা হত প্রথম শ্রেণী। অধিকাংশ গ্রামগুলোতেই তাদের নিজস্ব চার্চ ছিল যেখানে লোকেরা প্রতি রবিবারে যাজকদের ধর্মোপদেশ শোনা ও সমবেত ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য জমায়েত হত।

যেকোনো ব্যক্তি চাইলেই যাজক হতে পারতেন না। ভূমিদাস এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের যাজক হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। মহিলারাও যাজক হতে পারতেন না। পুরুষদের মধ্যে যারা যাজক হতেন তাঁরা বিয়ে করতে পারতেন না। বিশপরা ছিলেন ধর্মীয় অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। জমিদারেরা অপর্যাপ্ত ভূসম্পত্তির মালিক জমিদারদের মত বিশপেরাও শুধু প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিকই ছিলেন না, তাঁরা থাকতেনও বিশাল আকারের প্রাসাদে। কৃষকেরা সারা বছর তাদের জমি থেকে যে ফসল উৎপাদন করত তার এক দশমাংশের (tilte) ভাগীদার ছিল ওই চার্চগুলো। চার্চগুলোতে ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকেও প্রচুর অর্থাগম হত যেগুলো ওরা দান করত তাদের নিজেদের কল্যাণে এবং তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের শান্তি কামনায়।

চার্চগুলো যে সমস্ত উৎসবাদি পরিচালনা করত তার অনেকগুলিই হত সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই। হাঁটু গেড়ে বসে জোড় হাতে মাথা নত করে চার্চে প্রার্থনা করার যে পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল তা সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধাদের তাদের প্রভু বা জমিদারদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। একই ভাবে চার্চগুলোতে ঈশ্বরকে প্রভু বলে সম্বোধন করার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল সেটাও করা হয়েছিল ওই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেই।

কার্যক্রম -২

মধ্যযুগীয় একটি খামার, একটি প্রাসাদ ও একটি ধর্মস্থলে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষদের আচার ব্যবহার কেমন ছিল সে নিয়ে আলোচনা কর।

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা

ধার্মিক খ্রিস্টানদের চার্চ ব্যতীত আরেকটি সংগঠন ছিল। যাজকেরা যেখানে শহরে বা গ্রামে বসবাস করতে পছন্দ করতেন, সেখানে কিছু প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নির্জনে বসবাস করতেই ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁরা লোকালয় থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ধর্মীয় সংগঠন বা মঠগুলোতে বসবাস করেতন। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ইটালীতে সেন্ট বেনেভিস্ট এবং ৯১০ খ্রিস্টাব্দে বুরগুণ্ডীতে ক্লুনী প্রতিষ্ঠিত মঠ দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য।

যাজকেরা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে প্রার্থনা, পড়াশোনা ও কৃষিকাজের মত পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করেই তাঁরা তাঁদের অবশিষ্ট জীবনটা মঠেই অতিবাহিত করবেন। যাজকদের এই ধরনের জীবনযাত্রা যুগপৎ পুরষ এবং মহিলারা অনুসরণ করতে পারতেন।

মনাস্টারি (মঠ) শব্দটি গ্রীকশব্দ মোনাস থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হচ্ছে এমন একজন যিনি একাকী বাস করেন।

পুরুষদের বলা হত ‘monk’ মহিলাদের ‘nun’ । কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সব মঠগুলিই ছিল সমলিঙ্গ সংগঠন। অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ছিল আলাদা আলাদা মঠ।

Monk এবং Nun- রা বিয়ে করতে পারতেন না।

প্রথম অবস্থায় মঠগুলোর আকার ছোট ছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ বা ২০ জন পুরুষ / মহিলা। কিন্তু ধীরেধীরে মঠগুলোর সদস্য সংখ্যা বেড়ে কয়েক শতকে পৌঁছয় এবং ওই মঠগুলোর নিজস্ব সব ঘরবাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তি ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল নিজস্ব স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল।

বেনেভিকটাইন মনাস্টরি বা মঠগুলোতে অধ্যায় বিশিষ্ট একটি পান্ডুলিপিতে বিভিন্ন নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ ছিল। এই নীতিগুলো খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা কয়েক শতাব্দী ধরে মেনে চলেছিলেন। এখানে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করা হল।

অধ্যায় ৬ ঃ সন্ন্যাসীদের কদাচিত কথা বলার অনুমতি দেওয়া উচিৎ

অধ্যায় ৭ ঃ নম্রতার অর্থ হচ্ছে মান্যতা

অধ্যায় ৩৩ ঃ সন্ন্যাসীদের কোনো নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারবে না।

অধ্যায় ৪৭ ঃ অলসতা আত্মার শত্রু। অতএব ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিদের উচিত কায়িক শ্রম করা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা।

অধ্যায় ৪৮ ঃ মঠগুলোর নির্মাণ এখন হওয়া উচিৎ যেন জল, কলকারখানা, বাগান, ইত্যাদি সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনমত পাওয়া যায়।

কলা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মঠগুলোর বড় ভূমিকা ছিল। মঠকর্ত্রী হিল্ডেগার্ড একজন ঈশ্বরপ্রদত্ত সঙ্গীতকার ছিলেন যিনি চার্চে, সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে উপাসনা করার প্রথার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সন্ন্যাসীদের কয়েকটি দল যাঁরা রোমান ক্যাথলিকের সদস্য (fraiars) হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তাঁরা নিজেদেরকে মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ধর্মপ্রচার ও জনকল্যাণের স্বার্থে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতেন।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যারপরনাই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। ইংল্যান্ডে লেংল্যান্ডের একটি কবিতা পিয়ারস প্লাওম্যান (Piers Plowman) (১৩৬০-৭০) এ খুব সুন্দরভাবে তুলনা করা হয়েছে গরিব কৃষক ও মেষপালক ও শ্রমিকদের সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে কিছু সন্ন্যাসীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার। এমনকি ইংল্যান্ডের চৌসার (chaucer) তাঁর ক্যান্টারব্যারি টেলস-এ সন্ন্যাসী এবং রোমান ক্যাথলিক সদস্যদের ব্যঙ্গচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

চার্চ এবং সমাজ

ইউরোপীয়রা যদিও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, যাদুবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতির প্রতি তাদের পুরনো বিশ্বাসে তারা অটল ছিল। এমনকি বড়দিন এবং যীশুর পুনরুভ্যুত্থানের মত দিনগুলোও তাদের কাছে গুরত্ব পেতে শুরু করে কেবল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে। সৌর পঞ্জিকাকে অনুসরণ করে প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর দিনটি পুরাতন রোমান উৎসবের পরিবর্তে পালিত হতে থাকল যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে। ইস্টার (Easter) দিনটি পালিত হতে থাকল খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ পরবর্তী পুনরভ্যুত্থানের দিবস হিসেবে। কিন্তু এই তারিখটি কোনো স্থায়ী তারিখ ছিল না কারণ ওই তারিখটি চান্দ্রেয় পঞ্জিকাকে অনুসরণ করে সেই উৎসবের স্থান নিয়েছিল, যে উৎসব পালিত হত শীত পরবর্তী বসন্তকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে। পরম্পরাগতভাবে ওই দিনটিতে প্রতিটি গ্রামের মানুষ তাদের গ্রাম দর্শন করতে বেরুত। খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের পরও তাদের পরম্পরাগত গ্রাম দর্শন, প্রথা অনুসারিত হতে থাকত। তবে এসময় গ্রামের নতুন নামকরণ হল 'পৈরিশ' (Parish যে স্থান একজন যাজকের তত্বাবধানে থাকে) হিসেবে। কাজের ভারে ভারাক্রান্ত কৃষকেরা ওই ধর্মীয় দিনগুলোকে স্বাগত জানাল কারণ ওইদিনগুলোতে তাদের কাজ না করলেও চলত। ওই বিশেষ দিনগুলো উপাসনার দিন হিসেবে গণ্য হত কিন্তু মানুষ সাধারণত ওইদিনগুলো আনন্দ উৎসব ও পান ভোজনের মধ্য দিয়ে কাটাত। একজন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর জীবনে তীর্থ দর্শনের মূল্য অপরিসীম। অজস্র লোক তীর্থদর্শনের অভিপ্রায়ে শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভ ও চার্চ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ত।

"when in April the sweet showers fall
And pierce the drought of March to the root
And the small birds are making melody
That sleep away the night with open eye...
(So Nature pricks them and their heart engages);
Then people long the go on pilgrimages,
And palmers* long to seek the foreign shrines
Of far-off saints, revered in various lands.
And especially from every shire
Of England, to Canterbury they make their"
— জিওফ্রে চ্যসার (১৩৪০-১৪০০) দ্য ক্যান্টরব্যারী টেল্‌স। মধ্যযুগীয় ইংরেজিতে লেখা অংশটিকে আধুনিক ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

কৃষক শ্রেণী- মুক্ত কৃষক ও ভূমিদাস

তৃতীয় শ্রেণীঃ

এবারে সাধারণ মানুষ, যাদের উপরে প্রথম দুটো শ্রেণী নির্ভরশীল ছিল, তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক। কৃষক দুধরনের ছিল, মুক্ত কৃষক ও ভূমিদাস বা ভূমি শ্রমিক। মুক্ত কৃষকেরা জমিদারের রায়ত হিসেবে তাদের জমি ভোগ করত। ওই কৃষকদের বছরে অন্তত ৪০ দিনের জন্য সামরিক বিভাগে কাজ করতে হত। ওই কৃষকদের সপ্তাহে তিন বা ততোধিক দিন নিজেদের জমির কাজ ফেলে জমিদারের জমিতে গিয়ে কাজ করতে হত। তাদের এই কাজের ফলে জমি থেকে যে উৎপাদন হত তার পুরোটাই তাদের জমিদারের হস্তগত হত। এর অতিরিক্ত, কৃষকদের প্রায়ই কিছু কাজ, যেমন মাটি খোঁড়া, জ্বালানি,কাঠ আনা, জমিতে বেড়া দেওয়া, রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর মেরামত করা ইত্যাদি, বিনা পারিশ্রমিকে করে দিতে হত। জমিতে সাহায্য করা ছাড়াও নারী ও শিশুদের আরও কাজও করতে হত। তারা সূতো কাটত, কাপড় বুনত, মোমবাতি তৈরি করত এবং আঙ্গুর মাড়াই করে প্রভুর জন্য সুরা তৈরি করত। রাজারা কৃষকদের উপর টেইলি (taille) নামে একটা প্রত্যক্ষ কর প্রয়োজনে আরোপ করতেন, যা যাজক বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিদের উপর প্রযোজ্য ছিল না।

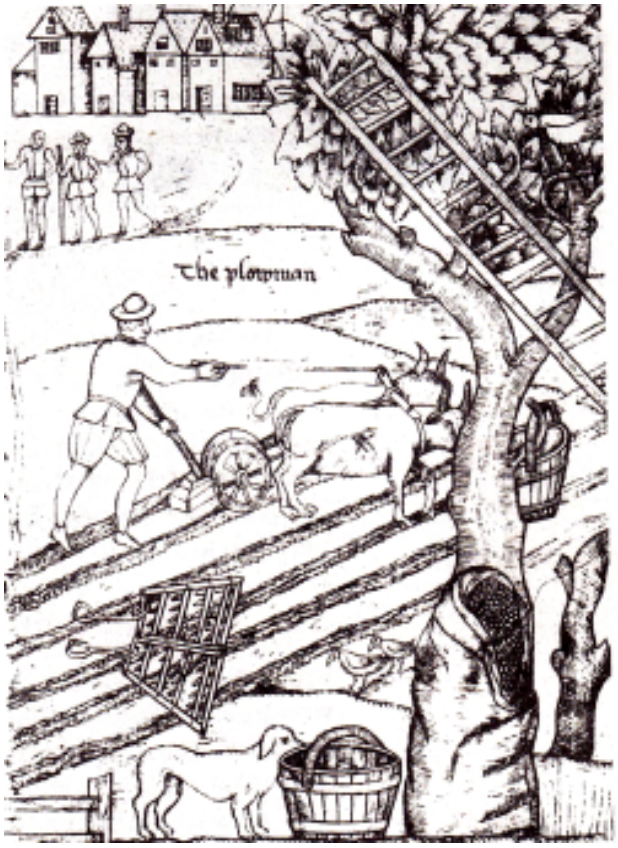

বর্তমান ইংরেজ কৃষক, ষোড়শ শতাব্দীর চিত্র

ভূমিদাস বা ভূমিহীন কৃষকেরা তাদের জমিদারদের জমি চাষ করে দিত। ওই জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের বৃহৎ অংশই জমিদারকে প্রদান করতে হত। জমিদারদের জমিতে আরও অন্যান্য কাজও তাদের করতে হত যার বিনিময়ে তারা কোনো মজুরি পেত না এবং জমিদারের অনুমতি ছাড়া এই কাজ ছেড়ে দিতেও পারত না। জমিদারেরা ভূমিদাসদের পরিশ্রমকে মূলধন করে অনক একচেটিয়া কারবার চালাতেন। ভূমিদাসরা তাদের জমিদারের কারখানায় নিজেদের গম ভাঙার কাজ করতে পারত, তাঁর চুলোয় রুটি শেকতে পারত এবং তাঁর সুরা তৈরি করে তাদের সুরা পরিশোধন করতে পারত। ভূমিদাসরা কাকে বিয়ে করবে সেটাও জমিদারেরা ঠিক করে দিতে পারতেন অথবা ভূমিদাসের মতের স্বপক্ষে মতামত দিতে পারতেন, তবে এসবই করতেন অর্থের বিনিময়ে।

ইংল্যান্ড ঃ

একাদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্র চালু হয়। মধ্য ইউরোপ থেকে আগত এঙ্গল (Angles) ও সেক্সনরা (Saxons) ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। 'ইংল্যান্ড' নাম এঙ্গল ল্যান্ডের অপভ্রংশ। একাদশ শতাব্দীতে নর্মান্ডির ডিউক উইলিয়াম কিছু সংখ্যক সৈন্য সহ ইংলিশ চ্যানেল পার হন, এবং ইংল্যান্ডের রাজা সেক্সনকে পরাজিত করেন। ওই সময় থেকে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড তাদের নিজেদের রাজ্যের সীমানা জনিত বিবাদ নিয়ে

ইংল্যান্ডের বর্তমান রাণী প্রথম উইলিয়ামের বংশধর।

Hever Castle,
ইংল্যান্ড, ত্রয়োদশ শতাব্দী

নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। প্রথম উইলিয়াম জমি জরিপ করিয়েছিলেন এবং সেই জমি নর্মান অভিজাত সম্প্রদায় যারা তাঁর সঙ্গে এই দেশে প্রব্রজন করে এসেছিলেন তাদের ১৮০ জনকে বিলি বন্টন করে দেন। জমিদারেরা রাজার মুখ্য রায়ত ছিলেন এবং আশা করা হত যে প্রয়োজনে তারা রাজাকে সামরিক সাহায্য, প্রদান করবেন। তারা রাজাকে তাদের কিছু সংখ্যক নাইট (knight অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশীয় যোদ্ধা) প্রদান করেছিলেন। তারা (জমিদার) তাদের রাজাকে সেবা করতেন। তারা অবশ্য ব্যক্তিগত যুদ্ধবিগ্রহে নাইটদের সাহায্য নিতে পারতেন না কারণ, ইংল্যান্ডে তা বিধি বহির্ভূত ছিল। এ্যাঙ্গলো সেক্সন কৃষকেরা জমিদারদের রায়ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

প্রথম দুটি ক্রমে সদস্যরা সামাজিক প্রথাকে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করলেও অনেকগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক নিয়মগুলো বদলাতে শুরু করেছিল। তারমধ্যে কয়েকটি প্রক্রিয়া হল ধীরে ধীরে পরিবেশ এবং কৃষি প্রযুক্তি ও জমি ব্যবহারের পরিবর্তনশীলতা। ওই পরিবর্তনগুলো আবার জমিদার এবং প্রজাদের মধ্যে আর্থসামাজিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলেছিল। কিভাবে এই প্রভাব পড়েছিল এক এক করে নীচে তা আলোচনা করা হল ঃ

পরিবেশ ঃ

পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ফলে কৃষির জন্য পর্যাপ্ত জমি ছিল না এবং কৃষকেরা তাদের পরিস্থিতির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অত্যাচার থেকে বাঁচতে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিত। এই সময় ইউরোপে প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ চলছিল এবং শীতকাল প্রলম্বিত হয়ে পড়েছিল ও শস্য উৎপাদনের সময়কাল অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল। ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছিল।

একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে তাপমাত্রার পরিবর্তন হল। তাপমাত্রা বাড়ল যা কৃষিকাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। কৃষকরা এরফলে সুদীর্ঘ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় পেল এবং মাটি বরফ মুক্ত হওয়ার ফলে জমিকর্ষণের সুবিধা বাড়ল। ঐতিহাসিকেরা যাঁরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে ইউরোপের অনেক জায়গায়ই জঙ্গলের পরিধি কমা শুরু হয়েছিল। যার ফলে কৃষিজমির পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

ভূমির উপকারিতা

প্রথম দিকে কৃষি প্রযুক্তি মোটেই উন্নত ছিল না। সেই সময় একজন কৃষক যে যান্ত্রিক সাহায্য পেত সেটা হল একটি কাঠের হাল, যা আবার এক জোড়া বলদ দিয়ে চালাতে হত। ওই হাল দিয়ে বড় জোর ভূমির উপরের অংশকেই কর্ষণ করা যেত, যার ফলে ভূমির প্রকৃত উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেত না। ফলস্বরূপ কৃষিকাজ অত্যন্ত শ্রম নির্ভর হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় অন্তত চার বছরে একবার জমি হাতি দিয়ে খনন করতে হত, যার জন্য অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হত। আবর্তনমূলক শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়াও নিষ্ফল হয়েছিল। জমিকে দু'ভাগে ভাগ করা হত। এভাবে শরৎ থেকে শীত ঋতুতে গম চাষ করা হত এর অন্য ভাগে কিছুই চাষ করা হত না, জমি খালি রেখে দেওয়া হত। পরের বছর ওই খালি জমিতে

রাই ফলানো হত এবং অন্য ভাগ খালি রেখে দেওয়া হত। এই প্রক্রিয়ায় জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে জনসাধারণকে প্রতি বছর হয় দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি, নয়ত ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হত। ফলে দুঃস্থ জনগণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল।

এতসব কষ্টকর পরিস্থিতি সত্ত্বেও জমিদারেরা সর্বাদই তাদের রোজগার বাড়ানোর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। যেহেতু কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না, কৃষকেরা বাধ্য হত জমিদারের খাস খামারের সমস্ত জমি চাষ করতে। এর ফলে তাদের কতটুকু সময় কাজ করা দরকার তার চাইতে অনেক বেশি সময় তাদের কাজ করতে হত। কৃষকেরা অবশ্য নীরবে অত্যাচার মাথা পেতে নিত না। যেহেতু তারা খোলাখুলি প্রতিবাদ করতে পারত না, তারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলত। তারা নিজেদের জমি চাষ করতেই বেশি সচেষ্ট থাকত এবং ওই পরিশ্রমের ফসলের অধিকাংশই তারা নিজেরা ভোগ করত। শুধু তাই নয়, তারা বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কাজ করতে চাইত না। গোচারণ ভূমি ও বনভূমির কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের সঙ্গে জমিদারদের প্রায়ই সংঘর্ষ বেধে যেত। তারা চাইত যে ওইসব জমি সমস্ত প্রজাদের উপকারে লাগুক। কিন্তু জমিদারেরা ওই জমিগুলোকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন।

নতুন কৃষি পদ্ধতি ঃ

একাদশ শতাব্দী নাগাদ কৃষি কাজে প্রযুক্তিগত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কাঠের তৈরি হালের পরিবর্তে কৃষকরা লোহার ভারি এবং চোখা হাল এবং mould board ব্যবহার করতে শুরু করল। ওই ধরনের হাল দিয়ে তারা জমিকে গভীরভাবে খনন করতে পারত এবং mould board দিয়ে খুব সহজেই জমির উপরের অংশকে সরিয়ে দিতে পারত। ওই পদ্ধতিতে জমির উর্বরতা বেড়ে গিয়েছিল।

জমি চাষ করার সময় পশুদের কাজে লাগানোর পদ্ধতিটাও উন্নত করা হয়েছিল। পশুর ঘাড়ের পরিবর্তে তাদের কাঁধকে কাজে লাগিয়ে চাষ করা শুরু হয়েছিল। এরফলে পশুদের কাজ করার শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। সেই সময় ঘোড়ার নালও (shod) আগের তুলনায় উন্নততর হয়ে উঠেছিল। ঘোড়ার পায়ের নীচে কোনো ক্ষতি হত না। বায়ু এবং জল থেকে উৎপাদিত শক্তি বেশি করে কৃষি কাজে লাগানো শুরু হয়েছিল। জল ও বায়ু নির্ভর বিদ্যুতের মাধ্যমে ইউরোপে অনেকগুলি শস্য ও আঙ্গুর মাড়াই কারখানা গড়ে উঠেছিল।

জমিকে কাজে লাগাবার পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে জমিকে দু'ফসলা থেকে তিন ফসলায় রূপান্তরিত করা। এর ফলে কৃষকেরা একই জমিতে শস্যের ফলন পরিবর্তনের মাধ্যমে তিন বছরের ফসল দু বছরেই ফলাতে পারত— একটি শস্য শরতে ফলালে অন্যটি ফলাত বছর দেড়েক বাদে বসন্তকালে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে কৃষকরা তাদের নিজস্ব জমিকে তিন ভাগে ভাগ করে নিত। মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্যে শরৎকালে জমির এক অংশে গম বা রাই চাষ করা হত। জমির দ্বিতীয় অংশে বসন্তকালে মানুষের খাদ্যের জন্য ফলানো হত মটরশুটি, বরবটি ও মুসুরডাল এবং ঘোড়াদের জন্য ফলানো হত ওটস (Oats) ও বার্লি। জমির তৃতীয় অংশকে খালি রেখে দেওয়া হত। এভাবে প্রতি বছরই তিনটি অংশে ফলন-আবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত।

এই ধরনের উন্নতির ফলে তাৎক্ষণিকভাবে জমির প্রতিটি অংশ থেকে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

পেল। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পেল। খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ শুধু বাড়লই না, দ্বিগুণ হয়ে গেল। মটরসুটি ও বরবটি জাতীয় সব্জি অধিক ফলনের ফলে ইউরোপীয়দের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং পশুখাদ্যের মানও বৃদ্ধি পেল। কৃষকদের পক্ষে এই পরিস্থিতি খুবই সন্তোষজনক হয়ে উঠল। তারা ক্রমশ কম জমি থেকে বেশি খাদ্যোৎপাদন করতে পারল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক একজন কৃষকের জমির গড় পরিমাপ ১০০ একর থেকে নেমে ২০/৩০ একরে এসে দাঁড়াল। ছোট ছোট জমিতে শুধু যে উন্নত ধরনের চাষবাস করা সম্ভব হল তাই নয়,পরিশ্রমও অনেক কমে গেল যার ফলে কৃষকেরা অন্যান্য কাজকর্ম করারও সুযোগ পেল।

অবশ্য কিছু কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তন খুব ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষকদের এত অর্থ ছিল না যে তারা প্রয়োজনীয় জলচালিত বা বায়ুচালিত কল স্থাপন করে। তাই জমিদাররাই এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করল। তবে কৃষকেরা অন্যান্য কিছু ব্যাপারে যেমন চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিল। তারা জমির তিনটি অংশে ফলন আবর্তন পদ্ধতিকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করল এবং গ্রামগুলোতে অনেকগুলো কামারশালা গড়ে তুলল যেখানে খুব সস্তায় লোহার হালের এবং ঘোড়ার নালের মেরামত করা সম্ভব।

একাদশ শতাব্দী থেকে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিগত অঙ্গীকার, দুর্বল হতে শুরু করল। কেননা লেনদেন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে অর্থ নির্ভর হয়ে উঠেছিল। জমিদারদের কাছে সেবার চেয়ে খাজনা প্রাপ্তির ব্যাপারে নগদ অর্থই বেশি সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল। কৃষকেরাও তাদের ফসল অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি না করে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো ব্যবসায়িদের কাছে বিক্রয় করা শুরু করলেন। ব্যবসায়িরা আবার ওই দ্রব্যগুলো বিক্রয়ের জন্য শহরে বয়ে নিয়ে যেতেন। নগদ অর্থের বহুল ব্যবহার দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। ফলে কোনো বছর ফসল কম হলে তার বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পেত। উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যান্ডে ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থ শ্রেণী নতুন শহর ও শহরে জনগণ

কৃষির বিস্তৃতিকে সঙ্গী করে উন্নয়ন ঘটেছিল আরও তিনটি ক্ষেত্রে, যথা - লোক সংখ্যা, ব্যবসা ও শহর। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে আণুমানিক জনসংখ্যা ৪২ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ৬২ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল এবং ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তা বেড়ে ৭৩ মিলিয়ন হয়েছিল। উন্নত খাদ্য দ্রব্য মানুষের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। এয়োদশ শতাব্দী নাগাদ একজন ইউরোপীয় অষ্টম শতাব্দীর একজন মানুষের আয়ুষ্কাল থেকে গড়ে অন্তত দশ বছর বেশি বাঁচবে সেই আশা করত। পুরুষেরা মহিলাদের তুলনায় উন্নত মানের খাদ্য গ্রহণ করত বলে মহিলাদের আয়ু পুরুষদের তুলনায় কম ছিল।

রোমান সাম্রাজের পতনের পর সেই দেশের শহর গুলি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দী থেকে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা মানুষের জীবন মান বাড়িয়ে দিল। ফলে শহর গুলো আবার জেগে উঠল। যে সব কৃষকদের বিক্রয়ের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য থাকত তাদের শস্য বিক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি এবং কাপড় চোপড় কিনতে পারার মত একটি বিক্রয় কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। নিয়মিত ব্যবধানে মেলার যেমন প্রচলন হল তেমনি ছোট ছোট ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রও স্থাপিত হল যা ধীরে ধীরে সেই সব বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করল যা পরবর্তীতে শহরের রূপ নিল। সেই বৈশিষ্ট্য গুলো হচ্ছে. একটি চার্চ, রাস্তাঘাট, দোকান-পাট, বাড়িঘর এবং একটি অফিস যেখানে থেকে শহরের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। অন্যান্য স্থানে শহর গড়ে উঠেছিল বড় বড় প্রাসাদ বা দূর্গ, বিশপের ভূ-সম্পতি বা

Reims, French cathedrat-town, seventeenth-century map.

ACTIVITY 3

Look carefully at this map and the drawing of a town. What would you notice as special features of medieval European towns? How were they different from towns in other places and other periods of time?

বড় বড় চার্চ গুলো ঘিরে।

শহর গুলোতে জমিদারদের জমিতে বসবাস করার বিনিময়ে অতীতে জনগন নানা সেবা প্রদান করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওই সেবার পরিবর্তে জমিদারদের খাজনা বাবদ অর্থ প্রদান করা হত। শহরে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার রীতি চালু হল, যার ফলে কৃষক পরিবারের যুবকরা জমিদারের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেল।

একটি জনপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে যে Town air makes free। ভূমি দাসদের অনেকেই যারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইত তারা শহরে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। যদি একজন ভূমি দাস শহরে গিয়ে এক বছর একদিন লুকিয়ে থাকতে পারত তাহলে সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেত। শহর গুলোতে অনেক লোকের মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্ত কৃষকরা বসবাস করত যারা পরবর্তীতে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হল। পরবর্তীতে ব্যঙ্ক মালিক ও আইন জীবির মত সুদক্ষ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বড় বড় শহর গুলোর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০,০০০ এর মত। একটি শহরের এই বিশাল জনসংখ্যাকে চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

অর্থনৈতিক একটি সংগঠনের ভিত্তিই হচ্ছে একটি সংঘ বা সমাজ। প্রতিটি শিল্পই রূপান্তরিত হত একটি সমাজ ব্যবস্থায় যে ব্যবস্থা উৎপাদিত দ্রব্যের গুণাগুণ, তার মূল্য এবং বিক্রয় প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করত। সংঘ গৃহ ('guild-hall') ছিল একটি শহরের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। ওই ঘর উৎসব গৃহ হিসেবে চিহ্নিত হত এবং সেখানে প্রতিটি শিল্প সংগঠনের কর্তারা সভা করার জন্য নিয়মিত মিলিত হতেন। প্রহরীরা শহরের চর্তুদিকে পাহারা দিত, ভোজ সভা ও সুশীল সমাজের শোভা যাত্রায় সঙ্গীত শিল্পীরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করত এবং সরাইখানার মালিকরা অতিথিদের প্রতি বিশেষ নজর দিত।

একাদশ শতাব্দী নাগাদ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে একটি নতুন বাণিজ্যিক পথের সৃষ্টি হল। পশুচর্ম ও শিকারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সহ স্কেণ্ডিনেভিয়ার ব্যবসায়ীরা উত্তর সাগর হয়ে দক্ষিণ দিকে সমুদ্র

পাড়ি দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ সমস্ত জিনিষের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় সংগ্রহ করা।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা টিন বিক্রয় করতে এগিয়ে এসেছিল। ফ্রান্সে দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ বাণিজ্য এবং কারু শিল্পের প্রচলন ঘটেছিল। ইতি পূর্বে কারুশিল্পীরা জমিদারদের খামার থেকে খামারে ঘুরে বেড়াত পরবর্তীতে তারা এটা বুঝতে পারল যে এইভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে এক জায়গায় থিতু হয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। যেহেতু শহরের সংখ্যা বেড়েই যেতে লাগল এবং ব্যবসা বাণিজ্যির বিস্তার ঘটল, শহরের ব্যবসায়ীরা এতটা ধনবান এবং শক্তিশালী হয়ে উঠল যে তারা অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তিকে তাদের প্রতিপক্ষ রূপে চিহ্নিত করল।

ক্যাথিড্রাল শহর

ধনী ব্যবসায়ীদের খরচের নমুনা থেকে জানা যায় যে তারা চার্চে ও দান দক্ষিণা করত। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্সে ক্যাথিড্রাল নামে পরিচিত বড় বড় চার্চ তৈরি হতে থাকল। ওই বড় বড় চার্চ গুলো মঠ (monastery) এর অধীনে চলছিল। তবে নানা ধরনের মানুষ চার্চগুলোর নির্মাণ কার্যে সহায়তা করেছিল শ্রম, দ্রব্য সামগ্রী অথবা অর্থ দিয়ে। ক্যাথিড্রালগুলো পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যা সম্পূর্ণ করতে অনেক বছর লেগেছিল। যখন ওই চার্চ গুলো তৈরি হচ্ছিল সেই সময় ওই চার্চ গুলোর চতুর্দিকে ঘন বসতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং চার্চগুলোর সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওইগুলি তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হল। সুতরাং ছোট ছোট শহর গুলো এই চার্চ গুলোকে ঘিরেই সৃষ্টি হল।

ক্যাথিড্র্যালগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে একজন যাজকের গলার স্বর হলের চারদিকে বসে থাকা জনগণ ভালভাবে শুনতে পান, সন্ন্যাসীদের সঙ্গীত ও যেন সুন্দর ভাবে শোনা যায়, চার্চের ঘণ্টার ঐকতান ধ্বনি যা জনগণকে প্রার্থনা করতে আহ্বান জানায় তা অনেক দূর থেকে ও শ্রুতি গোচর হয়। জানালায় রঙীন কাঁচ লাগানো থাকত। দিনের বেলা সূর্য্যরশ্মি প্রার্থনারত ভক্তদের মুখমণ্ডল আলোকিত করে রাখত। সূর্য্যাস্তের পরে মোমবাতির আলো বাইরের লোকদের কাছে দৃশ্যমান হত। জানালার রঙীন কাঁচে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে অশিক্ষিত লোকদের পড়বার উপযোগী করে গল্পের বর্ণনা থাকত।

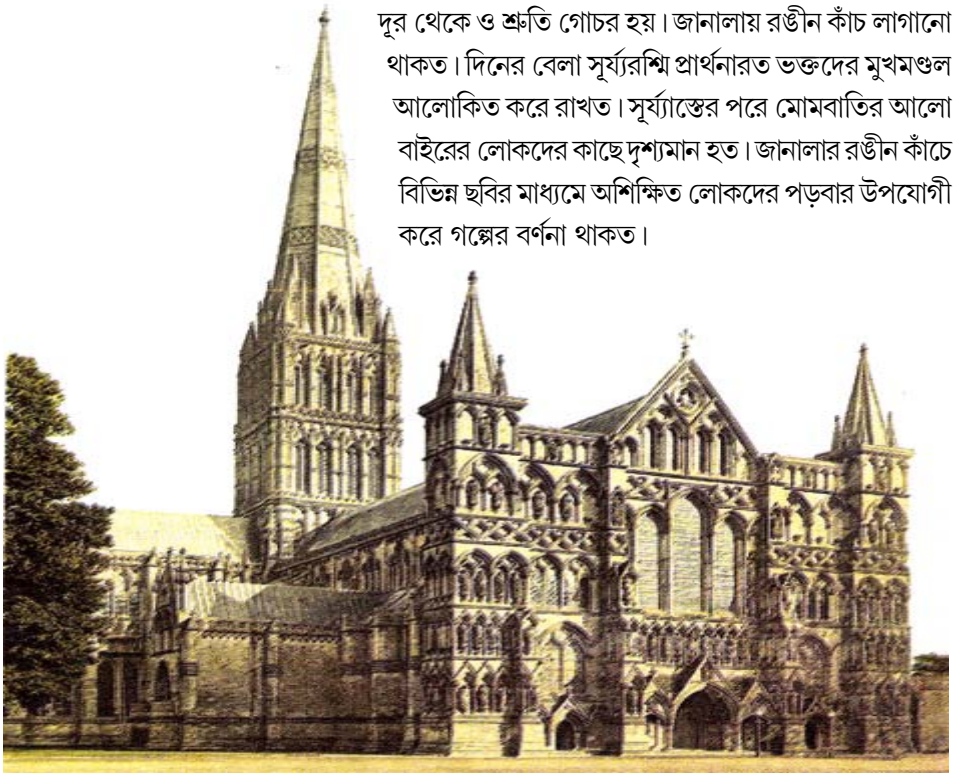

সেনিসবারী কেথেড্রল, ইংল্যান্ড

"Become of the inadequacy which we often felt on feast days, for the narrowness of the place forced the women to run towards the altar upon the heads of the men with much anguish and noisy confusion, [we decided] to enlarge and amplify the noble church...

We also caused to be painted, by the exquisite hands of many masters from different regions, a splendid variety of new windows... Because these windows are very valuable on account of their wonderful execution and the profuse expenditure of painted glass and sapphire glass, we appointed an official master craftsman for their protection, and also a goldsmith...who would receive their allowances, namely, coins from the altar and flour from the common storehouse of the brethren, and who would never neglect their duty, to look after these [works of art].'

— প্যারিসের নিকটবর্তী অ্যাবে অব সেন্টডেনিস সম্বন্ধে অ্যাবট সুগার (১০৮১-১১৫১)।

Stained-glass window, Chartres cathefral, France, fifteenth century.

চর্তুদশ শতাব্দীর সঙ্কট (The crisis of the Fourteenth Century) ঃ

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার অনেকটা কমে গিয়েছিল। এর তিনটি কারণ ছিল।

উত্তর ইউরোপে এয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ববর্তী ৩০০ বছরের তপ্ত গ্রীষ্ম কালের বদলে দেখা দিয়েছিল হাঁড় কাঁপানো ঠাণ্ডার গ্রীষ্মকাল। ফলে শস্য উৎপাদনের সময় একমাস কমে গিয়েছিল এবং উঁচু জমিতে চাষ করা ও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক বন্যা অনেক গোলা বাড়িকে ধ্বংস করে ফেলেছিল, ফলে খাজনা হিসেবে প্রাপ্য সরকারের আয় অনেকটা কমে গিয়েছিল। এয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের অনুকূল আবহাওয়া ব্যাপক হারে বন ও চারণ ভূমিকে কৃষির আওতায় আনতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একটি কৃষি জমির উপর অত্যধিক চাপ জমির উর্বরতা নষ্ট করে ফেলেছিল, যদি ও কৃষির আবর্তন প্রক্রিয়া চালু ছিল। কারণ এই পদ্ধতি চালু করা হলে ও ভূমিক্ষয় রোধের চেষ্টা করা হয়নি চারণ ভূমির পরিধি কমে যাওয়ায় গবাদি পশুর সংখ্যা ও কমে গিয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পদ বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, যার তাৎক্ষণিক পরিণাম স্বরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ১৩১৫-১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাকে অনুসরণ করেই ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে দেখা দিল গবাদি পশুর মড়ক।

অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার খনিগুলোতে রূপার উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে যে ধাতু মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলোর সরকার তাদের মুদ্রায় রূপার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে তাতে সস্তা ধাতু ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

চরম মন্দ অবস্থার তখনও কিছুটা বাকী ছিল। এয়োদশ ও চর্তুদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যের যখন বিস্তার হচ্ছিল তখন দূরবর্তী দেশগুলো থেকে বয়ে আনা দ্র ব্যাদি নিয়ে জাহাজ গুলো ইউরোপের বন্দর গুলোতে এসে পৌঁছুতে শুরু করল। জাহাজ গুলোর সঙ্গে আর যা এল তা হল মারাত্মক প্লেগ রোগ সৃষ্টিকারী ইদুঁরের পাল। যে পশ্চিম ইউরোপ বিগত শতাব্দীগুলোতে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল ১৩৪৭ এবং ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ওই অঞ্চল মহামারির কবলে পড়েছিল। একটি আনুমানবিক হিসেবে দেখা যায় যে প্লেগ মহামারিতে সেই সময় ইউরোপের ২০% লোকই প্রাণ হারিয়েছিল। কোনো কোনো জায়গায় সেই সংখ্যা বেড়ে ৪০% (চল্লিশ) এ ও পৌঁছেছিল।

"How many valiant men, how many fair ladies, (had) breakfast with their kinfolk and the same night supped with their ancestors in the next world! The condition of the people was pitiable to behold. they sickened by the thousands daily, and died unattended and without help. Many died in the open street, others dying in their houses, made it known by the stench of their rotting bodies. Consecrated churchyards did not suffice for the burial of the vast multitude of bodies, which were heaped by the hundreds in vast trenches, like goods in a ships hold and covered with a little earth"

— ইটালিয়ান লেখক জিওবানি বোকাশিও (১৩১৩-১৩৭৫)।

ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে নগর গুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের মঠ বা আশ্রম গুলোতে যেখানে এক সঙ্গে সবাই কাছাকাছি থাকতেন, সেখানে একজন কেউ যখন প্লেগে আক্রান্ত হতেন তখন সেই সঙ্গে বাকী সবাই আক্রান্ত হয়ে পড়তেন। দেখা গেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রান্তদের প্রায় কেউই বাঁচতেন না। চতুর্দশ শতাব্দীর ৬০ এবং ৭০ এর দশকে (১৩৬০ --- ১৩৭০) বেশ কয়েক বার প্লেগ রোগের প্রার্দুভাব ঘটেছিল। ইউরোপের জনসংখ্যা ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে যেখানে ছিল ৭৩ মিলিয়ন, তা ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে নেমে দাঁড়ায় ৪৫ মিলিয়ন।

এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির, সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কট মিলে অশেষ সামাজিক দুরবস্থার সৃষ্টি করেছিল। লোক ক্ষয়ের ফলে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছিল। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ওই দুটো স্থলে সমভাবে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক ছিল না। জনসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে দ্রব্যাদির চাহিদা ও কমে, যার ফলে কৃষি পণ্যের দাম পড়ে যায়। অন্য দিকে শ্রমিকের মজু রি বৃদ্ধি পায় কারণ শ্রমিকের চাহিদা, বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা। প্লেগ মহামারি উত্তর ইংল্যান্ডে ২৫০% বেড়ে যায়। ফলে জীবিত শ্রমিকদের মজুরীর চাহিদা পূর্বের মজুরীর তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

সামাজিক অস্থিরতা

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্যে জমিদারদের আয় মাত্রাতিরিক্ত ভাবে কমে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে মরিয়া হয়ে জমিদাররা পূর্ববর্তী চুক্তিগুলো পরিত্যাগ করে নতুন শ্রমিক নীতি গঠন করলেন। কৃষকেরা, বিশেষ করে শিক্ষিত এবং তুলনামূলক ভাবে সমৃদ্ধশালী কৃষকেরা এই ব্যবস্থার প্রবল বিরোধীতা শুরু করল। ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্লেন্ডারসে, ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যন্ডে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

এই বিদ্রোহকে খুব কঠোর হস্তে দমন করা হলেও এটা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ যে যেখানে সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালু ছিল যে সব জায়গায় এ বিদ্রোহ খুব ভয়ানক আকার ধারণ করল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষকেরা তাদের বিগত শতাব্দী থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক প্রগতির ধারাকে ধরে রাখতে চাইছিল। চূড়ান্ত অত্যাচার সত্বে ও তারা এমন ভাবে বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে লাগল যাতে পুরোনো সামন্ত প্রথা জনিত পরিস্থিতির উদ্ভব আর কখনও না হয়। অর্থনীতিতে আর্থিক লেনদেন প্রথা এতটাই উন্নত হয়ে উঠেছিল যে তাকে পাল্টানোর কথা চিন্তা ও করা যায় নি। জমিদাররা বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হলেও তাঁরা সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধাগুলো যাতে আর ফিরে না পান, কৃষকরা অন্তত সেই ব্যবস্থা করতে পেরেছিল।

একাদশ থেকে এয়োদশ শতাব্দী	
১০৬৬	নর্মানরা অ্যাঙ্গলো স্যাক্সনদের পরাজিত করল এবং ইংল্যান্ড অধিকার করল।
১১০০ ও তৎপরবর্তী কাল	ফ্রান্সে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করার কাজ শুরু হল।
১৩১৫-১৭	ইংল্যান্ডের ভয়বহ দুর্ভিক্ষ
১৩৪৭-৫০	ব্ল্যাক ডেথ
১৩৩৮-১৪৬১	ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষীয় যুদ্ধ
১৩৮১	কৃষক বিদ্রোহ

কার্যক্রম - ৪
মন-তারিখ সহ ঘটনা গুলো পড় এবং যথাযথ বর্ণনা কর।

রাজনৈতিক পরিবর্তন (Political Changes) ঃ

সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনা গুলোর একটি যোগাযোগ রয়েছে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের নৃপতিরা তাঁদের সামরিক এবং আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁরা যে শক্তিশালী নতুন নতুন রাজ্যের সৃষ্টি করেছিলেন তা ইউরোপের অর্থনৈতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মতই তাৎপর্য্য পূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকেরা তাই ওই নৃপতিদের 'নতুন নৃপতি গোষ্ঠী'র (the new monarchs) নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ফ্রান্সের লুই একাদশ, অষ্ট্রিয়ার ম্যাক্সিমিলিয়ান, ইংল্যান্ডের সপ্তম হেনরি, স্পেন এর ইসাবেল ও ফার্ডিনান্ড - যাঁদের বলা হত স্বৈরতান্ত্রিক শাসক তাঁরা সৈন্য বাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করার এবং স্থায়ী আমলাতন্ত্র ও জাতীয় কর ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। স্পেন ও পর্তুগালের শাসকেরা ইউরোপের বাইরে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন।

Queen Elizabeth I of England at a picnic, late sixteenth century.

দ্বাদশ এবং এয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়াই সম্রাটদের জয় যাত্রার প্রধান কারণ। জমিদারদের সামন্ততন্ত্র ও দাস প্রথার পতন, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধীর গতি নৃপতিদের তাদের শক্তিশালী এবং সাধারণ প্রজাদের উপর প্রভাব বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছিল। শাসকেরা যেমন - একদিকে তাদের সামরিক প্রয়োজনে সামন্ততান্ত্রিক কর ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে পেশাদারী প্রশিক্ষিত বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যও গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই সঙ্গে গোলন্দাজ সৈন্য বিভাগকে সরাসরি তাদের নিজেদের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন। যথেষ্ট ক্ষমতায় বলিয়ান নৃপতিদের সামনে অভিজাত সম্প্রদায়ের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সমস্ত প্রয়াসই ভেঙ্গে পড়েছিল।

নতুন সাম্রাজ্য	
১৪৬১-১৫৫৯	ফ্রান্সের নতুন সম্রাটগণ
১৪৭৪-১৫৫৬	স্পেনের নতুন সম্রাটগণ
১৪৮৫-১৫৪৭	ইংল্যান্ডের নতুন সম্রাটগণ

বৃহত্তর সৈন্য প্রতিপালন করার প্রয়োজনে কর আরোপ করে সম্রাটরা তাঁদের মোট রাজস্বে পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনো আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ খুব একটা সহজ কাজ ছিল না, কেন না অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এই প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন। নতুন কর ব্যবস্থার বিরোধিতা করে জনগণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। ইংল্যান্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে ও ১৪৯৭, ১৫৩৬, ১৫৪৭, ১৫৪৯ এবং ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বার বার সেই বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছিল। ফ্রান্সে ডিউক এবং অন্যান্য রাজকুমারদের (Dukes and princes) বিরুদ্ধে একাদশ লুই (১৪৬১-১৪৮৩) কে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে কম কুলীন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা (lesser nobler) যাঁরা কোনো কোনো সময় স্থানীয় সভা সমিতি গুলোর সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁরা রাজ পরিবারের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াসের বিরোধিতা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে যে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার মূলে ছিল রাজতান্ত্রিক অধিকার ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার টানা-পোড়েন।

Nemours Castle, France, fifteenth century.

অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা টিকে থাকার অগিদে তাঁদের নীতির খানিকটা পরিবর্তন কৌশলগত কারণে মেনে নিয়েছিলেন। নতুন শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করার প্রয়াস ত্যাগ করে তারা রাতারাতি ওই শাসনতন্ত্রের অনুগত হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্রের একটি নতুন রূপ হিসেবে অভিহিত করা হত। সংক্ষেপে একই শ্রেণির মানুষ যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং যাঁদের Lord বা প্রভু বলে সম্বোধন করা হ ত, তাঁরাই রাজনৈতিক স্তরে প্রভুত্ব করে যেতে লাগলেন। প্রশাসনিক কাজে তাদেরকে স্থায়ী পদে বসানো হয়েছিল। তবে এই নতুন ব্যবস্থা কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ছিল একটি ভিন্ন ধাঁচের।

সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ও নির্ভর তার কেন্দ্র হিসেবে রাজার যে শীর্ষ অবস্থান ছিল, সেখান থেকে তার চ্যুতি ঘটল। একটি বিশদ সভাসদ সংগঠন ও প্রাপক পৃষ্ঠ পোষকের যে সম্পর্ক, রাজারা তার মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। দুর্বল কিংবা শক্তিশালী, সব রাজতন্ত্রেই প্রয়োজন ছিল প্রভাবশালী লোকেদের সাহায্য ও সহযোগিতা। পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল ওই সহযোগিতা পাওয়ার সহজ উপায়। আর এই পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া বা পাওয়া যেত অর্থ লেন দেনের মাধ্যমে। অতএব, অভিজাত সম্প্রদায়ের বাইরের লোকেরা ও যেমন ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিকগণ অর্থের বিনিময়ে রাজদরবারে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যেত। তারা সম্রাটকে ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করত, এবং ওই অর্থ দিয়ে সম্রাটরা তাঁদের সৈন্যদের মাসোহারা দিতেন। শাসকেরা তাঁদের শাসন প্রণালীতে এমন সব উপাদান রেখেছিলেন যেগুলোকে অসামন্ততান্ত্রিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের পরবর্তী ইতিহাস উপরোক্ত শাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের নাবালক রাজা এয়োদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফরাসী পরামর্শদাতাদের সভা (French consultative assembly) বসেছিল, যে সভা Estates-general (যে সভায় তিন শ্রেণির লোকই যোগদান করেছিলেন, যথা - যাজক, অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যান্যরা) নামে খ্যাত। নৃপতিরা ওই তিন শ্রেণির লোকদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাননি বলে পরবর্তীতে ১৭৮৯ খ্রিঃ পর্য্যন্ত এই ধরনের আর কোন সভা আহ্বান করা হয় নি।

ইংল্যান্ডে কিন্তু অন্য রকম ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি নর্মান জয়ের আগে ও এ্যঙ্গলো স্যাক্সনদের একটি বড় পরিষদ (great council) গঠন করা হয়েছিল, যে পরিষদের সঙ্গে নৃপতিরা যে কোনো কর আরোপ করার পূর্বে পরামর্শ করতে বাধ্য থাকতেন। এই ভাবেই ওই দেশে সংসদ বা Parliament এর সৃষ্টি হল, যা দুটি ভাগে বা House এ বিভক্ত। একটির নাম House of Lords যার সদস্যরা ছিলেন জমিদার ও যাজক সম্প্রদায় ভুক্ত লোক। অপরটির নাম House of Commons, যার সদস্যরা শহর এবং গ্রাম থেকে নির্বাচিত হতেন। রাজা প্রথম চার্লস পার্লামেন্টের সভা না ডেকেই এগারো বছর (1629-40) দেশ শাসন করেছিলেন। শাসন ব্যবস্থার আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে রাজা যখন পার্লামেন্টের সভা বসাতে বাধ্য হলেন, তখন পার্লামেন্টের কিছু সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পরে তাঁকে বধ করে দেশে একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) এর সূচনা করলেন। এই ব্যবস্থা ও বেশিদিন স্থায়ী হল না। নিয়মিত পার্লামেন্টের সভা ডাকা হবে এই শর্তে রাজতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

বর্তমানে ফ্রান্সে একটা প্রজাতান্ত্রিক সরকার রয়েছে এবং ইংলন্ডে রয়েছে রাজতন্ত্র।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। ফ্রান্সের আদি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

২। জনসংখ্যাগত পরিস্থিতির প্রয়োজনে দীর্ঘকালীন পরিবর্তনের যে নীতি নেওয়া হয়েছিল তা ইউরোপের অর্থনীতি ও সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। নাইটরা কেন একটি আলাদা দলে পরিণত হয়েছিলেন? কখন তাদের পতন হল?

৪। মধ্যযুগের মঠ (monasteries) গুলোর কার্যাবলী কি ছিল?

সংক্ষেপে বিবরণ দাও ঃ

৫। মধ্যযুগের ফ্রান্সের শহরের একজন কারুশিল্পীর দৈনিক জীবনধারা বর্ণনা কর।

৬। একজন ফরাসী ভূমি দাস ও একজন রোমান ক্রীত দাসের জীবন ধারা নিয়ে তুলনা মূলক আলোচনা কর।

প্রসঙ্গ ৭

পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নানান শহর গড়ে উঠেছিল। শহরবাসীরা গ্রামবাসীদের তুলনায় নিজেদের অনেক বেশি সভ্য বলে মনে করতেন। ফ্লোরেন্স, ভেনিস এবং রোম— এই শহরগুলো কলা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা শিল্পী ও লেখকদের কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুদ্রা শিল্পের আবিষ্কারের ফলে দূরপ্রান্তের লোকের কাছেও মুদ্রিত লেখা বা বই পৌঁছে গিয়েছিল। ইউরোপে ইতিহাস চর্চারও প্রসার ঘটল এবং জনগণ তাদের বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে পৌরাণিক গ্রীক ও রোমান ইতিহাসের তুলনা করা শুরু করলেন।

এসময়ে ব্যক্তি বিশেষকে তার নিজের ধর্মমত পছন্দ করে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের দ্বারা সৌরমণ্ডল আবিষ্কারের ফলে চার্চের পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বাস নস্যাৎ হয়ে পড়ছিল। এবং ভূমধ্য সাগরই পৃথিবীর কেন্দ্র — ইউরোপ কেন্দ্রিক এই ধারণাকেও নতুন নতুন গবেষণালব্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান নস্যাৎ করে দিয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস বিষয়ে অনেক উপাদান পাওয়া যায়, যথা তথ্য, মুদ্রিত পুস্তক, রঙ্গিন চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্য্য, গৃহাদি,বস্ত্রাদি। ওই উপাদান সমূহের অনেকগুলোই ইউরোপ ও আমেরিকার আর্কাইভ, আর্টগ্যালারি ও মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ঐতিহাসিকেরা ওই সময়ের সংস্কৃতিক বিবর্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে রেনেসাঁ (আক্ষরিক অর্থে পুনর্জন্ম) শব্দটি ব্যবহার ব্যবহার করা শুরু করেন। যে ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলোর উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তিনি সুইজারল্যান্ডের বেসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের Jacob Burckhardt (১৮১৮-৯৭) । তিনি জার্মান ঐতিহাসিক Leopold von Ranke (১৭৯৫-১৮৮৬)র সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। Ranke অঙ্কে শিখিয়েছিলেন যে একজন ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্যই হচ্ছে না তথ্য ও সরকারি ফাইল ঘেঁটে নানা দেশ ও রাজনীতির ইতিহাস রচনা করা। গুরু Ranke অঙ্কে সীমিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে বলেছিলেন বলে Burckhardt অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতে, ইতিহাস লেখার ব্যাপারে রাজনীতিই সব এবং শেষ কথা নয়। ইতিহাস ততটাই সংস্কৃতি নির্ভর, যতটা রাজনীতি।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে Burckhardt "The civilization of the Renaissance in Italy." নামে একটি বই লিখেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইটালীর শহরগুলোকে নতুন মানবতাবাদী সংস্কৃতির প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য তিনি সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্রক লার প্রতি পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। লেখকের মতে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার, ও নিজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবার মতন যে পরিবেশ সৃষ্টি হল, এটাই ছিল এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে একজন ব্যক্তি মধ্যযুগীয়

ব্যক্তি বিশেষের তুলনায় নিজেদের আধুনিক বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন, কারণ তখনকার মতন এক ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা চার্চ দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

ইটালীয় শহরগুলির পুনর্জাগরণ (The Revival of Italian cities):

পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যর পতনের পর ইটালীর যে শহরগুলো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হত সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। রোমে কোনো একতাবদ্ধ (unified) সরকার ছিল না এবং রোমের পোপ যিনি তাঁর সার্বভৌম রাজ্যের কর্তা ছিলেন তিনি কোনো শক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

সামন্ততান্ত্রিক বন্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের সীমানা নতুন রূপ পেয়েছিল ও ল্যাটিন, চার্চের অধীনে একত্রিত ছিল। একই সঙ্গে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধীনে একত্রিত হয়েছিল পূর্ব ইউরোপ এবং আরও পশ্চিমে ইসলামও একটি নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। অপরদিকে, ইটালী দুর্বল এবং খণ্ডিত হয়ে পড়েছিল। তবে এই ধরনের পরিস্থিতি ইটালীয় সংস্কৃতির পুনরার্বিভাবে সাহায্য করেছিল।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এবং ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় ইটালীর উপকূলের বন্দরগুলো পুনর্জীবিত হয়ে উঠল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গোলীয়রা রেশম পথের (Silk Route) মাধ্যমে চীনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করল।পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর

Map 1: Italian States.

সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটল তাতে ইটালীর শহরগুলো প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। তারা আর নিজেদেরকে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে দেখল না, দেখল এক একটা ছোট ছোট স্বাধীন দেশ হিসেবে। তার মধ্যে ফ্লোরেন্স ও ভেনিস ছিল দুটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ এবং অন্যগুলো ছিল রাজপরিবারের সদস্যদের শাসিত ছোট ছোট রাজ্য (court cities)।

সেই সময়ের কয়েকটি উন্নত নগরের মধ্যে একটি ছিল ভেনিস, অন্যটি ছিল জেনোয়া। ওই শহরগুলি ইউরোপের অন্যান্য অংশ থেকে একটু অন্য রকম ছিল। এখানে যাজকেরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিলেন না, প্রবল ছিলেন না সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরাও। শহরগুলোর প্রশাসনের ক্ষেত্রে ধনী ব্যবসায়িরা এবং ব্যাঙ্কের মালিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন যা নাগরিকত্ব শব্দটির উদ্ভাবনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এমনকি সামরিক স্বৈরাচারিদের দ্বারা শাসনকালেও নাগরিক হিসেবে শহরবাসীদের গর্বিত মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

নগর রাষ্ট্র (The City-State)

The Commonwealth and government of venise - এ তার নগর রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার সম্বন্ধে কার্ডিনাল গ্যাসপারো (১৪৮ -১৫৪১) কন্টারিনি আলোচনা করেন

'... to came the institution of our Venetian commonwealth, the whole authority of the city ... is in that council, into which all the gentlemen of the City being once past the age of 25 years are admitted...

Now first I am to yield you a reckoning how and with what wisdom it was ordained by our ancestors, that the common people should not be admitted into this company of citizens, in chole power of the commonwealth... Because many troubles and popular tumults arise in those cities, whose government is swayed by the common people... many whre of contrary opinion, deeming that it would do well, if this manner of governing the commonwealth should rather be defined by ability and abundance of riches. Contrariwise the honest citizens, and those that are liberally brought up, oftentimes fall to poverty... Therefore our wise and prudent ancestors... ordered that this definition of the public rule should go rather by the nobility of lineage, than by the estimation of wealth : yet with that temperature [proviso], that men of chief and supreme nobility should not have this rule alone (for that would rather have been the power of a few than a commonwealth) but also every other citizen whosoever not ignobly born : so that all which were noble by birty, or ennobled by virtue, did...obtain this right of government.'

G Bellints' 'The Recovery of the Relic of the Holy Cross' was painted in 1500, to recall an event of 1370, and is set in fifteenth-century Venice.

চতুর্দশ শতাব্দী এবং পঞ্চদশ শতাব্দী	
১৩০০	ইটালীয় পাদোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবতাবাদ পড়ানো হত।
১৩৪১	রোমের Petrarch কে 'Poet Laureate' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।
১৩৪৯	ফ্লোরেন্সে বিশ্ববিদ্যলায় স্থাপন করা হয়েছিল।
১৩৯০	Geoffrey Chaucer এর Canterbury Tales প্রকাশিত হয়েছিল।
১৪৩৬	ফ্লোরেন্সে Brunelleschi Duomo- র নক্সা তৈরি করেছিলেন।
১৪৫৩	অটোমান তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপলের বাইজানটাইন শাসককে পরাজিত করেছিল।
১৪৫৪	গুটেনবার্গ চলমান হরফে বাইবেল মুদ্রিত করেছিলেন।
১৪৮৪	পর্তুগীজ গণিতজ্ঞরা সূর্যকে নিরীক্ষণ করে অক্ষাংশতা গণনা করেছিলেন।
১৪৯২	কলম্বাস আমেরিকায় পদার্পণ করলেন।
১৪৯৫	লিওনার্দো দা ভিন্সি তাঁর বিখ্যাত ছবি দ্যা লাস্ট সাপার' অঙ্কন করেছিলেন।
১৫১২	মাইকেল এঞ্জেলো Sistine Chapel ceiling ছবিটি অঙ্কন করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মানবতাবাদ ঃ

ইউরোপের আদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইটালীর শহরগুলোতে স্থাপিত হয়েছিল। পাদোয়া এবং বলগণা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি একাদশ শতাব্দী থেকে আইন শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। রোম নগরীর প্রধান জীবিকা ছিল বাণিজ্য। ব্যাপকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য কিছু নিয়মনীতি ও লিখিত চুক্তি আবশ্যিক ছিল। বাণিজ্য নগরী রোমে সেই নিয়মনীতি লিখে রাখা ও অনুবাদ করার জন্য আইনজীবী ও আইনজ্ঞদের (নোটারি সলিসিটর ও নথিলেখকদের সম্মেলন) চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য আইন একটি জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এর পরিবর্তন ঘটল। পরিবর্তন আনলেন Francesco Petrarch (১৩০৪-৭৮)। Petrarch- এর মতে, গ্রীক ও রোমানদের ইতিহাস না জানলে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই তিনি প্রাচীনকালের লেখকদের বইপত্র পড়াশোনার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত এই মতবাদ থেকে এটাই বোঝা গেল যে সেই সময়কার প্রয়োজনীয় জ্ঞান শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষা দিতে পারত না। এই সংস্কৃতিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা মানবাতবাদ আখ্যা দিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় যারা ব্যাকরণ, অলঙ্কারবিদ্যা (rhetoric), কবিতা, ইতিহাস, নৈতিক দর্শন (moral philosophy) এই বিষয়গুলি পড়াতেন তাদের মানবতাবাদী বলে আখ্যা দেওয়া হত। সংস্কৃতি শব্দটির প্রকৃত অর্থ বোঝাতে কয়েক শতাব্দী পূর্বে পণ্ডিত লিসারো (খ্রি:পূ:১০৬-৪৩) ল্যাটিন 'humanitas শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, যা থেকে humanities শব্দটির উৎপত্তি। লিসারো ছিলেন জুলিয়াস সিজারের সমসাময়িক রোমান আইনজীবী এবং প্রাবন্ধিক। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো র সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতা কিভাবে বাড়ানো যায় তার উপরে ঐ বিষয়গুলো গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

কার্যক্রম - ১

ইটালীয় ম্যাপে ভেনিসকে চিহ্নিত কর এবং **১০৫** নং পাতায় যে ছবিটি আছে সেটি ভাল করে লক্ষ্য কর। এই শহরটাকে তুমি কিভাবে বর্ণনা করবে? কোন কোন ক্ষেত্রে এই শহরটি একটি ক্যাথিড্রাল শহর থেকে ভিন্ন?

'On the dignity of man' এ ফ্লোরেন্সের মানব আবাদী জিওভানি পিকোডেলা বিতর্কের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন

'For [Plato and Aristotle] it was certain that, for the attainment of the knowledge of truth they were always seeking for themselves, nothing is better than to attend as often as possible the exercise of debate. For just as bodily energy is strengthened by gymnastic exercise, so beyond doubt in this wresting-place of leeters, as it were, energy of mind becomes far stronger and more vigorous'.

এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাগুলো অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আাকর্ষণ করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সদ্য স্থাপিত Petrarch - এর নিজের শহর ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ফ্লোরেন্স শহর ব্যবসা বাণিজ্য বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কোনো ছাপ রাখতে পারেনি। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুরো চিত্রটাই নাটকীয়ভাবে বদলে গেল। একটি শহরের নাগরিকদের যশ এবং সেখানকার ধন সম্পদই ওই শহরকে বিখ্যাত করে তোলে। ফ্লোরেন্স শহরটি বিখ্যাত হয়েছিল যাদের জন্যে তাঁরা হলেন দান্তে আলিঘিয়েরি (Dante Alighieri) (১২৬৫-

১৪৭০ সালে তৈরী ফ্লোরেন্সের ছবি

১৩২১), যিনি ধর্ম বিষয়ে লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং জিওট্টু (১২৬৭--১৩৩৭), যিনি একজন শিল্পী হিসেবে অনেক বিখ্যাত ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর আকা ছবিগুলো অন্য শিল্পীদের থেকে অনেক উন্নত এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সেই সময় থেকেই ইটালীর এই শহরটি একটি বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক চর্চার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। 'Renaissance Man' বা 'নবজাগরণের সন্তান' শব্দটি বলতে তাকেই বোঝানো হত যার বহুমুখী প্রতিভা ছিল, কেননা সেই সময় যাঁরাই বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের অনেক গুণাবলী ছিল। তাঁরা এক একজন একাধারে ছিলেন পণ্ডিত, কূটনীতিজ্ঞ এবং ধর্মতাত্বিক।

গিয়াটোর আঁকা শিশু যীশুর চিত্র, আসিসি, ইতালী

মানবতাবাদীদের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণা (The Humanist view of History)

মানবতাবাদীরা মনে করতেন যে শতাব্দী প্রাচীন অন্ধকার যুগের পরে তাঁরাই প্রকৃত সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন রোমান সাম্রাজ্যের পতন অন্ধকার যুগের সূচনা করেছিল। এর

পরবর্তী পণ্ডিতদের প্রশ্নাতীত ধারণা জন্মেছিল যে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে নতুন যুগের (new age) সূচনা হয়েছিল। মধ্যযুগ (Middle Ages'/'medieval period') বলতে ধরে নেওয়া হত রোমের পতন -পরবর্তী সহস্রাব্দকে। তারা এই বলে দাবি করতেন, মধ্যযুগে মানুষের মনের উপরে চার্চ এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে গ্রীক ও রোমানদের প্রদত্ত শিক্ষা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল। মানবতাবাদীরা 'আধুনিক কাল' বোঝাতে পঞ্চদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী সময়কেই চিহ্নিত করেছিলেন। মানবতাবাদীরা ও তৎপরবর্তী পণ্ডিতেরা 'কাল' বা সময়কে যেভাবে ভাগ করেছেন , তা হল —

পঞ্চম-চতুর্দশ শতাব্দী	মধ্যযুগ (The Middle Ages)
পঞ্চম -নবম শতাব্দী	অন্ধকার যুগ (The Dark Ages)
নবম-একাদশ শতাব্দী	আদি মধ্যযুগ (The Early Middle Ages)
একাদশ চতুর্দশ শতাব্দী	অন্তিম মধ্যযুগ (The Late Middle Ages)
পঞ্চদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কাল	আধুনিক যুগ (The Modern Age)

সম্প্রতি ঐতিহাসিকেরা কালের এই বিভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বিশদ গবেষণার ফলে ইউরোপ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। পণ্ডিতেরা এইভাবে শতাব্দীকে ভাগ করবার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কোনো একটি বিশেষ যুগকে অন্ধকার যুগ বলে বর্ণনা করাটা তার সমর্থন করেননি।

বিজ্ঞান ও দর্শন ঃ আরবদের অবদান

মধ্যযুগে গ্রীক ও রোমানদের অনেক লেখা সন্ন্যাসী ও যাজকদের কাছে সুপরিচিত ছিল কিন্তু তারা সেগুলোর বহুল প্রচার করেননি। চতুর্দশ শতাব্দীতে অনেক পণ্ডিতরা প্লেটো এবং এরিষ্টটলের মত গ্রীক লেখকদের সাহিত্য কর্ম অনুবাদ করে পড়া শুরু করলেন। এরজন্য তারা তাদের নিজেদের দেশের পণ্ডিতদের চাইতে বেশি ঋণী ছিলেন আরব অনুবাদকের কাছে। তারা সযত্নে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি (আরবী ভাষায় প্লেট ছিলেন আফ্লাতুন এবং এরিষ্টটল ছিলেন এরিষ্টু) সংরক্ষণ ও অনুবাদ করেছিলেন।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত গ্রীক সাহিত্য আরবীয় অনুবাদে পড়েছিলেন, আবার গ্রীকরাও আরবীয় এবং পারস্যের সাহিত্য অনুবাদন করেছিলেন যাতে এই অনুবাদ থেকে ইউরোপের আরও অন্য ভাষায় সেগুলো অনুবাদ করা যায়। এই কাজ যে বিষয়গুলোর উপর ছিল তা হল— সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়ন শাস্ত্র। Ptolemy র Almagest (জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর কাজ, যা ১৪০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং পরে আরবী ভাষায় অনুদিত হয়) এ আরবী শব্দ 'Al' এর ব্যবহার গ্রীকদের সঙ্গে আরবদের একটা বিশেষ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করছে। মুসলিম লেখকদের মধ্যে যারা ইটালীতে পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বুকারার একজন আরবীয় চিকিৎসক ও দার্শনিক Ibnsina এবং এই ব্যক্তিদের (ল্যাটিন ভাষার Avicenna ৯৮০-১০৩৭) নামের ইউরোপীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় encyclopaedia এর রচয়িতা al-Razi Rhazis - বানান দেখে পরবর্তী অনেকেই ভেবেছিলেন এরা ইউরোপীয়হ্ল স্পেনের একজন আরবী দার্শনিক (Ibu Rushd) ল্যাটিন ভাষায় Averroes ১১২৬- ৯৮) চেষ্টা করেছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে যে টানাপোড়েন রয়েছে তার মীমাংসা করতে। খ্রিস্টান চিন্তাবিদরা তাঁর এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

ওই সময়ে স্কুলগুলো শুধু ছেলেদের পড়াশোনার জন্য ছিল

মানবতাবাদীরা নানাভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছিলেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে আইন, চিকিৎসা ও ধর্মতত্ত্বই বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছিল, স্কুলে মানবতাবাদ বিষয়ক পাঠও ধীরে ধীরে

ঢুকে পড়েছিল এবং তা হয়েছিল শুধু ইটালীতে নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও।

শিল্পী ও বস্তু তন্ত্রবাদ ঃ

মানবতাবাদীরা মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতে শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপর নির্ভর করেননি, তারা লক্ষ্য করেছেন যে শিল্প, স্থাপত্য এবং পুস্তক এই তিনটি উপাদান মানুষের মনের রূপান্তর ঘটাতে চমৎকার কাজ করে।

'Art' is embedded in nature; he who can extract it, has it... Moreover, you may demonstrate much of your work by geometry. The more colsely your work abides by life in its form, so much the better will it appear... No man shall ever be able to make a beautiful figure out of his own imagination unless he has well stored his mind by much copying from life.'

— ডুরের (১৪৭১-১৫২৮)

ডুরের কর্তৃক অঙ্কিত এই ছবিটি (কর জোড়) থেকে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারি, যখন মানুষ গভীরভাবে ধার্মিক জীবন যাপন করত, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে, মানুষই পারে পূর্ণতা অর্জন করতে এবং এই পৃথিবী ও বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রহস্যের জট খুলতে।

'Praying Hands', brush drawing by Durer, 1508

শিল্পীরা অতীতের কাজগুলো দেখে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি যেমন মানুষের উৎসাহ ছিল,তেমনি উৎসাহ ছিল রোমান সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের উপরেও। রোমের পতনের সহস্র বছর পরে প্রাচীণ রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এবং অন্যান্য জনহীন শহরগুলোতে শিল্পকর্মের নানা নির্দর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পূর্বে পুরুষ ও মহিলাদের এত সুন্দর ভাস্কর্য দেখে ইটালীয় ভাস্কররা সেই ধরনের শিল্প কর্মের অনুসারী হতে চাইলেন। ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে জীবন্ত মূর্তি গড়ে Donatello (১৩৮৫-১৪৬৬) নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। বিজ্ঞানীদের কর্মপ্রক্রিয়া শিল্পীদের সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করেছিল। মানবদেহে হাড়ের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে জানবার জন্য শিল্পীদের চিকিৎসা স্থলের গবেষণাগারেও কাজ করতে হয়েছিল। বেলজিয়ামের অধিবাসী এবং ওই দেশের পাদোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক Andreas Vesalius (১৫১৪-৬৪) চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। এখান থেকেই আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের সূচনা হয়।

'The Pieta' by MIchelangelo depicts Mary holding the body of Jesus.

চিত্রশিল্পীদের সামনে 'মডেল' হিসেবে অনুসরণ করবার মত পুরনো কোনো শিল্পকর্ম ছিল না। কিন্তু তাঁরা ভাস্করদের মত বাস্তবসম্মত কাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে জ্যামিতির জ্ঞান চিত্রাঙ্কন শিল্পকে বুঝতে তাদের সাহায্য করেছে। শুধু তাই

এই আত্ম প্রতিকৃতিটি এঁকেছেন লিও নার্দো দা ভিন্সি (১৪৫২-১৫১৯) যাঁর একাধারে উদ্ভিদ বিদ্যা এবং anatomy থেকে গণিত ও অঙ্কন শিল্প পর্যন্ত বিষয়ে অশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি 'মোনালিসা' ও 'দ্যা লাস্ট সাপার' দুটি অনবদ্য ছবি এঁকেছিলেন।

তাঁর অনেক স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন ছিল আকাশে ওড়ার। তিনি বছরের পর পর বছর কাটিয়েছিলেন পাখীরা কিভাবে উড়ে তা নিরীক্ষণ করে এবং অবশেষে একদিন একটি উড়ন্ত মেশিনের নক্সা তৈরী করে ফেললেন।

তিনি 'লিওনার্দো দাভিন্সি, একজন অনুসন্ধানী'বলে নিজের নাম সই করতেন।

নয়, আলোর গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করে তারা ত্রিমাত্রিক ছবি (three dimensional) আঁকার জ্ঞানও অর্জন করলেন। ছবিতে তেলের ব্যবহার ছবিগুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে, এটাও তারা লক্ষ্য করলেন। অনেক ছবিতে পোষাক পরিচ্ছেদের রং এবং নক্সার ক্ষেত্রে চীনা এবং পারস্যের শিল্পের প্রভাবের প্রমাণ রয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে ,দৈহিক গঠনজনিত বিদ্যা, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নান্দনিক জ্ঞান ইটালীয় শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছিল। বস্তুতন্ত্রবাদ বলে আখ্যায়িত এই শিল্পের ধারা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

কার্যক্রম-২

যোড়শ শতাব্দীতে ইটালীয় শিল্পীদের শিল্পকার্যে যে সব বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যবহৃত হত, সেগুলোর বর্ণনা দাও।

স্থাপত্য ঃ

Italian architecture in the sixteenth century copied many features of imperial Roman buildings.

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত রোমনগরী স্বমহিমায় জেগে উঠল। ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপরা রাজনৈতিকভাবে অনেকটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপের নির্বাচন নিয়ে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং পোপের পদকে দুর্বল করে তুলেছিল, ঐসময় তার অবসান ঘটে। পোপেরা রোমের ইতিহাস পড়তে সবাইকে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। প্রত্নতাত্বিকরা রোম নগরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলোর খনন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। (প্রত্নতত্বের মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনাকে জনগণের সামনে তুলে ধরার দক্ষতা সে সময় একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। এই খনন কার্য, যাকে (classical) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, প্রত্নতত্বের কাজে উৎসাহ জুগিয়েছিল এবং এই কাজ রোমানদের ঐতিহ্যকে আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। পোপ, ধনী ব্যবসায়ি ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিরা শাস্ত্রসম্মত (classical) প্রত্নতত্বের মহিমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল স্থপতিদের খননের কাজে নিয়োগ করলেন। শিল্পী এবং ভাস্করদের চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য এবং খোদাই শিল্পের মাধ্যমে শহরের ঘরবাড়িগুলোকে সাজিয়ে তুলতে হয়েছিল।

কেউ কেউ চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য কার্য— তিনটিতেই সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। এব্যাপারে Michelangelo Bunarroti ই (১৪৭৫-১৫৬৪) হচ্ছেন প্রকৃষ্ট উদাহরণ, রোম শহরের sistine chepel এ যাঁর আঁকা ছবি, 'The Pieta' নামে খ্যাত ভাস্কর্য্যও সেন্ট পিটারস চার্চের গম্বুজের নক্সা তাঁকে অমরত্ব প্রদান করেছিল। Filippo Brunelleschi (১৩৩৭-১৪৪৬) নামে একজন স্থপতি, ভাস্কর হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত Duomo র নক্সা

তৈরি করেছিলেন। আরেকটি অসাধারণ পরিবর্তন যা ওই সময় থেকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তা হচ্ছে যে শিল্পীরা স্বনামেই পরিচিত ছিলেন, আগের মত কোনো গোষ্ঠী বা guild এর সদৃশ্য হিসেবে নয়।

The Duomo, the dome of Florence cathedral designed by Brunelleschi.

Leon Batista Alberti (১৪০৪-৭২) শিল্পকলা সংক্রান্ত মতবাদ ও স্থাপত্য সম্পর্কে লিখেছিলেন। 'Him I call an Architect who is able to devise and to compleat all those Works which, by the movement of great Weights, and by the conjunction and amassment of Bodies can, with greatest Beauty, be adapted to the uses of Mankind'.

The First Printed Books

অন্যান্য দেশের মানুষের যদি বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য্য ও সুন্দর ঘরবাড়ি দেখতে ইচ্ছে করত তাহলে তাদের ইটালী ভ্রমণ না করে কোনো উপায় ছিল না। তবে কোনো লিখিত নিদর্শন দেখতে ইটালীতে আসতে হত না, ও সেগুলো ইটালী থেকে বহির্বিশ্বের সব জায়গাতেই চলে যেত। ষোড়শ শতাব্দীর মুদ্রণ শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নতির মত বিপ্লবাত্মক ঘটনার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে এরজন্য ইউরোপীয়ানরা অন্যান্য দেশের জনগণের কাছে ঋণী মুদ্রণ প্রযুক্তির জন্য চীনাদের কাছে এবং মোঙ্গল শাসকদের কাছেও। কারণ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকবিদরা তাদের (মোঙ্গল) দেশ পরি দর্শনের সময় মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিলেন। (আগ্নেয়াস্ত্র, কম্পাস, গণনার ফ্রেম— এগুলো আবিষ্কারের ব্যাপারেও ইউরোপীয়ানরা অন্যান্য দেশের কাছে ঋণী ছিল)।

অতীতে কিছু হাতে লেখা পুথির অস্তিত্ব ছিল। জোহান্স গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg) (১৪০০-১৪৫৮) নামে একজন জার্মান ব্যক্তি, যিনি ছাপাখানা তৈরি করেছিলেন, তাঁর ছাপাখানাতেই ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫০টি বাইবেলের কপি মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অনেক সময়ের সাশ্রয় হয়েছিল। কারণ অতীতে সন্ন্যাসীদের হাতে লিখে বাহবেনের একটি কপি করতে যত সময় লাগত, পরবর্তীতে ঐ সময়ের মধ্যে ১৫০টি বাইবেল মুদ্রিত করা সম্ভব হয়েছিল।

১৫০০ খিস্টাব্দের মধ্যে ইটালীতে অনেক উচ্চস্তরীয় গ্রন্থ (যার অধিকাংশই লেখা হয়েছিল ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। মুদ্রিত পুস্তক যেহেতু সুলভে পাওয়া যেত সেগুলো প্রয়োজন মত যে কেউ ক্রয় করতে পারত এবং পড়াশোনার ব্যাপারে ছাত্রদের শুধুমাত্র শ্রেণীকক্ষের বক্তৃতার উপর নির্ভর করতে হত না। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন মতামত ও সংবাদাদি আগের/পূর্বের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। একটি মুদ্রিত পুস্তকের মাধ্যমে, নতুন ধ্যান ধারণা অতি অল্প সময়ে শত শত পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত। এর ফলে মানুষের মধ্যে বই পড়ার/পুস্তক পাঠের অভ্যেস তৈরি হল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইটালীর মানবতাবাদী সংস্কৃতি যে আল্পস পর্বতমালা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রধান কারণ হচ্ছে জনগণের মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকের বহুল প্রচার। এই ঘটনা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেন অতীতের বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলো একটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মানবজাতি সম্পর্কিত নতুন ধারণা ঃ

মানবতাবাদী সংস্কৃতির একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে ধর্মের উন্মাদনা হ্রাস পাওয়া। জাগতিক সম্পদ, ক্ষমতা এবং যশ — এই তিনের উপরে ইটালীয়দের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা অধার্মিক ছিলেন। Francesco (১৩৯০-১৪৪৫) নামে ভেনিসের একজন মানবতাবাদী একটি পুস্তিকায় (pamphlet) সম্পদ আহরণের প্রয়াসকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন

জানিয়েছিলেন। Lorenzo Valla (১৪০৬-১৪৫৭), যিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করলে মানুষ জীবনে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়, তিনি তাঁর লেখা 'On Pleasure' বইতে আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে খিস্টানরা যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তার কড়া সমালোচনা করেছিলেন। সেই সময়ে আদব কায়দায় পরিশীলনের প্রতিও অর্থাৎ, কি ভাবে একজন লোক নম্রভাবে কথা বলতে পারে, জায়গা বিশেষে উপযুক্ত পোশাক পরতে পারে এবং একজন সংস্কৃতিবান মানুষের তার সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি কি শেখা দরকার, ইত্যাদির প্রতিও জনসাধারণের ঝোঁক ছিল।

মানবতাবাদ বলতে তখন এটাও বোঝাত যে জীবনে শুধু ক্ষমতা ও অর্থই শেষ কথা নয়, তার বাইরেও কিছু আছে যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারত। এই আদর্শ এরকম একটা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল যে মনুষ্য প্রকৃতি বহুমুখী এবং এই বহুমুখীতা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তাঁর 'দ্যা প্রিন্স' (১৫১৩) বইয়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছিলেন।

'So, leaving aside imaginary things, and referring only to those which truly exist, I say that whenever men are discussed (and especially princes, who are more exposed to view), they are noted for various qualities which earn them either praise or condemnation. Some, for example, are held to be generous, and others miserly. Some are held to be benefactors, others are called grasping; some cruel, some compassionate; one man faithless, another faithful; one man effeminate and cowardly, another fierce and courageous; one man courteous, another proud; one man lascivious, another pure; one guileless, another crafty; one stubborn, another flexible; one grave, another frivolous; one religious, another sceptical; and so forth.'

ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন 'all men are bad and ever ready to display their vicious nature partly because of the fact that tuman desires are insatiable'. ম্যাকিয়াভেলি দেখেছিলেন, মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনের সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বার্থ।

মহিলাদের আশা- আকাঙ্খা ঃ

স্বতন্ত্র ও নাগরিকত্ব নিয়ে যে নতুন আদর্শের সূচনা হয়েছিল সেখানে মহিলাদের কোনো স্থান ছিল না। অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পরিবারগুলোর পুরুষেরাই জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং তারা তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্তের ও নিয়ামক ছিলেন। তারা তাদের ছেলেদের এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যাতে পরবর্তীকালে তারা পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিতেপারে। কখনও বা তারা তাদের কনিষ্ঠপুত্রদের যাজক করার অভিপ্রায়ে চার্চে পাঠাত। স্বামীরা কিভাবে ব্যবসা চালাবেন সে ব্যাপারে তাদের স্ত্রীদের মতামত দেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না, যদিও বা পণ বাবদ দেওয়া অর্থ তাদের পারিবারিক ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করা হত। প্রায়ই ব্যবসায়িক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হত। যদি পণ বাবদ দেওয়া অর্থের জোগাড় না হত তাহলে পিতারা তাদের মেয়েদের convent এ পাঠিয়ে দিতেন এবং সেখানে তাদের বাকী জীবন সন্ন্যাসীনি (nun) হয়েই কাটিয়ে

দিতে হত। প্রকৃত অর্থে, মহিলাদের তাদের পরিবারের বাইরে কাজ করার বিশেষ সুযোগ ছিল না এবং মনে করা হত যে তারা একমাত্র গৃহকর্মেরই উপযুক্ত।

তবে ব্যবসায়ীদের পরিবারে মহিলাদের অবস্থান একটু অন্যরকম ছিল। দোকান মালিকদের ব্যবসা চালাতে গিয়ে প্রায়ই তাদের স্ত্রীদের সাহায্য নিতে হত। ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিকদের পরিবারের পুরুষ সদস্যেরা ব্যবসার কাজে যখন শহরের বাইরে থাকতেন তখন তাদের স্ত্রীরাই ওই ব্যবসাগুলোর দেখাশোনা করতেন। একজন ব্যবসায়ির অকাল মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রীকে বাধ্য হয়েই ঘরেব বাইরে এসে ব্যবসার কাজ কাঁধে তুলে নিতে হত যা কোনো অভিজাত পরিবারে কখনও সম্ভব ছিল না।

কিছু সংখ্যক মহিলা মানবতাবাদী শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সৃষ্টিশীল এবং সংবদেনশীল মনোভাব পোষণ করতেন। Cassaudra Fedele এর মতে যদিও যথেষ্ট পড়াশোনা থাকলেও মহিলারা সেইজন্য কোনো বিশেষ সম্মানের বা মর্যাদার অধিকারী হতেন না। তবুও তিনি প্রত্যেক মহিলার পড়শোনাকে আঁকড়ে ধরা উচিত বলে মনে করতেন। Fedele সেইসব মহিলাদের একজন, যিনি সেই ধ্যান ধারণা নিয়ে যে সমস্ত মহিলারা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে মহিলারা কখনও মানবতাবাদী পণ্ডিতদের সমকক্ষ হতে পারবে না তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন Fedele। Fedele-র গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার উপর যথেষ্ট দখল ছিল এবং পাদোয়া University -র পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

Isabella d'Este.

ওই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে মানুষের মনে যে অনুরাগ ছিল, শ্রীমতী Fedele-র লেখা পড়ে তা অনুধাবন করা যায়। অনেক ভেনিসীয় লেখিকাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন যিনি তার দেশের স্বাধীনতার সেই সংজ্ঞাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে ওই দেশের প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষরা যতটা স্বাধীনতা পেতেন মহিলারা ততটা পেতেন না। আরেকজন স্বনামধন্যা মহিলা হচ্ছেন Isabella d'Este (১৪৭৪-১৫৩৯), যিনি Mantua-র Marchesa ছিলেন। তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী Isabella রাজ্য শাসন করতেন এবং Mantua রাজসভাটি বৌদ্ধিক উজ্জ্বলতার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মহিলাদের লেখালেখি থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে তারা বিশ্বাস করতেন যে পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের নিজস্ব একটি পরিচয় বজায় রাখবার জন্য তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করা দরকার।

কার্যক্রম ৩

মহিলাদের আশা আকাঙ্খার ব্যাপারে একজন পুরুষ (Castiglione) ও একজন মহিলা (Fedele) র মতামতের তুলনামূলক আলোচনা কর। তাঁরা কি শুধু এক শ্রেণীর মহিলার কথাই উল্লেখ করেছেন?

লেখক এবং কূটনীতিজ্ঞ বালথাসার castiglione তাঁর বই 'দ্যা কোর্টিয়ার' (১৫২৮) এ লিখেছিলেনঃ
'I hold that a woman should in no way resemble a man as regards her ways, manners, words, gestures and bearing. Thus just as it is very fitting that a man should display a certain robust and sturdy manliness, so it is well for a woman to have a certain soft and delicate tenderness, with an air of feminine sweetness in her every movement, which, in her going and staying and whatsoever she does, always makes her appear a woman, without any resemblance to a man. If this precept be added to the rules that these gentlemen have taught the courtier, then I think that she ought to be able to make use of many of them, and adorn herself with the finest accomplishments... For I consider that many virtues of the mind are as necessary to a woman as to a man; as it is to be of good family; to shun affectation: to be naturally graceful; to be well mannered, clever and prudent; to be neither proud, envious or eviltongued, nor vain... to perform well and gracefully the sports suitable for women.'

খ্রিস্টধর্মের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ঃ

বাণিজ্য ও ভ্রমণ, সামরিক অভিযান এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ইটালীয় শহর এবং রাজসভার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। নব্য সংস্কৃতি শিক্ষিত এবং বিত্তবানদের প্রশংসাই অর্জন করেনি তারা ওই ভাবধারার অনুসারীও ছিল। তবে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষদের কাছে নতুন ভাবধারার একটা ক্ষুদ্র অংশই শুধু পৌঁছুতে পেরেছিল।

পঞ্চদশ এবংষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পণ্ডিতেরা মানবতাবাদী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের ইটালীয় সহকর্মীদের মত তাঁরাও খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতিও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে ইটালীতে যেখানে মানবতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পেশাদারি পণ্ডিতরাই যুক্ত ছিলেন, উত্তর ইউরোপে কিন্তু সেরকমটা ছিল না। সেখানে চার্চের অনেক সদস্যরাই প্রধানত ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারা খ্রিস্টানদের আহ্বান জানালেন প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই যেন ধর্মচর্চা করেন এবং অপ্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান, যেগুলো পরে সংযোজিত হয়েছে, সেগুলো যেন এড়িয়ে চলেন। তারা মানবজাতিকে একটি মুক্তমনা এবং যুক্তিবাদী জীব হিসেবেই দেখতেন। পরবর্তীতে দার্শনিকরা এটা মেনে নিয়েছিলেন যে ঈশ্বরকে যেমন স্বীকার করব তেমনি সুখ ও শান্তির সন্ধানে মানুষের স্বাধীন জীবনযাত্রাকেও মেনে নেওয়া সঙ্গত।

খ্রিস্টীয় মানবতাবাদীরা, যেমন টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) এবং হল্যান্ডের ইরাসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬) বুঝতে পেরেছিলেন যে চার্চগুলোতে লোভের রাজত্ব চলছিল। কারণ চার্চের যাজকরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতেন। যাজকরা যেসব অন্যায় কাজ করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল অর্থের বিনিময়ের কাজে প্রশ্রয় দেওয়া (indulgence) বিক্রি করা)। নিজ নিজ ভাষায় অনুদিত বাইবেল পাঠ করে খ্রিস্টানরা এটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের ধর্ম এধরনের পাপ কাজে প্রশ্রয় দেয় না।

ইউরোপের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে চার্চের আরোপ করা খাজনার বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যদিও সাধারণ মানুষ এই অর্থ আদায়ের জন্য চার্চের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। রাজপরিবারের সদস্যরা জনগণের এই বিরুদ্ধাচারণ মেনে নিতে পারেননি। তারা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যখন মানবাতাবাদীরা এই মর্মে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে যাজকরা তাদের বিচার বিভাগীয় এবং রাজকোষের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে দাবী উত্থাপন করেছিলেন তা খ্রিস্টান রোমান সম্রাট কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী সম্বলিত দলিলকে ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। তবে, মানবতাবাদী পণ্ডিতেরা এই মর্মে সবার দৃষ্টি আাকর্ষণ করেছিলেন যে তাদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। তাদের মতবাদকে বিকৃত করা হয়েছে।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) নামে একজন জার্মান সন্ন্যাসী ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন এই বলে যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে গেলে চার্চের যাজকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অপরিহার্য্য নয়। তিনি তাঁর অনুগতকারীদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা একমাত্র বিশ্বাসই মানুষকে ঠিক পথে পরিচালিত করে এবং স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে। Protestant Reformation খ্যাত এই আন্দোলনের ফলে পোপ ও ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীর চার্চের সব সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। Ulrich Zwingli

(১৪৮৪-১৫৩১) এবং এর পরে Jean Calvin (১৫০১-৬৪) লুথারের এই মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। বণিকদের সমর্থন পাওয়ার ফলে সমাজ সংস্কারকরা তাদের মতবাদকে শহরে জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ক্যাথলিক চার্চগুলির প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অন্যান্য জার্মান সংস্কারকরা এব্যাপারে চরমপন্থীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। সামাজিক অত্যাচার নির্মূল করাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁরা বলেন যেহেতু ঈশ্বর সব মানুষকে সমান করে গড়েছেন, তাই তাদের কাছ থেকে কর পাওয়ার আশা করা যেমন অনুচিৎ, তেমনি নিজেদের পছন্দমত যাজক গ্রহণ করার অধিকারও মেনে নেওয়া উচিত।

The New Testament হল বাইবেলের সেই অধ্যায়টি যেখানে যীশু খ্রিস্টের জীবন ও তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর প্রারম্ভিক অনুসারীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উইলিয়াম - (১৪৪৯-১৫৩৬), একজন ইংরেজ লুথার পন্থী, যিনি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন।
প্রোটেস্টান্টবাদের সমর্থনে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'In the they be all agreed, to drive you from the knowledge of the scripture, and that ye shall not have the text thereof in the mother-tongue, and to keep the world still in darkness, to the intent they might sit in the consciences of the people, through vain superstition and false doctrine, to satisfy their proud ambition, and insatiable covetousness, and to exalt their own honour above king and emperor, yea, and above God himself... Which thing only moved me to translate the New Testament. Because I had perceived by experience, how that it was impossible to establish the lay-people in any truth, except the scripture were plainly laid before their eyes in their mother-tongue, that they might see the process, order, and meaning of the text.'

লুথার চরমপন্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি জার্মান শাসকদের ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু চরমপন্থা টিকে রইল এবং ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টদের আত্মরক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গেল। প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথলিক শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে অত্যাচারী শাসককে গদিচ্যুত করা ও তাদের পছন্দমত একজন শাসককে নির্বাচিত করার অধিকার অর্জনের আন্দোলন শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য স্থানের মত ফ্রান্সেও ক্যাথলিক চার্চ প্রোটেস্টান্টদের তাদের ইচ্ছেমত পূজার্চনা (worship) করার অনুমতি দিল। ইংল্যান্ডে শাসকরা পোপের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এরপর থেকে একজন রাজা/রাণীই চার্চের প্রধান হতে থাকলেন।

ক্যাথলিক চার্চগুলো তাদের ত্রুটিগুলো মেনে নিল এবং সেগুলো সংস্কার করার কাজে হাত দিল। স্পেন ও ইটালীতে যাজকরা/পাদরীরা (Churchmen) সহজ সরল জীবন যাপন এবং গরিব-দু:খীর সেবা করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন। স্পেনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মক্ষেত্রের বিরোধিতা করার জন্যে Ignatius Loyola ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে Society of Jesus নামে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন। তাঁর অনুসারীদের বলা হত Jesuits, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গরিবদের সেবা করা ও অন্যান্যদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা।

কার্যক্রম-৪
কি কি কারণে প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথলিক চার্চের সমালোচনা করেছিল?

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী	
১৫১৬	টমাস মোরের Utopia বইটি প্রকাশিত হয়েছিল
১৫১৭	মার্টিন লুথার ৯৫টি *(Theses)
১৫২২	মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করলেন
১৫২৫	জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহ
১৫৪৩	আন্ড্রিয়াস ভিসেলিয়াস (Andreas Vesalius) 'On Anatomny' বইটি লিখেছিলেন।
১৫৫৯	ইংল্যান্ডে এঙ্গলিকান চার্চ স্থাপিত হল। রাজা/রাণী এই চার্চের প্রধান হলেন।
১৫৬৯	Gerhardus Mercator পৃথিবীর নলাকার মানচিত্র (cylindrical) তৈরি করলেন।
১৫৮২	পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করলেন,
১৬২৮	উইলিয়াম হার্ভে হৃদযন্ত্রের সঙ্গে রক্ত চলাচলের সম্পর্কের কথা জানালেন।
১৬৭৩	প্যারিসে Academy of Sciences স্থাপিত হল।
১৬৮৭	আইজাক নিউটনের Principia Mathematica প্রকাশিত হয়েছিল।

কোপার্নিকাসের আবিষ্কার সম্বন্ধীয় বিপ্লব (The Copernicas Revolution) ঃ

মানুষ মাত্রেই পাপী, বিজ্ঞানীরা খ্রিস্টানদের এই মতাদের বিরোধিতা করেছিলেন একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে। কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) যিনি মার্টিন লুথারের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার সন্ধিকাল বলা হয়। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতেন যে গোটা পৃথিবীই পাপীদের স্থান এবং পাপের ভারে পৃথিবীটা অচল হয়ে গিয়েছে। ফলে পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যার চতুর্দিকে গ্রহ নক্ষত্র ঘুরপাক খাচ্ছে।

Celestial means divine or heavenly, while terrestrial implies having a worldly quality.

কোপার্নিকাস দাবী করেছিলেন যে পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহ-সূর্যের চারদিকে ঘোরে। কোপার্নিকাস একজন ধার্মিক খিস্টান ছিলেন এবং এই ভেবে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর এই দাবীর ফলে ঐতিহ্যশালী যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। এই জন্যে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি De revolutionibus (The Rotation বা আবর্তন) ছাপাননি। তাঁর মৃত্যুশয্যায় তিনি এটি তাঁর অনুসারী Joachim Rheticus কে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই মতবাদ গ্রহণ করতে জনগণের অনেকদিন লেগেছিল। অনেক পরে, প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও পরে, Johannes Kepler (১৫৭১-১৬৩০) নামে একজন জ্যোতির্বিদ এবং Galileo Galilei (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁদের আবিষ্কারের মাধ্যমে মহাকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন। পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে এই মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন Capler তাঁর Cosmographical Mystery বইটির মাধ্যমে, যে বই প্রমাণ করে দেখিয়েছিল যে গ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই ধারণা যে সত্য Galileo তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তাঁর বই 'The Motion' এর মাধ্যমে। এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব চরম শিখরে পৌঁছেছিল আইজাক নিউটিনের Theory of Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের মাধ্যমে।

Self portrait by Copernicus

মহাবিশ্বকে জানা

গ্যালিলিও এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে বাইবেল স্বর্গে যাওয়ার পথ আলোকিত করে দিলেও স্বর্গ কিভাবে চলে সে নিয়ে কিছু বলেননি। ওই চিন্তাবিদদের গবেষণাও কাজকর্ম থেকে এটাই জানা যায় জ্ঞান, যা কি না বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা তার ভিত্তিই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান। বিজ্ঞানীরা একবার পথ দেখিয়ে দেওয়ার পর পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জীববিদ্যাজনিত বৈজ্ঞানিক অনুধানের কাজ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেল। ঐতিহাসিকরা জ্ঞানের এই নতুন দিশাকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন।

এ হেন পরিস্থিতিতে নাস্তিক এবং অবিশ্বাসীরা এমনটাই ভাবতে শুরু করল যে ঈশ্বর নয়, প্রকৃতিই সৃষ্টির উৎস। এমনকি যারা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস হারায়নি তারাও বলাবলি করতে শুরু করল যে এই বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষের জীবনমৃত্যু সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়না। এই মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল বৈজ্ঞানিক সংগঠনগুলো যেগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত The Paris Academy এবং প্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রসারের জন্য লন্ডনে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত The Royal Society এ ব্যাপারে অনেক বক্তৃতা আয়োজন করেছিল এবং সর্বসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তার ফলাফল তাদের সামনে তুলে ধরেছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে কি ইউরোপে নবজাগরণ হয়েছিল ?
(Was there a European 'Renaissance' in the Fourteenth Century?)

এবারে আমরা নবজাগরণ নিয়ে আাবার একটু আলোচনা করব। আমরা কি এটাই মেনে নেব যে এই সময়টা অতীতের ঐতিহ্য ভেঙে নতুন দিশায় এগোনো শুরু করল এবং গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্যের পুনর্জন্ম ঘটল? তাহলে কি আমরা এটা ধরে নেব যে পূর্ববর্তী সময় (দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী) অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল?

ইংল্যান্ডের Peter Burke-এর মত আধুনিক লেখকরা এই মর্মে ইঙ্গিত করেছেন যে Burckhardt দুটো সময়কালের মধ্যে ব্যবধান টেনে এনেছেন নবজাগরণকে কেন্দ্র করে, যার অর্থ এরকম দাঁড়ায়, ওই সময়ের গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার পুনর্জন্ম হয়েছিল এবং ওই সময়ের জ্ঞানী গুণীরা খ্রিস্টধর্ম পূর্ব বিশ্বের ধ্যান ধারণার জায়গায় নতুন খ্রিস্টধর্ম নির্ভর ধ্যানধারণার সৃষ্টি করলেন। কিন্তু দুটো যুক্তিই অতিরঞ্জিত। একদিকে যেমন বিগত শতাব্দীগুলোর পণ্ডিতেরা গ্রীক এবং রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে ধর্মই জনজীবনে চালিকা শক্তি ছিল।

নবজাগরণ বলতে যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়, যেমন মধ্যযুগের অন্ধকার ও উন্নয়নবিহীন যুগের বিপরীতে গতিশীলতা এবং শিল্পের সৃষ্টিশীলতার যুগ, এরকমটা মনে করা নবজাগরণের অর্থের অতিসরলীকরণের নামান্তর। ইটালীতে নবজাগরণের উপাদানগুলো সেই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে নবম শতাব্দীতে ফ্রান্সে ওই একই ধরনের সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ইউরোপে যে সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেনি তার পিছনে শুধু রোম এবং গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব কাজ করে না। রোমান সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ওই সভ্যতার মান অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের প্রযুক্তি এবং দক্ষতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তা এক সময় গ্রীক ও রোমানদের সভ্যতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ

বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন নৌবিজ্ঞান জনিত প্রযুক্তি মানুষকে জলপথে আরও দূরদূরান্তে যাওয়া আসার সুবিধা করে দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং মোঙ্গলদের এশিয়া বিজয় এবং উত্তর আফ্রিকাকে ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছিল। তবে তা রাজনৈতিকভাবে নয়। বাণিজ্য এবং প্রশিক্ষণের দক্ষতার মাধ্যমে। ইউরোপীয়রা শুধু গ্রীক এবং রোমানদের কাছ থেকেই শিক্ষা নেয়নি, নিয়েছে ভারত, আরব, ইরান, মধ্য এশিয়া এবং চীন দেশের কাছ থেকেও। এই ঋণ অনেকদিন পর্যন্ত স্বীকার করা হয়নি, কারণ যখন ওই সময়ের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিকরা তখন ইউরোপীয়দের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাপারটা দেখেছিলেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা ওই সময়ে ঘটেছিল তা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত এবং সার্বজনীন জীনবধারা পৃথক হওয়া শুরু হয়েছিল। সর্বজনীন জীবনধারা বলতে সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্মীয় ক্ষেত্রকেও বোঝায়। ব্যক্তিগত জীবনধারা বলতে বোঝায় পারিবারিক ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত ধর্ম। ওই সময়ে একজন ব্যক্তির জীবনে ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন দুটো ভূমিকাই ছিল। সেই ব্যক্তি শুধু তিনটি ক্রম বা শ্রেণীর (Three Orders) একজন সদস্যই ছিলেন না, তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বও ছিল। ঠিক তেমনি তিনি তাঁর নিজ গুণেও স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ পেত এই বিশ্বাসে যে সব ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার সমান হবে।

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মনে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বোধের উন্মেষ ঘটেছিল যার ভিত্তি ছিল ভাষা। ইউরোপ, যা অতীতে একত্রিত হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য ও পরবর্তীতে ল্যাটিনদের দ্বারা এবং সেই সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে, পরবর্তীতে তা অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল যার ভিত্তি ছিল ভাষা।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির কোন কোন উপাদানের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল?
২. ইটালীয় স্থাপত্যের সঙ্গে ওই সময়ের ইসলামীয় স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।
৩. ইটালীয় শহরগুলো কেন প্রথমে মানবতাবাদকে প্রত্যক্ষ করল?
৪. উত্তম সরকার সম্পর্কে ভেনিসীয় ও ফ্রান্সের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা কর।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

৫. মানবতাবাদী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য কি কি?
৬. সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের কাছে পৃথিবীটা কিভাবে অন্যরকম মনে হয়েছিল তার বিবরণ দাও।

প্রসঙ্গ ৮

বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

এই অধ্যায়ে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় কয়েকটি অজানা মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল সেইসব বাণিজ্য পথের সন্ধানে, যে পথ অনুসরণ করে সেই স্থানগুলোতে পৌছুতে পারবে যেখানে মশলা এবং রূপোর সন্ধান পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে যারা প্রথম বেরিয়ে পড়েছিল তারা হচ্ছে স্পেন ও পর্তুগীজের অধিবাসী। তারা মহামান্য পোপকে প্ররোচিত করেছিল এই মর্মে যে তারা নতুন নতুন যেসব দেশ আবিষ্কার করবে সেই দেশগুলো শাসন করার পরিপূর্ণ অধিকার যেন তাদের দেওয়া হয়। খ্রিস্টফার কলম্বাস, যিনি একজন ইটালীয় অধিবাসী ছিলেন, তিনি স্পেনের শাসকদের সাহায্য ও বদান্যতায় ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দিকে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর ধারণা ছিল যে দেশে তিনি পৌঁছেছিলেন সে দেশের নাম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা 'The Indies' (ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলো, যার কথা কলম্বাস Travels of Marco Polo বইটিতে পড়েছিলেন।

পরবর্তী অনুসন্ধানমূলক অভিযান থেকে জানা গিয়েছিল যে নতুন পৃথিবী বা New World- এর ভারতীয়রা আসলে একটা ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং তারা এশিয়া মহাদেশের কোনো অংশেরই লোক নয়। আমেরিকায় দুধরনের সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। ক্যারিবীয় অঞ্চল ও ব্রাজিলে যে অর্থনীতিগুলি সেগুলো মূলত ভরণপোষণ নির্ভর অর্থনীতি। আবার কিছু শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক রাজ্যও ছিল যার ভিত্তি ছিল উন্নত ধরনের কৃষি এবং খনিজ সম্পদ। মধ্য আমেরিকার আজটেক ও মায়া এবং পেরুর ইনকাস— এই দেশগুলো বিখ্যাত ছিল কীর্তি বা স্মৃতিস্তম্ভের স্থাপত্যের জন্য।

এই অনুসন্ধানমূলক অভিযান ও পরবর্তীতে দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন করে বসবাস, ওই দেশগুলোর আদিম অধিবাসী ও তাদের সংস্কৃতির জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিই দাস ব্যবসার সূচনা করেছিল। যার ফলে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার ক্রীতদাসদের আবাদ এবং খনির কাজের জন্য আমেরিকায় বিক্রি করা শুরু করেছিল।

ইউরোপীয়রা আমেরিকা বিজয়ের সময় ওই দেশের পাণ্ডুলিপি ও স্মৃতিগ্রন্থ গুলোকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই প্রথম নৃতত্ত্ববিদরা সেই দেশগুলোর সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা শুরু করলেন। আরও পরে নৃতত্ত্ববিদরা ওই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে Machu Picchu-র ইনকা নগরীকে পুনরাবিষ্কার করা হয়েছে। ইদানীংকালে আকাশ থেকে তোলা ছবিগুলো থেকে অনেক নগরীর সন্ধান মেলে যেগুলো অরণ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

ইউরোপের আমেরিকা বিজয়ের ব্যাপারে আমরা তুলনামূলকভাবে ইউরোপীয় পক্ষের ঘটনাই বিশদভাবে জানতে পারি। ইউরোপীয়রা তাদের আমেরিকা অভিযানের সময় জাহাজের log book ও ডাইরিতে প্রতিদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখত। কর্মকর্তা এবং খ্রিস্টিয় যাজক সম্প্রদায়ের সদস্যরা (Jesuit missionaries) এ ব্যাপারে অনেক তথ্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। ইউরোপীয়রা তাদের আমেরিকা আবিষ্কার নিয়ে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যখন আমেরিকার ইতিহাস লেখা শুরু

হয়েছিল তখন মূলত ইউরোপীয়দের আমেরিকা বিজয়ের ঘটনা এবং সেখানে তাদের বসবাসের ইতিহাসই প্রাধান্য পেয়েছিল, সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে তথ্যাবলী ওই ইতিহাসে বিশেষ কোনো স্থান পায়নি।

উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমরিকা এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জগুলোতে হাজার বছর ধরে মানুষ বাস করে আসছিল এবং সেই সঙ্গে পর্যায়ক্রমে এশিয়া ও দক্ষিণ সাগর দ্বীপপুঞ্জ থেকে ওই দেশ গুলোতে প্রব্রজন চলে আসছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বেশিরভাগ অঞ্চলই জঙ্গলাকীর্ণ ও পর্বতময় ছিল (এখনও অনেকটা সেরকমই আছে) এবং বিশ্বের দীর্ঘতম নদ আমাজন ওই অঞ্চলের গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল বয়ে চলেছে। মধ্য আমেরিকার ম্যাক্সিকোতে উপকূল অঞ্চল সমতলভূমিতে ঘন জনবসতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু গ্রামগুলোর অবস্থান অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

ক্যারিবীয় অঞ্চল ও ব্রাজিলের জনবিন্যাস ঃ

ক্যারিবীয় সাগরের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জে, যেগুলোর বর্তমান নাম বাহামা এবং 'Greater Antilles' সেখানকার শতাধিক দ্বীপপুঞ্জে Arawakian Lucayo-রা বসবাস করত। কিন্তু Lesser থেকে ক্যারি ব নামে দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী তাদের এই স্থান থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। Arawak-রা সেই ধরনের জাতি ছিল যারা দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সন্ধি প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ছিল। তারা দক্ষ নৌকো প্রস্তুতকারক হিসেবে পরিচিত ছিল এবং তারা নিজেদের তৈরি canoes (এক প্রকার নৌকো যা ফাঁপা গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি করা হত) চড়ে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়ত। তারা শিকার, মাছ ধরা এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে শস্য (corn), মিষ্টি আলু ইত্যাদি উৎপাদন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা (The Central Cultural Value) গঠন করা হয়েছিল যার সদস্যরা সমবেত ভাবে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করত যাতে Arawak সম্প্রদায়ের পরিবারভুক্ত সবার খাদ্য জোগানো যায়। Arawakদের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা চালু ছিল। Arawak-রা animist হিসেবে পরিচিত ছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে কোনো জড় পদার্থেরই প্রাণ আছে।

Animists believe that even objects regarded by modern science as 'inanimate' may have life or a soul.

MAP 1: Central America nd the Caribbean Islands

কার্যক্রম ১

Arawak এবং স্পেশীয়দের মধ্যে কি কি পার্থক্য ছিল আলোচনা কর। এরমধ্যে কোন পার্থক্য তোমার কাছে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং কেন?

Arawak-রা সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করত, কিন্তু ইউরোপীয়দের মত তারা সোনার মূল্যের উপরে গুরুত্ব দিত না। ইউরোপীয়দের প্রদত্ত কাঁচের পুতির বিনিময়ে তারা সানন্দে সোনা দিয়ে দিত। কারণ তাদের কাছের পুতি সোনার চেয়েও সুন্দর দেখাত। তাদের বয়নশিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। Hammock - বা নেটের ঝুলানো শয্যা, তাদের বয়ন শিল্পের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন যা ইউরোপীয়দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

Arawak-প্রজাতির লোকেরা খুব উদার প্রকৃতির ছিল। সোনা আহরণের ব্যাপারে তারা স্পেনিশীয়দের সঙ্গে একত্রে কাজ করে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যখন স্পেনিশীয় নীতি তাদের প্রতি নির্মম হয়ে উঠল তখন বাধ্য হয়েই তারা সেই নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু এর পরিণতি তাদের পক্ষে খুবই বিষাদময় হয়ে উঠেছিল। স্পেনিসীয়দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের পঁচিশ বছরের মধ্যেই তাদের জীবনধারার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট ছিল না।

Tupinamba সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে এবং জঙ্গলের (Brazil wood) গাছ থেকে Brazil শব্দের উৎপত্তি) ভিতরের গ্রামগুলোতে বসবাস করত। তাদের কাছে লোহার কোনো সরঞ্জাম না থাকায় তারা জঙ্গল পরিস্কার করে ওই জায়গায় চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়নি। তবে সেখানে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, শাকসব্জি এবং মাছ পাওয়া যেত; ফলে কৃষিকাজের উপর তারা ততটা নির্ভরশীল ছিল না। ইউরোপীয়রা ওই প্রজাতির যাদেরই দেখেছে তাদেরই সুখী জীবন এবং তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো রাজা, সৈন্য এবং চার্চ নেই দেখে তাদের প্রতি ঈর্শ্বাকাতর হয়ে পড়েছিল।

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার জাতীয় ব্যবস্থা ঃ

ক্যারিবীয় ও ব্রাজিলের তুলনায় মধ্য আমেরিকায় অনেকগুলো সুসংগঠিত রাজ্য/রাষ্ট্র ছিল। উদ্বৃত্ত শস্যের ফলন আজটেক, মায়া এবং ইনকার নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি ছিল। ওই নগরগুলোর বৃহদাকার স্থাপত্যগুলোর ধ্বংসাবশেষ দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে রাখত।

আজটেক অধিবাসীরা ঃ

দ্বাদশ শতাব্দীতে আজটেকের অধিবাসীরা উত্তর থেকে মধ্য মেক্সিকো (ভগবান Maxitti র নামে নামাঙ্কিত) উপত্যকার প্রযোজন করেছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে (যাদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হয়েছিল) পরাজিত করে আজটেকরা তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। আজটেকের সমাজ যাজক সম্প্রদায় ভুক্ত। অভিজাত সম্প্রদায় বলতে তাঁদেরকে বোঝানো হত যাঁরা ওই ধরনের পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন অথবা যাজক সম্প্রদায় কিংবা অন্যরা যাদেরকে ওই পদের উপাধি দেওয়া হয়েছিল। জন্মগতভাবে যারা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু তাঁরা সরকারি কাজ, সৈন্য বাহিনীতে এবং যাজকদের পেশায় উঁচুপদ অলঙ্কৃত করতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের মধ্যে একজন নেতা নির্বাচন করতেন যিনি আমৃত্যু শাসন কাজে রত থাকতেন। রাজা পৃথিবীতে সূর্যের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হতেন। তবে ব্যবসায়িরাও অনেক সুবিধা ভোগ করতেন এবং প্রায়ই দূত এবং গুপ্তচর হিসেবে দেশের সরকারকে সাহায্য করতেন। মেধাবি কারিগর, চিকিৎসক এবং জ্ঞানী শিক্ষকরাও যথেষ্ট সম্মানের পাত্র ছিলেন।

A ball-court marker, with inscribed dates, Maya culture, Chiapas, sixth century.

জমির পরিমাণ সীমিত থাকায় আজটেকের অধিবাসীরা পরিত্যক্ত জমিকে

ফলনশীল ভূমিতে পরিণত করার কাজে জোর দিয়েছিল। বিরাট নল খাগড়ার মাদুর বুনে এবং ওইগুলি কাদা এবং গাছ-গাছালি দিয়ে আচ্ছাদন করে মেক্সিকো হ্রদে কৃত্রিম দ্বীপের সৃষ্টি করল। ওই উর্বর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে খাল খনন করা হয়েছিল, যার উপর ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠল Tenochtitilan -নামক রাজধানী শহর। ওই হ্রদ থেকে নাটকীয়ভাবে তৈরি হয়েছিল অনেক প্রাসাদ ও পিরামিড। যেহেতু আজটেকের অধিবাসীরা প্রায়ই নানা যুদ্ধে লিপ্ত থাকত তাই তাদের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মন্দিরগুলো রণদেবতা ও সূর্যের নামে উৎসর্গ করেছিল।

Reclamination is the conversion of wasteland into land suitable for habitation or cultivation.

আজটেক সাম্রাজ্য গ্রামের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। এই দেশের জনগণ শস্য, বীন, স্কোয়াশ, লাউ, maniocroot আলু ও অন্যান্য শস্যের চাষ করত। কোনো ব্যক্তি বিশেষ জমির মালিক ছিল না। জমি এক একটি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন ছিল যারা সরকারি নির্মাণ কাজগুলো পরিচালনা করত। ইউরোপীয় ভূমিদাসদের মত চাষিরা অভিজাত সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমি গুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে তারা ওই জমিগুলোতে চাষাবাদ করত। দীন দরিদ্ররা কখনও কখনও তাদের সন্তানদের বিক্রি করে দিত যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ত। তবে এই প্রথা খুব কম সময়ের জন্য চালু ছিল। ফলে দাসত্বে পরিণত হওয়া ওই ব্যক্তিরা ওই প্রথা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পেত।

আজটেকের অধিবাসীরা তাদের সন্তানরা যাতে স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে সে ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সন্তানদের 'calmecac' নামে পেশাদারি প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হত, যেখানে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। অন্যদের কাছাকাছি 'Tepochcalli' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো হত, যেখানে তারা ইতিহাস, পৌরাণিক কথা, ধর্ম এবং আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত (ceremonial songs) ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। বালকেরা সামরিক প্রশিক্ষণ যেমন লাভ করত, তেমনি কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তরুণীদের ঘরের কাজে প্রশিক্ষিত করে তোলা হত।

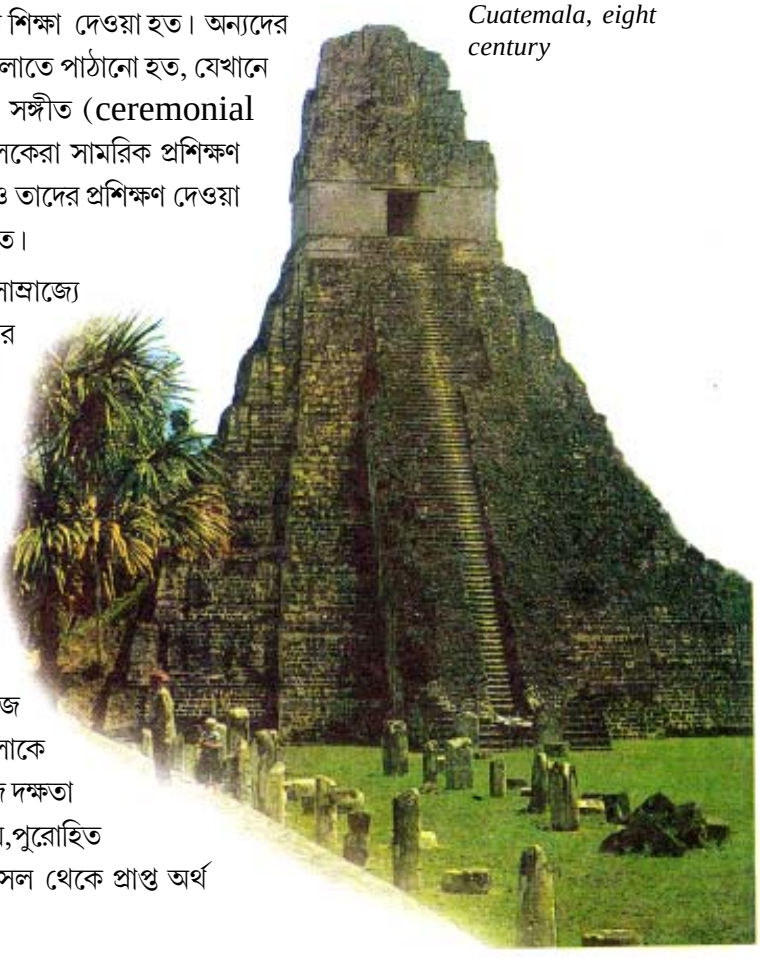

Maya temple, Tikal, Cuatemala, eight century

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আজটেক সাম্রাজ্যে মনোমালিন্যের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ হচ্ছে শোষিত জনগণের মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খায় বিদ্রোহের সূচনা।

মায়া সভ্যতা

মেক্সিকোর মায়া সংস্কৃতি একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত লক্ষ্যণীয় ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে আজটেকদের তুলনায় তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। তাদের সভ্যতার প্রধান ভিত্তিই ছিল শস্যের চাষ, সেই শস্যের বীজ বপণ, তার পরিচর্যা এবং পরিশেষে ফসল কাটা— এগুলোকে ঘিরেই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষিকাজে দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে উদ্বৃত্ত ফলন সম্ভব ছিল যা শাসক সম্প্রদায়,পুরোহিত এবং গোষ্ঠী প্রধানদের সাহায্য করেছিল ওই উদ্বৃত্ত ফসল থেকে প্রাপ্ত অর্থ

স্থাপত্য এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত চর্চার উন্নয়নে বিনিয়োগ করত। মায়া'র অধিবাসীরা ছবির মাধ্যমে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যার শুধু আংশিকভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

পেরুর ইনকা অধিবাসী ঃ

পেরুর Quechua- রা বা ইনকা অধিবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ স্থানীয় জনগোষ্ঠী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম ইনকা রাজা Manco Capac Cuzco-তে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। নবম ইনকা রাজার সময় থেকে পেরুর বিস্তার শুরু হয়েছিল এবং কালক্রমে তা Ecuador থেকে ৩০০০০ মাইল দূরে Chile পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ইনকা সাম্রাজ্যের সমস্ত সরকারি কাজকর্ম বড় বেশি কেন্দ্রিভূত ছিল এবং রাজাই ছিলেন ওই রাজ্যের সর্বেসর্বা। বিজিত জনগোষ্ঠীগুলোকে বিশেষভাবে রাজকার্যে লাগানো হয়েছিল এবং ওই রাজ্যের প্রত্যেককে রাজভাষা অর্থাৎ Quechua ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে প্রবীণ উপদেষ্টা মণ্ডলির দ্বারা আলাদা আলাদা ভাবে শাসন করা হত। কিন্তু প্রতিটি জনগোষ্ঠীকেই রাজার আনুগত্য স্বীকার করতে হত। একই সময়ে সামরিক কাজে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় শাসকদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল। অতএব, আজটেক সাম্রাজ্যের মত ইনকা সাম্রাজ্যও একটি সংঘের মত পরিচালিত হত যার কর্তৃত্বে ইনাকাররাই থাকত। যদিও ওদের জনসংখ্যার প্রকৃত হিসেব পাওয়া যায় না, কিন্তু মনে হয় যে ওই সংখ্যা ১ মিলিয়নের উপরে ছিল।

আজটেকের মত ইনকারাও উত্তম স্থপতি ছিল। তারা পর্বতের মধ্য দিয়ে Ecuador থেকে Chile পর্যন্ত পথ তৈরি করেছিলেন। তাদের দুর্গগুলো পাথরের স্লেব কেটে তৈরি করা হয়েছিল এবং এই স্লেবগুলো এত সুন্দর ভাবে কাটা হয়েছিল যে তাদের mortar- এর প্রয়োজন ছিল না। তারা পাথর কাটা এবং তা rock falls থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রম নির্ভর প্রযুক্তি কাজে লাগাত। Flaking প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজমিস্ত্রীরা Block তৈরি করত। অনেক পাথর ওজনে ১০০ ম্যাট্রিকটন থেকেও ভারি ছিল। কিন্তু ওইগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো চাকাওয়ালা গাড়ি ছিল না। শ্রমিকদের খুব কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত।

MAP 2 : South America

ইনকা সভ্যতার ভিত্তি ছিল কৃষি। অনুর্বর জমির হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা টিলাভূমিতে terrace cultivation (টিলাভূমি থাক্ থাক্ করে চাষ করা) পদ্ধতিতে চাষ করত এবং পয়প্রণালী (drainage) ও সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলেছিল। ইদানীং কালে এরকম জানানো হয়েছে যে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আন্দিয়ান পার্বত্য দেশে (Andean highlands) যতটা কৃষিকাজ হত তা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি। ইনকারা শস্য ও আলু উৎপাদন করত এবং খাদ্য ও শ্রমের জন্য ইলামাদের লালনপালন করত।

তাদের বয়নশিল্প ও মৃৎশিল্প খুব উঁচু মানের ছিল। তারা কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস নেয়নি। তবে হিসেব রাখার পদ্ধতি চালু ছিল। The quipu অর্থাৎ একটি রজ্জু যার একদিকে একটি গাঁট থাকত, যেটাকে গণিতের একটি একক হিসেবে ধরা হত।

পর্যটকদের একটি বড় অংশ ইনকাদের শিল্প ও দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে যান। চিলির কবি নেরুদার মত আরও অনেকে আছেন যারা মনে করতেন যে এর জন্যে সহস্রাধিক ইনকাবাসীকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে. কৃষি উৎপাদনে বৃদ্ধি করা, স্থাপত্য শিল্পে পারদর্শিতা দেখানো এবং কারুশিল্পের মান উন্নয়ন— কঠিন পরিবেশের মধ্যে এই কাজগুলোকে সফলকরে তুলতেই তাদের এত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

'Look at me from the depths of the earth, tiller of fields, weaver, reticent shepherd, ...
mson high on your treacherous scaffolding, iceman of Andean tears,
Jeweler with crushed fingers,
farmer anxious among his seedling,
potter wasted among his clays –
bring to the cup of this new life
your ancient buried sorrows,
Show me your blood and your furrow;
say to me : here I was scourged
because a gem was dull or because the earth
failed to give up in time its tithe of corn or stone.'

পাবলো নেরুদা (১৯০৪-৭৩), দ্য হাইটস অব মাচুপিচু, ১৯৪৩।

The Hilltop town of Machu Picchu. It escaped the notice of the Spaniards and was therefore not destroyed.

ইনকা সাম্রাজ্যের সংগঠনটি ছিল পিরামিডের মত। ফলে যদি ইনকা প্রধান ধরা পড়তেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ওই সংগঠনের যে কেউ ওই প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারত। ঠিক তাই হয়েছিল যখন স্পেনিশীয়রা ইনকাদের দেশ আক্রমণ করেছিল।

আজটেক ও ইনকাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিল ছিল, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাদের সমাজে ইউরোপের মত এমন কোনো সামাজিক রীতি ছিল না যেখানে দেশের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিগত মালিকানার মাধ্যমে কুক্ষিগত করে রাখত। যাজকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল এবং বড় বড় চার্চ তৈরি করা হয়েছিল যেগুলোতে আকারগত কারণে সোনা ব্যবহার করা হত যদিও সোনা বা রূপাকে তেমন কোনো গুরুত্বদেওয়া হত না। এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়দের সঙ্গে ইনকাদের সংস্কৃতির অনেক অমিল রয়েছে।

ACTIVITY 2

Examination a detailed physical map of South America. To what extent do you think geography influenced the developments of the Inca empire?

বিশেষ অভিযানের লক্ষ্যে ইউরোপীয়দের সমুদ্র যাত্রা ঃ

দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ইউরোপীয়দের জানতে পেরেছিল তখনই যখন ইউরোপীয়রা আটলান্টিক সাগর পেরিয়ে তাদের দেশে পৌঁছেছিল। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চুম্বকীয় কম্পাসের (যা প্রধান গন্তব্য স্থলকে ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করত) কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মানুষ প্রথম অজানা দেশের সন্ধানে সমুদ্র যাত্রায় বেরোবার সময় ওই কম্পাসের প্রয়োগ করতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপের সমুদ্র যাত্রার জাহাজগুলোর গুণগত অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বড় বড় জাহাজও তৈরি করা হয়েছিল যেগুলোতে প্রচুর পণ্যসামগ্রী তো বয়ে নেওয়া যেতই, এমনকি শত্রুর জাহাজ থেকে বাঁচতে সামরিক সরঞ্জামও বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। ভ্রমণ সাহিত্যের প্রচলন, বিশ্বতত্ত্ব ও ভূগোল সম্বন্ধীয় বইপত্রের প্রচার ও প্রসারের ফলে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মানুষের মনে অজানাকে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল।

Cosmography was understood as the science of mapping the universe. It described both heaven and Earth, but was seen as distinct from geography and astronomy.

১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে টলেমির মুদ্রিত ভূগোল বই (১৩০০ বছর পূর্বের লেখা) পাওয়া যেত। ফলে সবাই এই বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। টলেমির (ইজিপ্টের অধিবাসী ছিলেন) মতে পৃথিবীর অঞ্চলগুলো অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশকে (latitudes and longitudes) ভিত্তি করে ভাগ করা হয়েছিল। ওই বইগুলো পড়ে ভূগোল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের জ্ঞানের বিস্তার ঘটল এবং তারা মনে করল যে পৃথিবীতে তিনটি মহাদেশ রয়েছে, যথা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা। টলেমি তাঁর বইতে এরকম ইঙ্গিত করেছিলেন যে পৃথিবীর গোলাকার। কিন্তু তিনি মহাসাগরগুলোর প্রস্থ প্রকৃত মাপের চেয়ে অনেক কম করে দেখিয়েছিলেন। আটলান্টিক পেরিয়ে কোনো একটি জায়গায় পৌঁছুতে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে সে সম্পর্কে ইউরোপীয়দের কোনো ধারণাই ছিল না। যেহেতু তাদের এরকম ধারণা ছিল যে সমুদ্র যাত্রাটি খুব কম দিনের হবে, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা অসাবধানীর মত অজানার উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রায় রওয়ানা হয়ে যেতেন।

Iberian উপদ্বীপের জনগণ বিশেষত পর্তুগাল ও স্পেনের অধিবাসীরাই প্রথম যারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। অনেক দিন যাবৎ ওই অভিযানকে বলা হত আবিষ্কার/অনুসন্ধানমূলক সমুদ্র যাত্রা। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা অবশ্য এমর্মে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিলেন যে পুরনো পৃথিবীর (Old World) অভিযাত্রীদের অজানার পথে সমুদ্র যাত্রাই প্রথম সমুদ্র যাত্রা নয়। আরবীয়, চীনা ও ভারতীয়রা সমুদ্র যাত্রায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের নাবিকেরা (the Polynesians and Micronesians) প্রধান প্রধান সমুদ্রগুলোতে পাড়ি দিয়েছিলেন। নরওয়ের সমুদ্র দস্যুরা একাদশ শতাব্দীতে সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকায় পৌঁছেছিল।

কেন বিশেষভাবে স্পেন ও পর্তুগালের শাসকরা অনুসন্ধানমূলক কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন? সোনা এবং সম্পদের বিনিময়ে এই অনুষ্ঠানমূলক কাজ করে কি লাভ হত? এটা কি কোনো বিশেষ সম্মান পাওয়ার আশায় নাকি কোনো বিশেষ উপাধির আশায়? এর উত্তর সম্মিলিতভাবে তিনটি উদ্দেশ্যের উপরে নির্ভরশীল— অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্লেগ রোগ ও যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে প্রচুর লোকক্ষয় হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা চলছিল এবং ইউরোপীয় মুদ্রায় ব্যবহৃত সোনা ও রূপার ঘাটতি দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে বিগত সময়ের (একাদশ-মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত) পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা ওই সময়ে বিকাশশীল ব্যবসা বাণিজ্য যেমন ইটালীয় নগর রাষ্ট্রের (Italian city states) সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হয়ে উঠেছিল, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও বৃদ্ধি পেয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দূরদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটল এবং তারপরে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের ফলে ব্যবসা বণিজ্য করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ইটালীয়রা তুর্কীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করতে পেরেছিল, কিন্তু ব্যবসার উপর তাদের অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হত।

আরও বেশি সংখ্যক লোককে খিস্টধর্মের আওতায় নিয়ে আসা যাবে এই সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় অনেক ধর্মপ্রাণ ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা ঝুঁকি নিতেও রাজি ছিলেন। তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়রা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হলেও এর ইতিবাচক দিকটি ছিল যে এতে এশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল এবং তাদের মধ্যে এশিয়ার দ্রব্যাদি, বিশেষত মশলা পাতির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশ্বে ইউরোপীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। বিভিন্ন গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা অনেক লাভবান হয়েছিল।

সোনা এবং মশলার সন্ধান করতে গিয়ে তারা পশ্চিম আফ্রিকার খোঁজ পেল। এ অঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপীয়দের ইতিপূর্বে ব্যবসায়িক যোগাযোগ হয়নি। ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে পর্তুগালের মত একটা ছোট দেশ। যে দেশের অধিবাসীদের মৎস্য শিকার এবং সমুদ্র যাত্রায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল তারাই প্রথম সমুদ্র যাত্রায় নেতৃত্ব দিল। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরি (যাকে নাবিক বা Navigator বলা হত) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে সিউটা (Ceuta) আক্রমণ করলেন। পরবর্তীতে একের পর এক আরও অভিযান চালানো হয়েছিল এবং পর্তুগীজরা আফ্রিকার Cape Bojador এর একটি ব্যবসায়িক ঘাঁটি স্থাপন করল। আফ্রিকার অধিবাসীদের বন্দি করে ক্রীতদাসে পরিণত করা হল, এবং স্বর্ণকণা থেকে দামি ধাতু তৈরি করা শুরু হল।

Reconquista হচ্ছে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আরবের খ্রিস্টান রাজাদের দ্বারা আইবেরিয়ান উপদ্বীপের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয়।

অর্থনৈতিক কারণ স্পেনের জনগণকে সমুদ্রের নাইট হতে উৎসাহিত করেছিল। ধর্মযুদ্ধের স্মৃতি এবং Reconquista-র সাফল্য ব্যক্তিগত উচ্চাশা বাড়িয়ে তুলল এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ (Capitulaciones নামে পরিচিত) হতে সাহায্য করল। এই চুক্তি অনুযায়ী স্পেনের শাসকেরা তাদের জয় করা নতুন দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব দাবি করলেন এবং অভিযানের নেতাদের উপাধি এবং অধিকৃত দেশের শাসনের অধিকার দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

আটলান্টিক অতিক্রম ঃ

স্বশিক্ষিত খ্রিস্টফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) রোমাঞ্চ ও খ্যাতির প্রত্যাশী ছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করে তিনি এব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছিলেন, যে পশ্চিমদিকে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে তিনি ইন্ডিজ নামে একটি দেশ আবিষ্কার করবেন। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিলেন পিয়েরে ডি এইলী (Cardinal Pierre d'Ailly) দ্বারা লিখিত 'এমিগো মুণ্ডি' (জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর লিখিত একটি বই) পড়ে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে সেটা পর্তুগীজ রাজার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা সেটাকে কোনো গুরুত্বই দেননি। তিনি তখন তাঁর পরিকল্পনাটি স্পেনিশীয় শাসকদের হাতে তুলে দেন এবং তারা এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। এর পরেই ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট, কলম্বাস পেলোস বন্দর থেকে তাঁর সমুদ্র অভিযান শুরু করেন।

কলম্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা আটলান্টিক পেরিয়ে অনেক দূরের গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করলেও তাদের যে কতদূর যেতে হবে এবং এ যাত্রা কত দীর্ঘ হবে, এব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। শুধু তাই নয়, এত বড় একটি অভিযানের জন্য তাদের কোনো উপযুক্ত প্রস্তুতিও ছিল না। তাদের জলযানবহরটি ছোট ছিল, যার মধ্যে ছিল 'সান্তা মারিয়া' নামে একটা ছোট জাহাজ এবং পিন্টা ও নীনা নামে দুটো হালকা জাহাজ (caravels)। কলম্বাস নিজে তাঁর ৪০ জন উপযুক্ত নাবিককে সঙ্গে নিয়ে ''সান্তা মারিয়া' জাহাজটির গতিপথ নির্ধারণ করছিলেন। এই যাত্রাপথটি খুব প্রলম্বিত হয়েছিল। তবে আহাবহাওয়া খুবই অনুকূল ছিল। তেত্রিশ দিন ধরে তাদের জলযান বহরটি শুধু জল আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখেনি। ইতিমধ্যে জাহাজ কর্মীরা চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাদের মধ্যে জনাকয়েক এও দাবী করতে শুরু করল যে জলযান বহরটিকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।

Nao means a heavy ship in Spanish. It is derived from Arabic, and this is explained by the fact of Arab occupation of the region till 1492

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর তারা মাটি স্পর্শ করল। তারা এমন একটা জায়গায় পৌঁছালো যাকে কলম্বাস ইন্ডিয়া বলে ধরে নিলেন। বাস্তবে সেটা ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত Guanahani বলে একটি দ্বীপ। ওই দ্বীপে Arawak-রা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং আনন্দের সঙ্গে তারা তাদের খাদ্য ও পানীয় কলম্বাস ও তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিল। বস্তুত তাদের এই উদারতা কলম্বাসকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর log book এ এই মর্মে লিখেছিলেন, ' তাদের যা কিছু আছে সেসব নিয়ে তারা এত উদার ছিল যে কেউ এগুলো চাইলে তারা অকপটে তা দিয়ে দিত। শুধু তাই

Europeans meet native Americans – a European woodblock print, sixteenth century.

নয়, তাদের খাদ্য ও পানীয়ে ভাগ বসাবার জন্যে আন্তরিকভাবে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাত।"

কলম্বাস গুয়ানাহানির (যার তিনি নতুন নামকরণ করলেন সান সালভাডর-San Salvador) মাটিতে স্পেনের পতাকা উত্তোলন করলেন, এরপর সেখানে প্রার্থনা সারলেন এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে পরামর্শ না করেই তিনি নিজেকে ওই অঞ্চলের ভাইসরয় হিসেবে ঘোষণা করলেন। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা নিয়ে তিনি তাঁর অভিযানকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন এবং Cubanascan (Cuba যাকে তিনি জাপান বলে ভুল করেছিলেন) ও Kiskeya (Hispaniola বলে নতুন ভাবে নামাঙ্কিত এবং বর্তমানে হাইতি ও ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র দুটো দেশে বিভক্ত) নামে আরও দুটো দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ওই অঞ্চলে এরকম তাৎক্ষণিক সোনা পাওয়া যায়নি, কিন্তু অভিযাত্রীরা এরকম শুনেছিল যে Hispaniola-তে সোনা পাওয়া যায়।

কিন্তু তারা আর বেশি দূর যাওয়ার আগেই তাদের এই অভিযান একটি দুর্ঘটনার মুখোমুখি হল, এবং তাদের দুর্ধর্ষ ক্যারিব জনগোষ্ঠীর রোষানলের মুখোমুখি হতে হল। এরকম ক্যারিবীয়তে কলম্বাসের সঙ্গীরা দেখে ফিরে যাওয়ার জন্য আর্তনাদ সুর করল। তাদের ফিরৎ যাত্রা আরও সমস্যা সঙ্কুল হয়ে উঠল কারণ একদিকে তাদের জাহাজগুলো কীটের আক্রমণে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং অন্যদিকে জাহাজ কর্মীরা পরিশ্রান্ত ও বাড়ি ফেরার চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফেরৎ পথে পুরো সমুদ্র যাত্রাটি সময় নিয়েছিল বত্রিশ সপ্তাহ। এরপরেও আরও তিনবার কলম্বাস সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং ওই অভিযানগুলোতে তিনি যেসব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন, সেগুলো হচ্ছে বাহামা, Greater Antilles দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড ও তার উপকূল। পরের অভিযানগুলো থেকে জানা গিয়েছিল যে আগে যে জায়গাকে তিনি ইন্ডিজ বলে ভেবেছিলেন সেটা আসলে ইন্ডিয়ান। এটি একটি নতুন মহাদেশ।

'ভাইসরয়' বলতে রাজাকে বোঝানো হয়েছে। (এখানে, স্পেনের রাজা)

পারাপারহীন সমুদ্রের মধ্যে সীমানা বের করবার কৃতিত্বের দাবীদার ছিলেন কলম্বাস। তাছাড়া ৫ সপ্তাহের সমুদ্র যাত্রায় যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছানোর দিশাও তিনি দেখিয়েছিলেন। ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতিতে স্থান নামাকরণের প্রথা প্রচলিত থাকলেও এটা খুব কৌতুহলের ব্যাপার যে কলম্বাসের স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে USA-র ছোট্ট একটা জেলায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে (কলম্বিয়া)। তবে এদুটো জায়গার একটিতেও তাঁর পদার্পণ ঘটেনি। ফ্লোরেন্স থেকে আগত আমেরিগো ভেসপুক্কি (Amerigo Vespucci) নামে একজন ভৌগোলিকের নামে দুটি মহাদেশের (উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা) নামকরণ করা হয়েছিল। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে একজন জার্মান প্রকাশক প্রথম আমেরিকা নামটি ব্যবহার করেছিলেন।

ইউরোপীয়দের সমুদ্র অভিযান

১৪৯২	কলম্বাস বাহামা দ্বীপপুঞ্জ ও কিউবাকে স্পেনের অধীন বলে দাবী করলেন।
১৪৯৪	অনাবিষ্কৃত পৃথিবীকে পর্তুগাল ও স্পেন এই দুই দেশে বিভক্ত করা হল।
১৪৯৭	জন কেবট নামে একজন ইংরেজ উত্তর আমেরিকার একটি উপকূল আবিষ্কার করলেন।
১৪৯৮	ভাস্ক-ডা-গামা কালিকট (বর্তমানে কোঝিকোড্) পৌঁছুলেন।
১৪৯৯	দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল আমেরিগো ভেসপুক্কির (Amerigo Vespucci) নজরে এল।
১৫০০	কেব্রেল ব্রাজিলকে পর্তুগালের অধীন বলে দাবী করলেন।
১৫১৩	বালকেরা পানামা যোজকটি পেরোলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে প্রত্যক্ষ করলেন।
১৫২১	কর্টেজ আজটেকদের পরাজিত করলেন।
১৫২২	ম্যাগলেন জলপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন।
১৫৩২	পিজাররো (Pizarro) ইনকা সাম্রাজ্য জয় করলেন।
১৫৭১	স্পেনিশীয়রা ফিলিপাইনস অধিকার করলেন।
১৬০০	ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জন্ম নিল।
১৬০২	ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জন্ম নিল।

কার্যক্রম - ৩

কি কি কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণ আবিষ্কারমূলক অভিযানে বেরোনোর মত ঝুঁকি নিয়েছিলেন? এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত কর?

স্পেন আমেরিকায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করল ঃ

বারুদ ও অশ্বযোদ্ধাদের বলে বলীয়ান হয়ে সামরিক ক্ষমতার সাহায্যে স্পেনিশীয়রা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করল। স্থানীয় জনগণ হয় উপঢৌকন দিতে নয়ত সোনাও রূপার খনিতে কাজ করতে বাধ্য হল। আমেরিকা আবিষ্কারের গোড়ার দিকে স্পেনিশীয়রা ওই দেশে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট জনপদের সৃষ্টি করল। প্রতিটি জনপদে কিছু স্পেনিশীয় লোকরা হত, যারা স্থানীয় শ্রমিকদের কাজকর্মের তদারকি করত। স্থানীয় সর্দারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নতুনবসতি খুঁজে বের করতে, বিশেষ করে সোনার খনির সন্ধান করতে। সোনার প্রতি অত্যধিক লোভের দরুণ তারা মরিয়া হয়ে সোনার খনি খুঁজতে শুরু করল, যা তীব্র হানাহানির কারণ হয়ে দাঁড়াল। কেননা অনেক জায়গায় স্থানীয় জনগণ তাদের ওই কাজে বাধা দিতে শুরু করল। স্পেনিশীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসী বার্টোলোম ডি লাস কাসাস (Bartolome de-las Casas) স্পেনিশীয় যোদ্ধাদের একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে স্পেনিশীয়রা সাধারণ আরাওয়াকদের শরীর ফালফাল করে তাদের তরোয়ালের ধার পরীক্ষা করছিলেন।

সামরিক অত্যাচার এবং শ্রমিকদের উপর জুলুম তো চলছিলই সেইসঙ্গে দেখা দিল প্রাণনাশক রোগের প্রাদুর্ভাব। প্রাচীন পৃথিবীর নানা রোগ, বিশেষ করে গুটি বসন্ত রোগে আরাওয়াকরা আক্রান্ত হতে থাকল এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের মধ্যে মৃত্যু মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় জনগণের এরকম ধারণা জন্মেছিল যে ওই বিশেষ রোগটি এক একটি অদৃশ্য বন্দুকের গুলি যা দিয়ে স্পেনিশীয়রা তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। আরাওয়াদের বিলুপ্তি এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া জীবনধারা স্পেনিশীয়দের দ্বারা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতনের একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

কলম্বাসের অভিযানের পর মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আরও কিছু অভিযান সাফল্য লাভ করেছিল। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই স্পেনিশীয়রা আরও কিছু দেশ আবিষ্কার করেছিল,

যার ফলে তারা পশ্চিম গোলার্ধের (৪০০ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪০০ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত) বিস্তৃত এলাকা তাদের বলে দাবী করে বসল, যে দাবির বিরুদ্ধ কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি।

ইতিপূর্বে স্পেনিশীয়রা ওই অঞ্চলের দুটি বড় সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছিল। ওই কাজটি প্রধানত দু'জন ব্যক্তি করেছিলেন ঃ হেরনান কর্টেজ (Hernan Cortes) (১৪৮৮-১৫৪৭) এবং ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro) (১৪৭৮-১৫৪১)। তাঁদের এই বিজয় অভিযানে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন স্পেনের জমিদারেরা, পুরসভাগুলির কর্মকর্তারা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যরা। যারা এই অভিযানগুলোর সঙ্গী হয়েছিল তারা তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই আশায় যে এর বিনিময়ে বিজিত অঞ্চল থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ তারা পাবে।

কর্টেজ এবং আজটেক জাতি ঃ

কর্টেজ এবং তাঁর সৈন্যরা তড়িৎগতিতে এবং নির্মম হাতে মেক্সিকো অধিকার করে নিল। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে কিউবা থেকে সমুদ্র পথে ম্যাক্সিকো অভিযান শুরু করলেন। ম্যাক্সিকোতে তিনি টোটোনাক (Totonac) নামে একটি গোষ্ঠী যারা আজটেক শাসনাধীন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। আজটেক রাজা মন্টেজুমা (Montezuma) তাঁর রাজ্যের একজন কর্মকর্তাকে কর্টেজের কাছে পাঠালেন। মন্টেজুমা স্পেনিশীয়দের আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং তাদের গোলাবারুদ ও বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যের বহর লক্ষ্য করে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে কর্টেজ নির্বাসিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যিনি তাঁর নির্বাসনের প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছিলেন।

ভোনা ম্যারিনা

বার্নার্ড ভিয়াজ ভেল Castillo (১৪৯৫-১৫৮৪) তাঁর 'ট্রু হিস্টরি অব দ্য কংকোয়েস্ট অব ম্যাক্সিকো' বইতে লিখেছেন যে টাবাস্কোর জনগণ কর্টেসকে ভোনা ম্যারিনা নামে একজন সহকারি দিয়েছিলেন। তিনি তিনটি স্থানীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং কর্টেজের দোভাষীর কাজ করতে পারতেন। 'This was the great beginning of our conquests, and without Dona Marina we could not have understood the language of New Spain and Mexico'

ভিয়াজ ভেবেছিলেন তিনি (ভোনা) একজন রাজকুমারী, কিন্তু ম্যাক্সিকোর অধিবাসীরা তাঁকে 'Malinche ' বলত, যার অর্থ বিশ্বাসঘাতকতা। 'Malinchista' শব্দের অর্থ, যিনি দাসবৎ অন্যের পোশাক পরিচ্ছদ ও ভাষা নকল করতে পারেন।

বার্নার্ড ভিয়াজ লিখেছিলেন :
'And when we saw all those cities and villages built in the water, and other towns on dry land, and that straight and level causeway leading to Mexico City,
we wrre dastounded. These great towns and buildings rising from the water all made of stone, seemed like an enchanted vision from the tale of Amadis. Indeed, some of our soldiers asked whether it was not a dream.'

স্পেনিশীয়রা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা Tlaxcalan এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল যারা জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেও শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। স্পেনিশীয়রা নিষ্ঠুরভাবে ওই জাতির বিরুদ্ধে হত্যালীলা শুরু করল। অতঃপর তারা টিনোচটিটলনের (Tinochtitlan) উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর সেখানে পৌঁছুলো।

স্পেনিশীয় আক্রমণকারীরা Tenochtitlan শহরটি দেখে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ওই শহরটি স্পেনের রাজধানী শহর মাদ্রিদের (Madrid) পাঁচগুণ বড় ছিল এবং ওই শহরে এক লক্ষ লোক বসবাস করত যা স্পেনের বৃহত্তম শহর Seville-র জনসংখ্যার দ্বিগুণ।

আজটেকরাজা মন্টেজুমা কর্টেজকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। আজটেকরা স্পেনিশীয়দের শহরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে গেল যেখানে রাজা মন্টেজুমা তাদের নানারকম উপহার দিয়ে আপ্যায়ণ করলেন। Tlaxcalan গণহত্যা কাণ্ডের খবরে ওই দেশের জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ওই

গণহত্যা সম্পর্কে আজটেকরা যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা এই রকম 'এটা এরকম মনে করা হয়েছিল যে টিনচটিটলানের অধিবাসীরা দৈত্যদের আশ্রয় দিয়েছিল। তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল যেন স্পেনিশীয়রা টিনচটিটলানের অধিবাসীদের প্রত্যেককে গিলে খেয়েছিল। সবার মনে ভীতি এতটাই দানা বেঁধেছিল যে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবার পেটের নাড়িভুড়ি বের করে দেওয়া হচ্ছিল...ভয় মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।'

আজটেকের ভয় সত্যে পরিণত হল। কোনো কারণ না দর্শিয়ে আজটেকদের রাজাকে গৃহবন্দি করে রেখে তাঁর নামেই কর্টেজ ওই রাজ্য শাসন করতে শুরু করলেন। স্পেনিশীয়দের কাছে রাজাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে কর্টেজ আজটেকদের মন্দিরগুলোতে যীশু খ্রিস্টের বিভিন্ন মূর্তি বসিয়ে দিলেন। আজটেক রাজা মন্টেজুমা তখন সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আজটেক দেবতা ও যীশুখিস্ট উভয়ের মূর্তিই মন্দিরে স্থাপন করলেন।

ওই সময়ে ম্যাক্সিকো শাসনের ভার তাঁর সেনাপতির হাতে ন্যস্ত করে কর্টেজ কিউবায় ছুটে গেলেন। স্পেনিশীয়দের স্বেচ্ছাচারিতা ও উদ্ধত্ব এবং সেই সঙ্গে ক্রমাগত সোনা দাবী করে তারা স্থানীয় জনগণকে বিদ্রোহী করে তুলল। আজটেকদের বসন্ত উৎসবের সময় আলভারাডো (Alvarado) গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুন কর্টেজ যখন ফিরে এলেন তখন ম্যাক্সিকোতে চরম সঙ্কট চলছিল। উঁচুরাস্তা ও বাঁধ কেটে ফেলা হয়েছিল। সেতুগুলো তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং চারদিকে ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল যার ফলে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে স্পেনিশীয়রা ধুঁকছিল। সবমিলিয়ে পরিস্থি তি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে কর্টেজ ওই দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ওই সময়ে মন্টেজুমা একটি রহস্যজনক কারণে মৃত্যুবরণ করেন। আজটেকরা স্পেনিশীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ৬০০ Conquistadores and তাদের Tlaxcalan-সহযোদ্ধারা অশ্রুপূর্ণ রজনীতে নিহত হয়েছিলেন। কর্টেজ Tlaxcalanতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন নব নির্বাচিত রাজা Cautemoc-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে তার পরিকল্পনা করার জন্য। সেই সময় পর্যন্ত আজটেকরা ভয়ানক গুটি বসন্ত রোগে মারা যাচ্ছিল, যে রোগ ইউরোপীয়রা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। আজটেকরা যখন তাদের শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন মাত্র ১৮০ জন সৈন্য ও ৩০ টি ঘোড়া নিয়ে কর্টেজ টিনচটিটলানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। আজটেকরা ভেবেছিল যে তাদের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে এবং এই কারণে তাদের রাজা নিজেই নিজের জীবন নিয়ে নেওয়াই স্থির করলেন।

ম্যাক্সিকো জয় করতে দু'বছর লেগেছিল। কর্টেজ ম্যাক্সিকোর নিউ স্পেনের ক্যাপ্টেইন জেনারেল হলেন এবং পঞ্চম চার্লস তাকে সংবর্ধনা জানালেন। ম্যাক্সিকো থেকে স্পেনিশীয়রা তাদের কর্তৃত্ব গুয়াটেমালা (Guatemalal), নিকারাগুয়া (Nicaragua) এবং হন্ডুরাস (Honduras) পর্যন্ত বিস্তৃত করল।

Above: A European sketchof Tenochtitlan, sixteenth century. Below: The ground stainway that led to the temples in the centre of Tenochtitlan, now a ruin in Mexico City.

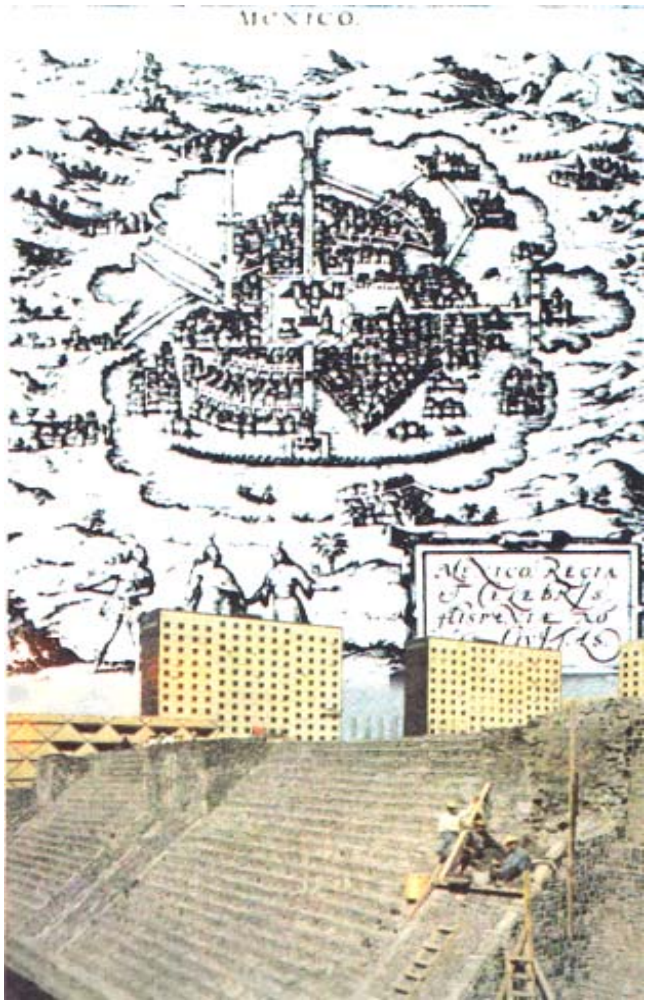

পিজারো এবং ইনকা অধিবাসীরা ঃ

A gold statuette of a woman, Peru. This was found in a tomb which the Spanish missed, and therefore was not melted down.

পিজারো যখন সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন, তখন তিনি কর্টেজের তুলনায় অশিক্ষিত ও গরিব ছিলেন। তিনি গল্প শুনেছিলেন যে ইনকা রাজত্ব রূপা ও সোনার (El-dor-ado) দেশ। তিনি বহুবার চেষ্টা করেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ইনকা রাজত্বে পৌঁছুতে। একবার যাত্রা শেষে ঘরে ফেরার পথে তিনি স্পেনিশীয় রাজার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন এবং সেই সময় ইনকাদের কারিগরি নৈপুণ্যের নিদর্শন চমৎকার স্বর্ণখচিত পাত্র রাজাকে দেখিয়েছিলেন। সেসব দেখে রাজার খুব লোভ হল এবং তিনি পিজারোকে এই মর্মে কথা দিলেন যে তাঁকে ওই দেশের গভর্নর করে দেবেন। পিজারো কর্টেজের শাসনপ্রণালী অনুকরণ করার পরিকল্পনা করলেও পরে হতাশ হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ইনকা সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি মেক্সিকো থেকে আলাদা।

১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের গৃহযুদ্ধেরপর আটাওয়ালপা (Atahualpa) ইনকা সাম্রাজ্যের সিংহাসন দখল করেন। পিজারো ওই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ফাঁদ পেতে ওই রাজাকে বন্দী করলেন। রাজা তাঁর মুক্তিপণ বাবদ একঘর ভর্তি সোনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। (এত বড় অযৌক্তিক মুক্তিপণ অতীতে কেউ ঘোষণা করেছে বলে ইতিহাসে কোনো নজির নেই।) কিন্তু পিজারো তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি বরং তাঁর নির্দেশে ওই রাজাকে মেরে ফেলা হয় এবং পিজারোর লোকেরা উন্মত্তের মত লুটপাট শুরু করে দেয়। এই ঘটনারপরই ইনকা সাম্রাজ্য দখলদারদের আওতায় চলে আসে। বিজয়ীদের নৃশংসতার ফলে ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে ওই দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় সেই বিদ্রোহ দু'বছর স্থায়ী ছিল এবং ওই সময় হাজার হাজার লোক যুদ্ধে এবং মহামারিতে মারা যায়।

পরের পাঁচবছরে স্পেনিশীয়রা পটসিতে (Potosi) (উজান পেরুতে, যার বর্তমান নাম বলিভিয়া) রূপোর খনির সন্ধান পেয়েছিল এবং ওই খনিতে কাজ করানোর উদ্দেশ্যে ইনকার জনগণকে দাস বানিয়ে রেখেছিল।

ক্যাব্রাল এবং ব্রাজিল

পর্তুগীজদের দ্বারা ব্রাজিল দখলের কাজটি হঠাৎ করেই সংঘটিত হয়েছিল। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পেড্রো আলভারেস ক্যাব্রালের (Pedro Alvores Cabral) নেতৃত্বে অনেকগুলো জাহাজের একটা বহর পর্তুগাল থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগর যাত্রা এড়ানোর জন্য তিনি পশ্চিম আফ্রিকা ঘুরে রওয়ানা দিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তিনি ব্রাজিল উপকূলে পৌঁছে গেলেন। পোপ দক্ষিণ আমেরিকার এই পূর্বাঞ্চলটি পর্তুগালের অধীনে বলে তাঁর ম্যাপে দেখিয়েছিলেন। কাজেই ব্রাজিলে পৌঁছে তাদের ধারণা হয়ে গেল যে এই স্থানটি তাদেরই।

পর্তুগীজরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ব্রাজিলের চেয়ে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বৃদ্ধি করার জন্য বেশি আগ্রহী ছিল। কারণ ব্রাজিলে কোনো সোনার খনি ছিল না। কিন্তু সেখানে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষভাবে কাঠ (Timber) যা তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। ব্রাজিলউড গাছ (Brazil wood tree),যে গাছের নামে ইউরোপীয়রা ওই স্থানের নাম দিয়েছিল ব্রাজিল, সেই গাছ থেকে চমৎকার লাল রং পাওয়া যেত। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ওই গাছগুলো কেটে ফেলতে সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিল এবং গাছগুলো কেটে গাছের চেরা টুকরোগুলো জাহাজে বয়ে নিয়ে যেত। বিনিময়ে তারা পেত লোহার চুরি ও করাত, যেগুলো তাদের কাছে ছিল আশ্চর্যজনক জিনিস। (একটি কাস্তে, ছুরি ও চিরুণীর বিনিময়ে তারা ঝুড়ি ভর্তি মুরগি, বানর, তোতা, মধু, মোম, সূতো) ছাড়াও আরও নানারকম জিনিস বয়ে নিয়ে যেত।

"তোমরা ফরাসী ও পর্তুগীজরা কেন এত দূর থেকে কাঠ নিতে আস? তোমাদের দেশে কি কাঠ পাওয়া যায় না?" ব্রাজিলের একজন স্থানীয় অধিবাসী একজন ফরাসী যাজককে এই প্রশ্নটি করেছিল।

তাদের মধ্যে আলোচনা শেষে সে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই পাগল। তোমরা সমুদ্র পার হতে গিয়ে অনেক কষ্ট কর এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য অনেক কষ্ট করে ধন সম্পদ যোগাড় কর। যে দেশ তোমাদের জল হাওয়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে সে দেশ কি তোমাদের পর্যাপ্ত আহার জোগাতে পারে না? আমাদের পিতামাতা আছেন এবং সন্তানরা আছে যাদের আমার ভালবাসি। আমরা নিশ্চিত, যে দেশ আমাদেরবাঁচিয়ে রেখেছিল, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সন্তানদেরও খাদ্য যোগাবে এবং বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের তাই এব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না এবং নিশ্চিন্তে মৃত্যু বরণ করি।"

কার্যক্রম ৪

দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় জনগণের উপরে ইউরোপীয়রা কত টন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল সে নিয়ে আলোচনা কর। ঔপনিবেশিক ও জেসুটদের সম্বন্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর।

কাঠের এই ব্যবসা পর্তুগীজ ও ফরাসী ব্যবসায়িদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পর্তুগীজরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল কারণ তারা ওই উপকূলকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পুর্তগালের রাজা ব্রাজিল উপকূলকে ১৪টি বংশানুক্রমিক ক্যাপ্টেন শাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল।

পর্তুগীজরা যারা ওই ক্যাপ্টেন শাসিত অঞ্চলগুলোতে বাস করতে চেয়েছিল তাদেরকে জমির মালিকানাস্বত্ব প্রদান করা হয়েছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের দাসে পরিণত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অনেক পুর্তগীজ ঔপনিবেশিক ভারতে গোয়ায় যুদ্ধ করে যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপ র নির্মম ব্যবহার করতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর ৪০ এর দশকে (১৫৪০ দশকে) পর্তুগীজরা বড় বড় আবাদি ক্ষেত্রগুলোতে আখ চাষ শুরু করেছিল এবং আখ থেকে চিনি উৎপাদন করার জন্য বড় বড় কারখানাও তৈরি করেছিল। এই ভাবেই উৎপাদিত চিনি পরে ইউরোপে বিক্রি করে দেওয়া হত। এই ধরনের গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় চিনির কলে কাজ করার জন্য তাদের স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে নির্ভর করতে হত। স্থানীয় অধিবাসীরা যখন এই ধরনের ক্লান্তিকর ও ভীতিজনক কাজ করতে অস্বীকার করত চিনির কলের মালিকরা তখন তাদের অপহরণ করত এবং পরে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে কাজ করতে বাধ্য করত।

স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রীতদাস হওয়ার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে লাগল। যতই দিন যেতে লাগল উপকূল অঞ্চলে কচ্চিৎ কোনো গ্রাম দেখা যেত। অন্যদিকে, সেখানে দেখা দিয়েছিল বড় বড় পরিকল্পিত অনেক সুন্দর ইউরোপীয় শহর। আবাদের মালিকেরা তখন ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য অন্য উৎস খুঁজতে বাধ্য হল আর সেই সূত্রটি হল পশ্চিম আফ্রিকা। এই পরিস্থিতিতে স্পেনিশীয় উপনিবেশগুলোর ঠিক উল্টো আজটেক ও ইনকা সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষ খনি এবং মাঠে শ্রমিকের কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই স্পেনিশীয়দের আর কষ্ট করে তাদের ক্রীতদাস বানানোর প্রয়োজন ছিল না, অথবা ক্রীতদাসের খোঁজেও তাদের অন্যত্র যেতে হত না।

'There is no greater curse on a home or family than to be unjustly supported by the sweat of others!' 'Any man who deprives others of their freedom, and being able to restore that freedom, does not do so, is condemned!'

- Antonio Vieira, Jesuit priest in Brazil, 1640s

১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ রাজার অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক সরকার গঠিত হয়েছিল যার রাজধানী ছিল বাহিয়া/সালভাডর (Bahia/Salvador)। ওই সময় থেকে জেসুটরা ব্রাজিলে যাওয়া শুরু করল। ইউ রোপীয় ঔপনিবেশিকরা তাদের অপছন্দ করত, কারণ তারা স্থানীয়দের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার কবার স্বপক্ষে ছিল। তারা জঙ্গলে ও গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে স্থানীয়দের বোঝাতে শুরু করল যে খিস্টধর্ম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে আনন্দে রাখে। সর্বোপরি জেটুসরা দাসপ্রথার কঠোর সমালোচক ছিল।

বিজয়, উপনিবেশ ও দাস ব্যবসা ঃ

অজানা সমুদ্র যাত্রা দিয়ে শুরু হওয়া একটি পর্যায় ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় একটি চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের জনগণ এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে নির্ভয়ে যাতায়াত করার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে

সমুদ্রের কোনো বিশেষ যাত্রাপথ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কোনো কিছু জানা ছিল না। ক্যারিবীয় ও আমেরিকায় কোনো জাহাজ কখনও ঢোকেনি। দক্ষিণ আটলান্টিক ছিল অজানা ক্ষেত্র। কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ আটলান্টিকে ঢুকেনি, পারাপার হওয়া তো দূরের কথা। অথবা আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে বা ভারত মহাসাগরেও কোনো জাহাজ যায়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওই দুরূহ কাজগুলো করা সম্ভব হয়েছিল।

ইউরোপের পক্ষে আমেরিকা আবিষ্কারের প্রভাব শুধু প্রথম পর্যায়ের অভিযাত্রীদের উপর নয় অন্যান্যদের উপরও পড়েছিল। সোনা ও রূপার আমদানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শিল্প বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। ১৫৬০ ও ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ- এই সময়ের মধ্যে একশটি জাহাজ প্রতি বছরই দক্ষিণ আমেরিকার খনি থেকে স্পেনে রূপো বয়ে নিয়ে আসত।

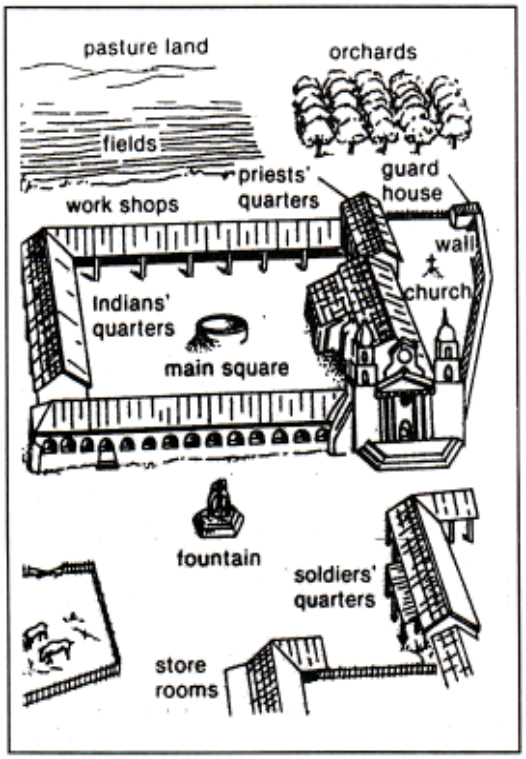

Sketch of a typical Spanish township in South America.

তবে রূপোর এই আমদানি সত্ত্বেও স্পেন ও পর্তুগালের তেমন উপকার হয়নি। তারা তাদের এই বিশাল আয় ব্যবসা বাণিজ্যে অথবা বাণিজ্য তরী নির্মাণের কাজে বিনিয়োগ করেনি। বরং আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন দেশগুলো, যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যান্ড ওই আবিষ্কারের সুবিধা নিতে পেরেছিল। ওই দেশগুলোর ব্যবসায়িরা তাদের দেশে অনেকগুলো জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সৃষ্টি করল। তারা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য অভিযানেও বেরিয়ে পড়েছিল এবং সেই সঙ্গে সেই সব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে ওই দেশগুলোর বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য, যেমন তামাক, আলু, আখ, কোকো, রাবার ইত্যাদির সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচিত করিয়েছিল।

আমেরিকা থেকে আমদানি কৃত কিছু কৃষিদ্রব্য, বিশেষ করে আলু এবং লঙ্কার সঙ্গে ইউরোপীয়রা নতুন করেপরিচিত হয়েছিল। ওই দ্রব্যগুলোকে পরে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষ সহ আরও কয়েকটি দেশেও বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

অপর পক্ষে এই ইউরোপীয় উপনিবেশের ফলে আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীরা যা পেয়েছিল তা হচ্ছে নির্মম গণহত্যা, তাদের নিজস্ব জীবনধারার বিলুপ্তিকরণ এবং খনি, কৃষিকাজ ও কলকারখানার ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া।

একটি পরিসংখ্যান এই ইঙ্গিত দেয় যে প্রাক্ উপনিবেশ পর্বে ম্যাক্সিকোতে ৩০ থেকে ৩৭.৫ মিলিয়ন মানুষের বাস ছিল, অ্যান্ডিয়ান (Andean) অঞ্চলেও ওই সমসংখ্যক মানুষ বাস করত। আবার মধ্য আমেরিকায় বাস করত ১০ থেকে ১৩ মিলিয়ন লোক। ইউরোপীয়দের আগমণের পূর্বে স্থানীয় জনসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩.৫ মিলিয়ন। যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবই এই করুন পরিস্থিতির কারণ ছিল।

The capitalist system of production is one in chich the means of production and distribution are owned by individuals or corporates and where competitors participate in a free market.

আজটেক এবং ইনকা — আমেরিকার এই দুটি প্রধান সভ্যতার আকস্মিক ধ্বংসের ফলে ওই দুটো যুযুধান সংস্কৃতির তুলনামূলক দিকগুলো জনসমক্ষে চলে আসে। আজটেক এবং ইনকা দুটি জাতিরই যুদ্ধ করার প্রধান কৌশল ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিক ও দৈহিক দুভ্রবেই আতঙ্কিত করে তোলা। তাদের মধ্যে হানাহানির প্রধান কারণই ছিল তাদের নিজেদের মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য। স্পেনিশীয়দের সোনা ও রূপোর প্রতি অত্যধিক লিপ্সার কারণ স্থানীয় জনগণের কাছে ধারণাতীত ছিল।

জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রবণতা নৃশংসতার ইঙ্গিতবাহী ছিল। স্থানীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত করা স্পেনিশীয়দের কাছে কোনো নতুন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অভিজ্ঞতা

তাদের কাছে একদম নতুন ছিল, কারণ এই দাসপ্রথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি করেছিল। কর্মস্থলগুলোর পরিবেশ ছিল ভীতিজনক। কিন্তু স্পেনিশীয়রা অর্থনৈতিক লাভের আশায় শোষণ প্রক্রিয়াকেই হাতিয়ার করে নিয়েছিল।

> পেরুর রূপোর খনির কাজ শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বেং সন্ন্যাসী ভোমিনিগো ডে সেন্টো টমাস -Council of the Indian কে জানিয়েছিলেন যে পোটোসি হল একটা নরকের মুখ যা প্রতি বছর হাজার খানেক ভারতীয় গিলে ফেলে এবং লোভী খনি মালিকরা তাদের পথভ্রান্ত পশু হিসেবে গণ্য করে।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ একদিকে যেমন প্রকাশ্যে শ্রমিকদের উপর জুলুমবাজি নিষিদ্ধ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে গোপনে ওই প্রথাকে চালু রাখার ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের এই নতুন আইন পরিস্থিতিটাকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, যখন খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান নির্বিশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং পরে দু'বছরের মধ্যেই তারা রাজাকে বাধ্য করল তার জারি করা ওই আইন বাতিল করতে এবং আবার দাসপ্রথা চালু করতে।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যখন শুরু হল- গবাদি পশু পালনের জন্য জঙ্গলের অনেকটা অংশ পরিস্কার করা হল এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে সোনা আবিষ্কারের পর সোনার খনির কাজ শুরু হল, সেই সময় শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। এটা পরিস্কার হয়ে পড়েছিল যে স্থানীয় অধিবাসীরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, তাই বিকল্প হিসেবে আফ্রিকার দিকে নজর দেওয়া হল। ষোড়শ শতাব্দীর ৫০-এর দশকে (১৫৫০ দশকে) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশকের (১৮৮০ দশকে) (যখন ব্রাজিলে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছিল) মধ্যভাগে ৩৬ লক্ষ আফ্রিকীয় ক্রীতদাস ব্রাজিলে আমদানি করা হয়েছিল। এই সংখ্যা গোটা আমেরিকার আফ্রিকীয় যত ক্রীতদাস আমদানি করা হয়েছিল যাদের মধ্যে অনেকে ন্যূনতম ১০০০ ক্রীতাদসের মালিক ছিলেন।

MAP 3: Africa, indicating regions from where slaves were captured

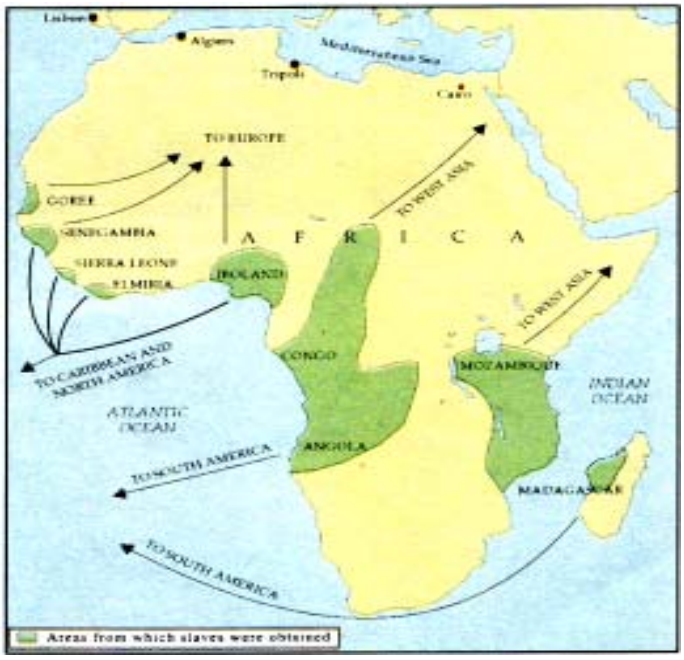

অষ্টাদশ শতাব্দীর ৮০-র দশকে (১৭৮০ দশকে) দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল সেখানে ওই ধরনের মানুষও ছিলেন যারা এই মর্মে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় আসার আগেও এখানে দাসপ্রথা ছিল। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আফ্রিকায় শ্রমিকদের বড় অংশই ছিল ক্রীতদাস। তারা এই মর্মেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে যুবক যুবতীদের ধরে আফ্রিকীয়রাই ক্রীতদাস হিসেবে ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করে দিত যার বিনিময়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত শস্য (মকই, ম্যানিয়ক, ও কাসাভা, যেগুলো তাদের প্রধান

খাদ্যে পরিণত হল) তাদের প্রদান করা হত। দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ওলাউদা ইকুইয়ানো (Olaudah Equiano) আত্মজীবনীতে ওই যুক্তিগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করা হত। বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশকে (১৯৪০ দশকে) এরিক উইলিয়ামস্ (Eric Williams) নামে একজন আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁর 'ক্যাপিটেলিজম এন্ড স্লেভারি (Capitalism and Slavery) বইতে নতুন করে আফ্রিকীয় ক্রীতদাসদের দুর্দশা নিয়ে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলাতে ইউরোপীয় উপনিবেশিকেরা স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন দেশ গড়তে ঠিক সেভাবে যেভাবে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আমেরিকার ১০ টি উপনিবেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিল।

দক্ষিণ আমেরিকাকে বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকা বলা হয়, কারণ আমেরিকা মহাদেশের দুটি প্রধান ভাষা, যথা স্পেনিশীয় ও পর্তুগীজ ভাষা দুটি ল্যাটিন ভাষা থেকে সৃষ্ট। প্রধানত স্থানীয় ইউরোপীয় (native Europeans) সম্প্রদায়ের লোক (যাদের বলা হয়-Creole), ইউরোপীয় এবং আফ্রিকা থেকে আগত মানুষই দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান অধিবাসী। ওখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই হচ্ছে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের সংস্কৃতি স্থানীয় ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. আজটেক সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটামিয়ার সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা কর।
২. পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নৌবিজ্ঞানে কি কি নতুন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল?
৩. কিকি কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগালই প্রথম আটলান্টিক অভিযান শুরু করেছিল?
৪. কোন কোন নতুন খাদ্যদ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে চালান করা হয়েছিল?

সংক্ষেপে বর্ণনা কর

৫. সতেরো বছর বয়সে ব্রাজিলে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে আসা একটি আফ্রিকীয় বালকের জীবন কাহিনী বর্ণনা কর।
৬. দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার কিভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশকদের পথ সুগম করেছিল?

৪

আধুনিকতার পথে

TOWARDS MODERNISATION)

শিল্প বিপ্লব

দেশীয় লোকের স্থানচ্যুতি

আধুনিকতার বিভিন্ন দিশা

আধুনিকতার পথে

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পড়েছি কিছু নিশ্চিত প্রামাণিক উন্নতির সম্পর্কে যা মধ্যযুগ ও আধুনিক পৃথিবীর প্রাক্কাল সম্পর্কিত সামন্তবাদ (feudalism) ইউরোপিয়ান আমেরিকার লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ। আধুনিক যুগের অনেক উপাদানই আমরা সেই মধ্যযুগের সময়কাল থেকে পেয়েছি। যার শুরু হয়েছিল পনেরো' (১৫০০) শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে।

পৃথিবীর দুটো ঘটনার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল আজকের আধুনিকতাবাদ। সেগুলো ছিল শিল্পবিপ্লব, অনেকগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন যা রূপান্তরিত করেছিল প্রজাদেরকে নাগরিক হতে যার হয়েছিল আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬-৮১) এবং ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে। (১৭৮৯-৯৪) ব্রিটেনকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম শিল্পনগরীর দেশ (Industrial Nation) এবং তোমারা পড়ে তা জানতে পারবে কিরূপে তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল প্রসঙ্গ ৯-এ। বহুদিন ধরে এটা বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ শিল্পায়ন, অন্যান্য দেশের কাছে তাদের শিল্পায়নের এক নমুনা বিশেষ ছিল যা তারা তৈরি করতে পেরেছিল। প্রসঙ্গ ৯-এ দেখানো হয়েছে কিরূপে ইতিহাসবিদগণের মনে এ প্রশ্ন শুরু হয়েছিল শিল্পবিপ্লব নিয়ে কিছু প্রাচীন চিন্তাধারা ও মতবাদ। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছিল অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার কথা কোনও প্রকার তথ্য সূত্রের উপর ভিত্তি না করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্রিটেনে প্রাথমিক স্তরে শিল্পায়ন ঘটেছিল কয়লা ও তুলার শিল্পায়নের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রারম্ভে শিল্পায়নের সূত্রপাত হয়েছিল রেললাইন আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে। রাশিয়ায় শিল্পায়ন ঘটেছিল তার অনেক পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। প্রাথমিক স্তরে রেলওয়ে ও ভারিশিল্প গড়ে উঠেছিল শিল্পায়নের ফলে নিজস্ব গতিতে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্কের ভূমিকা ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে আলাদা আলাদা। প্রসঙ্গ ৯-এ ব্রিটিশ এহেন অবস্থায় আশাবাদী হয়ে কৌতূহল এনেছিল শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ক সম্পর্কে অন্যান্য যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি যাদের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পসংক্রান্ত শক্তি ছিল।

প্রসঙ্গ ৯-এ গুরুত্ব আরোপ করেছিল মানবিকতার ও বাস্তবিকতার দাম যা ব্রিটেনের শিল্পায়নের উপর পড়েছিল এবং এই শিল্পায়নের ফলে দরিদ্র শিশু শ্রমিক, বিশেষত শিশুদের অবহেলিত পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ এবং নানা ধরনের মারাত্মক রোগের প্রকোপ যেমন, কলেরা, যক্ষ্মা ইত্যাদির উপরও প্রভাব ফেলেছিল। প্রসঙ্গ এগারোতে একইভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি শিল্প দূষণ এবং (Cadmium) পারদ (Mercury) নামক ধাতুর বিষাক্তকরন সম্পর্কে যা জাপানে মানুষকে উত্তেজিত করেছিল গণ আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বিশৃঙ্খলাযুক্ত শিল্পায়ানের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় শক্তি, শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে আমেরিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের উপনিবেশবাদের কবলে নিয়ে এসেছিল। প্রসঙ্গ তোমাদেরে বলেছিল ইউরোপের নাগরিকরা আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দেশীয় লোকেদের সঙ্গে কি করেছিল। বুর্জোয়া মানসিকতার এই বসবাসকারীরা তাদেরকে তৈরি করেছিল সবকিছু কিনতে

Linking the world – In 1927 Charles Lindbergh, twenty-five years old, flew across the Atlantic Ocean, from New York to Paris, in a single-engine aeroplane.

ও বিক্রি করতে, তার মধ্যে জমি ও জল ছিল। দেশীয় লোকেদেরকে প্রস্তুত করা হয়েছিল ইউরোপিয়ান-আমেরিকানদের নিকট অসভ্য বলে, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "যদি তোমরা পরিষ্কার বাতাবরণ ও পরিষ্কার ঝকঝকে জলকে তোমাদের নিজের মতো করতে না পার তবে তা কিরূপে একজন ক্রয় করবে?" দেশীয় লোকেরা তাদের নিজের ভূমি, মাছ বা জন্তুজানোয়ারদের নিজের বলে ভেবে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ মনে করেনি। তারা এগুলোকে বস্তু হিসেবে নিজের করে নেওয়ার মতো কোনও ধরনের ইচ্ছা ছিল না। প্রয়োজনে তা বিনিময় করতো এবং শুধু উপহার বলে মনে করতো।

এভাবেই পুরোপুরিভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল লোকেরা এবং ইউরোপিয়ানরা এর প্রতিনিধিত্ব করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে সভ্যতার গতির সঙ্গে। প্রাক্তনরা ইউরোপিয়ানদের সম্মতি দেয়নি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার জন্য প্লাবন আনতে যদিও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কেনেড়িয়ান সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল মূল স্রোতে যোগদান করার জন্য এবং ঠিক সে সময় অস্ট্রেলিয়ান সরকার চেষ্টা করেছিল শুধুমাত্র তাদের চিরাচরিত প্রথা ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করতে। কেউ শুনলে অবাক হবে মূল স্রোত কৃষ্টিকে তৈরি করতে? পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ (Western Capitalism) বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় (Mercantile), শিল্প সংক্রান্ত বিষয় (Industrial) এবং আর্থ সম্বন্ধীয় বিষয় (Financial)—এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে জাপানিজ পুঁজিবাদী তৈরি করেছিল ঔপনিবেশ তৃতীয় বিশ্বের এক বিশাল অংশে। তাদের অনেকেই ছিল ঔপনিবেশ নির্মাতা। অন্যরা, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতে ব্রিটিশ শাসন সরাসরি তখন সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে চীন তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

Linking the world – J. Ltpchitz's Figure, *sculpted in the 1920s, shows the influence of central African statuary*

এখানে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা এবং জাপান প্রভৃতি দেশ অবাঞ্ছিতভাবে চীনের আভ্যন্তরীন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছিল যদিও তারা চীনের শাসন ব্যবস্থার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নাই। তারা চীনের উপাদানগুলোকে নিজেদের সুবিধার জন্য শোষণ করতে আরম্ভ করেছিল এবং গুরুত্ব সহকারে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে আপসে মীমাংসা করেছিল এবং চীনের ক্ষমতা কমিয়ে তার মর্যাদা অর্ধ্ব-ঔপনিবেশবাদে পর্যবেশিত করেছিল।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরোধিতা করেছিল শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনগুলি। তথাপি জাতীয়তাবাদ পশ্চিমের দেশে জেগে উঠেছিল যা ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন ছিল পশ্চিমে বা জাপানে। প্রত্যেক দেশের জাতীয়তাবাদের মূল মন্ত্র ছিল জনসংক্রান্ত সার্বভৌম (Popular Sovereignty)। জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বা বিপ্লবগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে হস্তান্তর কার এবং তা ধীরে ধীরে তৈরি করেছিল জাতীয়তাবাদকে আধুনিক মতবাদে। নাগরিক সম্পর্কিত (Civic Nationalism) জাতীয়তাবাদের ফতোয়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সার্বভৌমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তারা অনুসন্ধান করেছিল এমন একটি জাতিগোষ্ঠী তৈরি করার প্রয়োজন, যারা হবেন অধিকার অনুশীলনকারী জনগণ এবং বর্ণনা করবেন জাতি তত্ত্বকে নাগরিক তত্ত্বের সংজ্ঞায়, যার ভিত্তি আঞ্চলিকতাবাদ বা ধর্মের উপর ছিল না। আঞ্চলিকতাবাদ চেষ্টা করে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে তার আশপাশের ভাষার উপরও একগুচ্ছ চিরাচরিত প্রথা যা বর্ণনা করেছে লোকেদের জাতিগতভাবে, সাধারণ নাগরিকের সংজ্ঞায় নয়। বহু ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠীক দেশ, জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদীর সংকুচিত করেছিল ব্যক্তির দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে; এবং প্রায়ই ধারণা করেছিল উচ্চতর সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী উর্ধ্বস্ত হয়ে থাকার।

Linking the world – Japanese Zen paintings like this one were admired by western artists, and influenced the 'Abstract Expressionist' style of painting in the 1920s in the USA.

আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ জাতিবোধ (Nationhood) শব্দটির বর্ণনা দেয় নাগরিকরা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিকতাবাদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি না করে।

এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রমী দেশ হচ্ছে জার্মানী, যেখানে মানব জাতি তত্ত্ববোধ চিন্তাধারাগুলি ছিল

দীর্ঘ ও জটিল জীবনচক্রের দ্বারা যার পিছনের প্রতিক্রিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি তবে দেখা যায় ফরাসীরা সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে জার্মানিকে দখল করেছিল ১৮০৬ সালে।

আদর্শের দিক থেকে নাগরিক সম্বন্ধীয় জাতীয়তবাদ বর্ণিত হয়েছে সেই আঞ্চলিকতাবাদ, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বা পৃথিবী অতিক্রান্ত করেছে তথাপি আধুনিক ভারত, চীন এবং জাপানে তা এখনও দেখা যায়। শিল্পায়নের সঙ্গে আধুনিকতার পথও প্রশস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন সমাজ থেকে উদ্ভব হয়েছিল স্বচ্ছ আধুনিক মতবাদ।

এক্ষেত্রে জাপান ও চীনের প্রসঙ্গ ছিল খানিকটা নির্দেশমূলক বা শিক্ষামূলক। জাপান সমর্থ হয়েছিল ঔপনিবেশিক দমন নীতি থেকে নিজেদেরকে যুক্ত করতে এবং সম্পূর্ণ বিংশ শতাব্দীতে পুরোপুরিভাবে অর্জন করেছিল অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের মর্মান্তিক পরাজয়ের পর তার আর্থনীতির পুনর্গঠন, যা দেখা হয়নি একটি অবিমিশ্র যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা হিসেবে। প্রসঙ্গ এগারো নম্বরে বলা হয়েছে যে তার ফলাফল কিছু নির্দিষ্ট পাওয়া জয় যাতে উন্নতির বীজ নিহিত ছিল ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে। তোমরা কি জান, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯১০ সালে পড়াশুনার জন্য টিউশন ফিজ্ (Tution Fees) প্রাথমিক স্তরের স্কুলে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তার তালিকা সার্বজনীন করা হয়েছিল। অন্যান্য দেশের মতো জাপানের আধুনিকীকরন প্রক্রিয়ার পথ তাদের নিজেদের কাছেই এক সমস্যা হয়েছিল। গণতন্ত্র ও সামরিক, জাতিগত জাতীয়তাবাদ ও নাগরিক সম্বন্ধীয় জাতি গঠনের মধ্যে, যাকে বহু জাপানিরা বর্ণনা করেছিল 'পরম্পরাগত মতবাদ' বা পাশ্চাত্যকরন প্রক্রিয়া।

অন্যদিকে চীনারা তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ প্রক্রিয়া দমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আমলাতান্ত্রিক ভূমি নির্ভর দলের সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের যুগ্মশক্তির মাধ্যমে সমর্থ হয়েছিল কৃষকদের অসন্তোষ, সংস্কার এবং বিপ্লব গড়ে তুলতে; যা ছিল তাদের দেশের এক অভিনব পদ্ধতি। ১৯৩০ সালের প্রারম্ভে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিল কৃষকদের দ্বারা তা সবল করতে এবং সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, তাতে প্রতিনিধিত্ব করেছিল দলের বাছাই করা সেরা ব্যক্তিবর্গরা। শুরু হয়েছিল নতুন মতবাদ কার্যকরী করার প্রয়াস দেশের বাছাই করা অঞ্চল বা প্রান্তগুলোতে। তার মানব জাতির ও রাজনৈতিক সমতাবাদী ভাবধারা চাপ সৃষ্টি করেছিল ভূমি সংস্কার ও মহিলাদের সমস্যা সম্পর্কিত সচেতনতার উপর, যার সাহায্যে সমর্থ হয়েছিল ১৯৪৯ সালে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তবাদী মতবাদে অবলম্বনকারীদের উৎখাত করতে। একদা ক্ষমতায় থাকা যারা সমর্থ হয়েছিল অসমতা কমাতে শিক্ষার প্রসার এবং রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষের মাধ্যমে। তথাপি ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের পর একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল দ্বারা শাসন পরিচালন হওয়া সত্ত্বেও দেশে নানা ধরনের অসন্তোষের বাতাবরন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থ হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ তাদের হাতে রাখতে দেশের উপর বহুল ভাবে, তার কারণ ছিল তাদের কিছু বাণিজ্যিক নীতি যা তাদেরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিল এবং তারা পরিশ্রমী করেছিল চীন জাতিকে এবং রূপান্তরিত করেছিল চীনকে এক অর্থনৈতিক শক্তিশালী কেন্দ্রে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে বুঝতে সমর্থ হয়েছিল আধুনিকতার সংজ্ঞা এবং সাফল্যের দাবিদার হয়েছিল প্রত্যেক তাদের নিজস্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভাবনার উপর নির্ভর করে যা তৈরি করেছিল তাদের জীবন কথার রোমাঞ্চকর গল্প। এই বিভাগ তোমাদেরকে পরিচিত করবে কিছু বিষয়বস্তু সেসব গল্পের সঙ্গে।

সময়সূচী (চতুর্থ)

(১৭০০-২০০০)

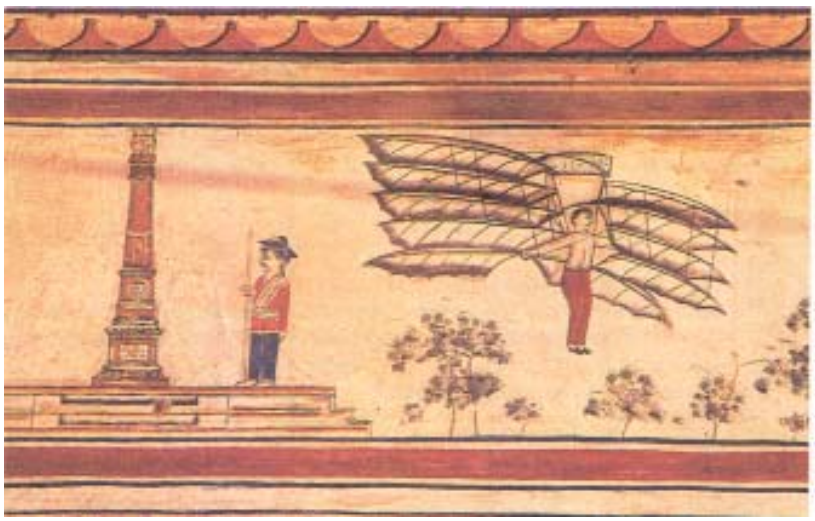

শেষ তিনটি শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যা ঘটেছিল এবং কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল আজকের এই আধুনিক পৃথিবী তা আমরা সময় পথ (timeline) থেকে ধারণা করতে পারি। আমাদেরকে বলে দেয়, দাস, ব্যবসা আফ্রিকায় আপারট্হীড রাজত্বের ইতিহাসের কথা এবং ইউরোপের সামাজিক আন্দোলন ও জাতির ইতিহাসের গঠনের প্রাসঙ্গিকতা।

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার উপনিবেশের ধারা, গণতান্ত্রিক ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধাচরণ বলপূর্বক নীতির মাধ্যমে লড়াই চলে শেষ শতাব্দী পর্যন্ত।

এখানে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিছু আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিকল্পে যা আধুনিকতার প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সব সময় সূচীর সঙ্গে, এটি কিছু তারিখকে কেন্দ্রীভূত করেছে। অন্যান্যগুলোও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। যখন তোমরা ধারাবাহিক ভাবে তারিখগুলো সময় পথে দেখতে পাও, ভেবনা যে সেগুলি তারিখ সম্পর্কে শুধু তোমাদের জানার প্রয়োজনাবোধ রয়েছে। খুঁজে দেখ কেন বিভিন্ন সময় পথসূচী আলোকপাত করেছে বিভিন্ন ধরনের তারিখের উপর এবং এই মনোনীত তারিখগুলো আমাদের কি বলে দেয়।

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
১৭২০-৩০	পশ্চিম আফ্রিকায় ডাহমের রাজা আগাজা (king Agaja of Dahomey) , এ সময়ে দাস ব্যবসা বন্ধ করেছিল। ১৭৪০ সালে তা পুনরায় চালু করা হয়েছিল	
১৭৩০-৪০		কেরোলাস লিনেউয়াস (Caroluslinnaeus) ১৭৩৫ সালে শ্রেণী বিন্যাসমূলক পদ্ধতির দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন।
১৭৪০-৫০		
১৭৫০-৬০	১৭৫৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে আগত নাবিকদের দ্বারা বাহিত বসন্ত রোগ প্রথম দেখা দিয়েছিল।	
১৭৬০-৭০		
১৭৭০-৮০	আন্তর্জাতিক দাস ব্যবসা উন্নতির চরমে শিখরে উঠে। সব ঔপনিবেশিক দেশগুলি তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার নিগ্রোদের ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের জাহাজেই মৃত্যু ঘটত।	Gmelian pugachev এর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন শুরু হয় (১৭৭৩-৭৫) যা রাশিয়ার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।
১৭৮০-৯০		১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা ।
১৭৯০-১৮০০		
১৮০০-১৮১০	মোহম্মদ আলী ইজিপ্ট শাসন করেছিলেন, ১৮০৫-৪৮, ইজিপ্ট ও টামান সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায়।	
১৮১০-১৮২০		
১৮২০-৩০	লাইবেরিয়ায় পশ্চিম আফ্রিকায় ১৮২২ সালে মুক্ত ক্রীতদাসদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিল।	১৮২৩ সালে লুই বেরিলি বিকাশ করে থাকে হাতের আঙুল পড়ার নিয়ম (১৮২৫) সালে চালু হয়েছিল ইংল্যান্ডে যাত্রী চলার রেল।
১৮৩০-৪০	আলজারিয়ায় ফরাসী অবস্থানে বিরুদ্ধে আব্দুল কাদিরের নেতত্বে আরব প্রতিরোধ করে ফরাসীদের অবস্থান আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে।	
১৮৪০-১৮৫০		উদারপন্থী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ইউরোপের বহু দেশে ১৮৪৮ সালে আরম্ভ হয়।
১৮৫০-৬০		
১৮৬০-৭০	সুয়েজ কৃত্রিমনালা (Suez Canal) পৃথিবীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ যা খোলা হয় ১৮৬৯ সালে।	রাশিয়ার সার্ফরা মুক্তিলাভ করে ১৮৬১ সালে।

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
১৮৭০-৮০		একতাবদ্ধ জাতিরাষ্ট্ররূপে জার্মানী ও ইটালির অভ্যুদয়।
১৮৮০-৯০	আফ্রিকা বিভাজন নিয়ে ইউরোপীয়ানদের মধ্যে লড়াইয়ের শুরু।	
১৮৯০-১৯০০		১৮৯৫ সালে প্রথম সিনেমা তৈরি হয়। ১৮৯৬ সালে এথেন্স-এ প্রথম আধুনিক আলিম্পিক শুরু হয়।
১৯০০-১৯১০	১৯০৬ সালে বর্ণবিদ্বেষ আইনের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন	
১৯১০-২০	১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় শেতাঙ্গ লোকদের জন্য ৮৭ শতাংশ জমি সংরক্ষণের আইন প্রণয়ন করা হয়।	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) রাশিয়ার বিপ্লব ১৯১৭ সনে।
১৯২০-১৯৩০		১৯২৩ সালে মুস্তাফা কেমেলের অধীনে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
১৯৩০-১৯৪০	প্রথম ট্রেন্স-আফ্রিকান রেললাইন এনগোলা থেকে মোজামবিক পর্যন্ত) ১৯৩১ সালে সমাপ্ত হয়েছিল (Angola toMozambique)	১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির ক্ষমতা দখল করে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)
১৯৪০-১৯৫০	আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতা লাভ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৯৪৮) (Apartheid) আপারটহীড নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।	১৯৪৯ সালে ব্রিটেন আইরিশদের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিল।
১৯৫০-৬০	আফ্রিকাতে সাহারার পিচ পর্যন্ত বা কাছাকাছি প্রথম স্বাধীন দেশ যানা (১৯৫৭)	ডি এন এ (DNA) আবিষ্কার। ১৯৫৭ সালে রাশিয়া স্পেসক্রাফট স্পুটনিক (spacecraft sputnik) নিক্ষেপ করে।
১৯৬০-১৯৭০	আফ্রিকান উনিটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা) (১৯৬৩) (organisation of African Unity)	ইউরোপে ১৯৬৮ সালে প্রতিবাদ আন্দোলন। (Protest Movement)
১৯৭০-১৯৮০		
১৯৮০-১৯৯০		১৯৮৫ সালে মিখেইলগরভাচভ (Mikhail Gorvachev) ইউনাইটেড সোভিয়েত সোসিয়েলিস্ট রিপাবলিক (USSR) এর নেতা হন (১৯৮৫); বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু (১৮৮৯)
১৯৯০-২০০০	দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসেন মেণ্ডেলা বন্ধনমুক্ত হন (১৯৯০) বন্ধনমুক্ত আপারটহীড অগ্রগতির শুরু হয়।	বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি ডলিকে ক্লোন করে নতুন ঝড়ের (১৯৯৭) ভেড়া পাবক করেন উদ্ভব সম্বন্ধীয় কারিগরি বিদ্যার সীমা রেখার উপর সমালোচনার শুরু হয়।

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৭২০-৩০	চিনের মাঞ্চু শাসক kangxi এর তত্বাবধানে গুদিন টুসু জিচেং সর্ববৃহৎ জ্ঞানকোষ প্রকাশিত	
১৭৩০-৪০		
১৭৪০-৫০		উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি।
১৭৫০-৬০	জাপানি পণ্ডিত Aoki Konyo ১৭৫৮ সালে সংকলিত করেন। ওলন্দাজ-জাপান আভিধান	পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজদৌল্লা, বাংলার নবাবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, (১৭৫৭)।
১৭৬০-৭০		
১৭৭০-৮০		
১৭৮০-৯০	ব্রিটিশরা গাজা (opium) রফতানি করতো ভারত থেকে চিন দেশে যা নাটকীয়ভাবে বিস্তার লাভ করে।	
১৭৯০-১৮০০		রঞ্জিৎ সিং শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৯৯)
১৮০০-১৮১০		
১৮১০-১৮২০		
১৮২০-১৮৩০	ডাচদের বিরুদ্ধে জাভানিজদের বিদ্রোহ ঘোষণা (১৮২৫-৩০)	সতীদাহ প্রথা বেআইনি ঘোষিত হয় (১৮২৯)।
১৮৩০-৪০	ওটামান সুলতান আব্দুল মজিদ আধুনিকতার পরিকল্পনার শুরু করেন (১৮১৯)	
১৮৪০-৫০		
১৮৫০-৬০	থাইল্যান্ডের রাজা চতুর্থ রামা থাইল্যান্ড শাসন করেছিল এবং অবাধ বৈদেশিক নীতি দেশের সাথে চালু করেন (১৮৫৬)	রেললাইন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পত্তন হয় ১৮৫৩ ১৮৫৭ সালে শুরু হয় বিখ্যাত বিদ্রোহ।
১৮৬০-৭০	ফরাসীরা ভারত-চিন দখল করতে আরম্ভ করে (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার) ১৮৬২ সালে।	
১৮৭০-১৮৮০	জাপানে প্রথম রেললাইনের শুরু টোকিও থেকে হোকোহামা (১৮৭২) (Tokyo to Yokohama)	(Famin) ভারতের দাক্ষিণাত্যে খবার প্রকাশে (১৮৭৬-৭৮), পাঁচ মিলিয়নের চেয়ে বেশি লোকের মৃত্যু হয়।
১৮৮০-৯০	ব্রিটিশের বার্মা অধিগ্রহণ (মায়ানমার) (১৮৮৫-৮৬) সালের মধ্যে।	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)
১৮৯০-১৯০০		
		The First Indian National Congress 1885

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৯০০-১০	জাপানের নৌবাহিনী ১৯০৫ সালে রাশিয়াকে পরাস্ত করে	
১৯১০-২০	(বলফোরের ঘোষণা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় ইহুদিদের মাতৃভূমি পেলেসটাইন ১৯১৭() সালে হস্তান্তর করার জন্য)।	
১৯২০-৩০		অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়। তামিলনাড়ুতে ইভি রামস্বামী নেইকার শুরু করেন সেল্‌ফরেসপেকট আন্দোলন (১৯২৫) সালে।
১৯৩০-৪০	ব্রিটিশ পাইপলাইন খোলা হয় ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ১৯৩৪ সালে।	আর্দেশী ইরানীর দ্বারা আলম আরা প্রথম ভারতীয় সবাক ছবি (১৯৩১) হচ্ছে
১৯৪০-৫০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে জাপানি নগরী হিরোসিমা ও নাগাসাকি অঞ্চলে (১৯৪৫) প্রায় ১ লক্ষ বিশ হাজার সাধারণ লোক মারা যায়। রেডিয়েশনের কারণে পরেও বহু লোক মারা যায়; চিনে পিপলস্ রিপাবলিক গঠন (১৯৪৯)।	ভারতছাড় আন্দোলন (১৯৪২) ভারত ও পাকিস্তানে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন হয় ১৯৪৭ সালে।
১৯৫০-৬০	বানডুঙ্গ কনফারেন্স নো্ট নিরপেক্ষ Non Aligned আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে।	ভারত প্রজাতন্ত্র দেশে ঘোষিত হয় (১৯৫০)
১৯৬০-৭০	আরব নেতারা প্যালেস্টাইন লিবারেশন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন প্যালেস্টাইন রিফউজিদেরকে সংঘটিত করার জন্য (১৯৬৪)	পৃথিবীর প্রথম হিলা প্রধানমন্ত্রী হন সিরিমেডো বান্ডারনেইক (১৯৬০) (Sirimavo Bandarnaik
১৯৭০-৮০	ইরানের শাহ গতিচ্যুত হন (১৯৭৯)	বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়।
১৯৮০-১৯৯০	চীনের বেইজিং শহরের তাইনানমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্র আদায়ের জন্য অধিকাংশ লোকের ধর্না (১৯৮৯)	Union Carbide pesticides এর এর উৎপাদনে ক্ষেত্রে গ্যাস হওয়ার দরুণ এক বীভৎস কাণ্ড ঘটেছিল ভূপালে যা পৃথিবীর অন্যতম শিল্প নিঃসরণ ধ্বংসলীলা বলে পরিচিত। হাজারো লোক মারা যায়।
১৯৯০-২০০০	গাল্‌ফ যুদ্ধ ইরাক, কোয়েত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে	ভারত ও পাকিস্তানের পারমানবিক শক্তি প্রদর্শন (১৯৯৮)

তারিখ	আমেরিকা	প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
১৭২০-৩০	পূর্তগীজরা কফির প্রচলন করে ব্রাজিলে (১৭২৭) সাল	ওলন্দাজ নাবিক বোজিঙিন পোঁছায় (Roggeveen) সেমুয়াদ্বীপে এবং ইস্টার দ্বীপে পেসিফিক মহাসাগরে (১৭২২)
১৭৩০-৪০	শিক্ষিত কৃতদাসজেমি স্টোনোস্লেব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। (১৭৩৯)	
১৭৪০-৫০	Juan Santos কে Atahualpa-II জাউন সেনতোস বলে অভিহিত করা হয়েছিল। পেরুর দেশীয় আমেরিকানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অসফল বিদ্রোহের জন্য (১৭৪২)	
১৭৫০-৬০	-	-
১৭৬০-৭০	ওট্টিয়া জাতির প্রধান পনটিয়াক নেতৃত্ব দিয়েছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক আন্দোলনের (১৭৬৩)	ক্যাপ্টেন জেইমস কোরাস্ পেসিফিক মহাসাগরে তিনটি অভিযান প্রথম পাঠান। (১৯৬৮-৭১)
১৭৭০-৮০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬)	
১৭৮০-৯০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি করা হয়। ডলার প্রথম আমেরিকার কারেন্সি হিসেবে ব্যবহার করা হয় (১৭৮৭)	প্রথম ব্রিটিশ জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার বোটানি সমুদ্রে (Botany Bay) অপরাধী হয়ে দণ্ডিত হয় (১৭৮৮)
১৭৯০-১৮০০	—	—
১৮০০-১০	—	Mathew Finders, জলপথে প্রদক্ষিণ করা ব্যক্তি, অস্ট্রেলিয়া নাম দেন। যার অর্থ দক্ষিণাঞ্চল (১৮০১)
১৮১০-২০	—	—
১৮২০-৩০	সিমন বলিভাব (Simon Bolivar) ভেনিজুয়েলার স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা করেন (১৮২১)	—
১৮৩০-৪০	কান্নারঝড়; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, হাজার লোক, পূর্বে অবস্থিত দেশীয় আমেরিকান যাদেরকে বাধ্য করা হয় পশ্চিমের দিকে যাওয়ার জন্য। অনেকেই পথে মারা যায় (১৮৩৮)	চার্লস গরউইন (Charles Darwin) প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রা করেন, গালা পগোস দ্বীপে-এ (১৮৩১) সালে মানব উৎপত্তির মতবাদকে উন্নত করার প্রয়োজনে।
১৮৪০-৫০	নিউইর্কের সেনিকা ফলস্ এ সমাবেশ, আমেরিকার মহিলাদের সমান অধিকার নিয়ে আহ্বান করা হয় (১৮৪৮)	ব্রিটিশ এবং মাওরিস নিউজিল্যান্ড ওয়েটাঙ্গি সন্ধি সাক্ষর করেন। যার অনুকরণে লাগাতার মাওরি (Maori) বিদ্রোহ শুরু হয় (১৮৪৪-৮৮)
১৮৫০-৬০		অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম নিয়মিত বাষ্প চালিত জাহাজ সেবা চালু করা হয় (১৮৫৬)

তারিখ	আমেরিকা	প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ
১৮৬০-৭০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) তেরো নম্বর সংবিধান সংশোদনে দাসত্বকে আইন বহির্ভূত বলে ঘোষিত করা হয়।	
১৮৭০-৮০	টেলিফোন, রেকর্ডপ্লেয়ার, ইলেকট্রিক বাল্বের	
১৮৮০-৯০	আবিষ্কার কোকাকোলার আবিষ্কার Coca cola	
১৮৯০-১৯০০		নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ভোট দানের অধিকার ১৮৯৩ সালে দেওয়া হয়েছিল।
১৯০০-১৯১০	রাইট ব্রাদার্স উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন (১৯০৩)	পশ্চিম সেমুয়া (Samoa) অঞ্চলে জ্বর এবং
১৯১০-২০	হেনরী ফোর্ড গাড়ি উৎপাদনের মেলা শুরু করেন (১৯১৩) পানামা কৃত্রিমনালা ভূমধ্যসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রপাত করে।	পশ্চিম সেমুয়া অঞ্চলে জ্বর ও মহামারী হওয়ার ফলে এক পঞ্চমাংশ লোক মারা যায়। (১৯১৮)
১৯২০-৩০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে Wall Street stock ধ্বংস হয় (১৯২৯) বিখ্যাত অবনতি শুরু হয়েছিল ১৯৩২ সালের দ্বারা ১২ মিলিয়ন লোক কার্যচ্যুত হয়।	সেমুয়া এর মেও (Mau) মানুষদের দ্বারা নিউজিল্যান্ডের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (১৯২৯)
১৯৩০-৪০		
১৯৪০-৫০	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যোগদান।	
১৯৫০-৬০	কিদেল কাস্ত্রো (Fidel Castro) কিউবার বিদ্রোহের পর ক্ষমতায় আসেন (১৯৫৮)	
১৯৬০-৭০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল (Civil) অধিকার আন্দোলন (১৯৬৩) ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সিভিল আইন (১৯৬৪), বর্ণবৈষম্য নীতির অবরোধ, সিভিল অধিকারে বিশ্বাসী নেতা মার্টিন লুথার কিং এর হত্যা (১৯৬৮), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশচারী চন্দ্রে অবতরণ করেন। (১৯৬৯)	
১৯৭০-৮০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস মহিলাদের দ্বারা আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সমতামূলক সুযোগ আইন পাশ করে। নিউ জিনি (Papua New Guinea) (১৯৭৫)	টংগা এবং ফিজি (Tonga and Fiji) ইংল্যান্ডের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে; পেপুয়া অস্ট্রেলিয়ার নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৮০-৯০		নিউজিল্যান্ড ঘোষিত হয়েছিল পারমানবিক শক্তিমুক্ত অঞ্চলে (১৯৮৪), রেরোটংগো (Rarotonga) এর সন্ধি গঠন করে দক্ষিণ প্রশান্ত পারমানবিক মুক্ত অঞ্চল (১৯৮৬)
১৯৯০-২০০০		

কার্যক্রম

যদি তোমরা কার্যকলাপ তুলনা কর বই-এ দেওয়া চারটি সময় সচীব তবে তোমরা খুঁজে পাবে যে ধারাবাহিক উল্লেখ্য সময়ের বাদিকের পৃষ্টাতালিকা সঙ্গে ভিন্নরূপ হয়েছে। তোমরা কি চিন্তা করতে পার এগুলির কারণ? চেষ্টা কর এবং সময় সূচীর একটি নিজস্ব নমুনা তোমরা তৈরি কর নির্দিষ্ট করা কারণগুলি বর্ণনার জন্য।

প্রসঙ্গ
৯

শিল্পবিপ্লব

১৭৮০ থেকে ১৮৫০ এর সময়সীমার মধ্যে ইংল্যান্ডের শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে প্রথম শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভ বলে ধরা হয়। তাঁর গুরুত্ব ব্রিটেনে ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, তার অর্থনৈতিক গুরুত্বও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অর্থনীতির উপরও ছড়িয়ে পড়েছিল যার গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হওয়ার ফলে। যন্ত্রপাতি দ্বারা তৈরি জিনিসপত্রের উদ্ভবের ফলে তার প্রসার ঘটেছিল সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষভাবে তার প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়েছিল যখন 'হেন্ডিক্র্যাপ্ট' অর্থাৎ কারিগরি শিল্প ও হ্যান্ডলুম শিল্পের অগ্রগতি ঘটেছিল ও লৌহ শিল্পের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক পরিমাণ। তাছাড়া বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ছিল শক্তির মূল প্রাণকেন্দ্র। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড দ্রুতগতিতে তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিল । এই উন্নতমানের ইঞ্জিনশক্তি জাহাজ ও রেল ব্যবস্থাকে মূলত কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । বহু আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ীর অবদান ছিল এক্ষেত্রে অপরিসীম। শিল্পায়ন মূলত মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোককে ধনী থেকে ধনবান করে তোলে কিন্তু শুরুতে শিল্পায়নের মূল কাণ্ডারি ছিল গরিব বসবাসকারী মানুষ ও হাজার হাজার শ্রমিকেরা, যাদের ছাড়া এ সমস্ত উন্নতি করা সম্ভব ছিল না; তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু শ্রমিকেরাও ছিল অগুনিত।

দ্বিতীয় পর্বের প্রথমে সম্ভবত ১৮৫০ সালের পর নতুনক্ষেত্র যেমন ক্যামিকেল এবং ইলেকট্রিকেল শিল্প কেন্দ্রগুলির বৃদ্ধি হয়েছিল। ব্রিটেন পিছনে পড়ে গিয়েছিল এবং মর্যাদা হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর অগ্রগামী শিল্পায়িত শক্তি হিসেবে এবং তাকে অতিক্রান্ত করেছিল জার্মানী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

ইউরোপে পণ্ডিতগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফরাসী দেশের মিছেলেট (George Michelet) এবং জার্মানরি ফ্রেডরিচ এনজেলস—যারা (Friedrich Engles) শিল্প বিপ্লবের সংজ্ঞা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

দার্শনিক আরনল্ড টঙ্গেনবি (Arnold Toynbie) দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ প্রথম এই শব্দটি ইংরেজিতে ব্যবহার করেছিলেন। (১৮৫২-৮৩) এবং তিনি ১৭৬০-১৮২০ এ সময়সীমার মধ্যে হওয়া পরিবর্তনগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তৃতীয় জর্জ এর শাসনকালের সঙ্গে এ ঘটনাগুলোর একটি পরিপূরক সম্পর্ক ছিল এবং টয়েনবি (Toynbie) তার উপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তাঁর দেওয়া প্রদত্ত ভাষণের উপর নির্ভর করে ১৮৮৪ সালে 'ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব' নামে একটি বইপ্রকাশ হয়েছিল । আলোচনাগুলো এবং অন্যান্য অংশের খণ্ড খণ্ড আলোচনাকে কেন্দ্র করে আলোচিত বিষয়বস্তুগুলোর গুরুত্ব সে সময়ে ছিল অপরিসীম।

পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকগণ যেমন টি এস অস্টন (T.S.Ashton); পল মেনটউকস (Paul Mantoux) এবং এরিক হবসবাউম (Eric Hobsbawm) তারা টয়েনবির সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। তাদের মতে ১৭৮০-১৮২০ সালের মধ্যে গঠিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলো হলো অর্থনৈতিক প্রগতি, কয়লাখনির উদঘাটন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নালা (Canal) এবং এ সমস্ত কিছুর মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশি বাণিজ্য করনের প্রয়োজনে। অস্টন (Ashton) (১৮৮৯-১৯৬৮) শিল্প বিপ্লবের উদযাপন করেছিলেন যখন ইংল্যান্ড ছিল যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা আবিষ্কার ও তার প্রগতির চরম শিখরে।

ব্রিটেন কেন?

১৭০০ শতাব্দী থেকে ব্রিটেন রাজশক্তিতে খুব সমৃদ্ধ ছিল। আধুনিক শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা ব্রিটেন প্রথম অনুধাবন করেছিল। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ওয়েলস (Wales) ও স্কটল্যান্ডে ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যা থেকে এটা বোঝা যায় যে রাজ্যগুলিতে ছিল সুন্দর ও সুগঠিত শাসন ব্যবস্থা, প্রচলিত ছিল মুদ্রা, বাজারদর ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং এলাকার শাসক গোষ্ঠীর মাধ্যমে বস্তুসামগ্রী স্থানীয় এলাকায় পৌঁছানো হত যার ফলস্বরূপ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি হয়েছিল। ১৭০০ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা হত। যার ফলে আদান প্রদান ব্যবস্থার (Barter system) অবসান ঘটে এবং শ্রম বিনিময়ের মূল্য টাকার দ্বারা নির্ধারিত করা হত। ফলে লোক বস্তুসামগ্রী টাকার দ্বারা ক্রয় করতে আরম্ভ করেছিল যা অনেকটাই বিনিময় ব্যবস্থা থেকে সহজলভ্য ছিল।

১৮০০ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে আসে এক বিরাট পরিবর্তন যার ফলশ্রুতি হয়েছিল কৃষি বিপ্লবের সূচনার মাধ্যমে। ফলে জামিদার ও ছোট কৃষকদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে উঠে বিরাট জমিদারি বা তালুক। এরফলে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যার ফলভোগ করতে হয় জমিহীন কৃষকদের এবং তারা অন্যত্র তাদের কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে বিশেষ করে শহরের আশপাশে অঞ্চলগুলিতে।

'The man of wealth and Pride Takes up a space that many poor supplied; space for his lake his parks intended bounds, space for his harses, equipage, and hounds; The robe the wraps his links in silken sloth has rabbed the neighbouring fields of half their growth.'

-Oliver Gold smeth (1728-74)
The deserted village.

শহর, ব্যবসা ও বিত্ত

১৮০০ শতাব্দী থেকে শুরু হয় ইউরোপে বিভিন্ন শহরের গোড়াপত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয়েছিল সীমা রেখা ও জনসংখ্যার; এগুলির মধ্যে ১৯ টি ইউরোপের শহর যাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল ১৭৫০ থেকে ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যে।

এর মধ্যে ১১টি শহর ছিল ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড সে সময় সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্রস্থল ছিল। দেশের সমস্ত বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্য ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হত যা পরবর্তী পাশাপাশি বৃহৎ অঞ্চল এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

লন্ডনের বাণিজ্য ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। ১৮০০ শতাব্দী থেকে বৈশ্বিক বাণিজ্য (Global trade) কেন্দ্র ছড়িয়ে দেয় তার ব্যবসা, ভূমধ্য সাগরের বন্দর থেকে ইতালি ও ফরাসীদেশ পর্যন্ত এবং আটলান্টিক সাগরের বন্দর থেকে হল্যান্ড ও ব্রিটেন পর্যন্ত। পরবর্তীকালে লন্ডনের আমস্টারডাম (Amsterdam) শহরের পত্তন হয়েছিল যা ছিল ঋণ দেওয়ার এক বিশেষ কেন্দ্রস্থল। লন্ডনকে কেন্দ্র কের ইংল্যান্ড, আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ত্রিদেশীয় বাণিজ্য শুরু হয়েছিল যারফলে লন্ডনে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির বাণিজ্যকেন্দ্র। লন্ডনের বস্তুসামগ্রী ধীরে ধীরে নদীপথের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রতট ও উপসাগরগুলোর মধ্যে। স্থলপথ থেকে জলপথ ছিল অনেক বেশি স্বাভাবিক ব্যবস্থা, কারণ, রেলওয়ে ব্যবস্থা তখনও আবিষ্কার হয়নি। ১৭২৪ এর পূর্বে ১১৬০ মাইল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের নদীর উপর প্রভাব ছিল এবং শুধু পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সবগুলি নাব্য অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। কারণ অনেক স্থান দেশের ১৫ মাইল নদী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংল্যান্ডের সবগুলির নাব্য অংশ (Navigable sections) পতিত হয় সমুদ্রে। নদীর উপর কার্গ জাহাজগুলি (vessels) সহজে পরিবর্তিত হত উপকূলীয় জাহাজে যাকে উপকূলবাহী জাহাজ বলা হত। ১৮০০ শতাব্দীতে প্রায় এক লক্ষ নাবিক উপকূলবাহী নাবিকের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

সে সময় বিত্তীয় ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৪ সালে। ১৭৮৪ সালে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয়েছিল একশ'র বেশি এবং পরবর্তী দশ বছরে তার

কার্যক্রম ১
ব্রিটেনের উন্নতিগুলি বর্ণনাকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ১৮০০ শতাব্দীতে যা ব্রিটিশ শিল্পায়নকে উৎসাহিত করেছিল।

সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ত্রিগুণ। ১৮২০ সালে বিভিন্ন প্রদেশে ছশ'রও বেশি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক গড়ে উঠে, যার মধ্যে ইংল্যান্ডে ছিল (১০০) একশ'রও বেশি ব্যাঙ্ক। শিল্প প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠার জন্য এবং তাদের আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য। এ সকল ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য্য। এ ব্যাঙ্কগুলি শিল্প গড়ে তোলার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য। এ সকল ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। এ ব্যাঙ্কগুলি শিল্প গড়ে তোলার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদানের যোগান দিত।

ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব গড়ে উঠার পিছনে উপরিউক্ত কারণগুলি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৮০-১৮৫০ এ সময়ের মধ্যে মূলত ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব গড়ে উঠেছিল। বহু গরিব শ্রেণীর লোক গ্রাম থেকে শহরে চলে যেত কাজের প্রয়োজনে, ব্যাঙ্ক ঋণদান করত বড় বড় শিল্প ও সুপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দুটি নতুন বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হল। প্রথমত, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি দ্রুতগতিতে উৎপাদনের মাত্রার বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, নতুন নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে তার মধ্যে রেললাইনের উন্নতি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদি উপরিউক্ত কারণগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় এ উন্নতিগুলোর পিছনে অনেকগুলি দশক (decades) অতিক্রান্ত হয়েছিল। শিল্পের উন্নতি ও তার ব্যাপ্তি এ সমস্ত বৈপ্লবিক উন্নতি আনতে যদিও সমর্থ হয়েছিল কিন্তু তা বহু দশকের বিবর্তনের মাধ্যমে। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনগুলি একই মাত্রায় সহজে বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে পারেনি। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানাধরনের উন্নতি ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডকে রূপান্তরিত করেছিল এক নতুন দিগন্তে যা অনস্বীকার্য।

১৮০০ শতাব্দীতে ২৬০০০ হাজার আবিষ্কারকে নথিভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে অর্ধেকের উপর নথিভুক্ত হয়েছিল ১৭৮২ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে। এ আবিষ্কারগুলো বহু পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। এর মধ্যে আমরা শুধু দু-চারটি মুখ্য বিষয় আলোচনা করব—লৌহ শিল্পের উদ্ভব এবং তার রূপান্তর। স্পিনিং এবং বুননশিল্পের ফলে (Weaving) তুলার ব্যবহার, বাষ্পচালিত প্রযুক্তির উন্নতি (steam) ও রেলপ্রযুক্তির উন্নতি।

কয়লা ও লৌহ

ইংল্যান্ড ছিল লৌহ ও খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার। অন্যান্য পদার্থ যেমন লিড, তামা ও টিন-যা কলকারাখানায় ব্যবহৃত হয়েছিল। কয়লা ও লৌহ যন্ত্রচালিত প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য ছিল। সেগুলোর ব্যবহার মূলত কলকারাখানার কাজে ব্যবহৃত হত। ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত লৌহ উৎপাদন ছিল সীমিত তার ফলে লৌহের পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। খনি থেকে

Caolbrookdale: blast-furnaces (left and centre) and charcoalovens (right); painting by F. Vivares, 1758

লৌহ তরল পদার্থ আকারে তুলে আনা হত তারপর ধাতু গলিয়ে তাকে পরিষ্কার করা হত। এভাবে খনিজ লৌহকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা ছিল। এবং এগুলি এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠানো হত। যোগান কম পরিমাণে হওয়ার কারণ ছিল টিম্বার উৎপাদনের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হতে শুরু করে এবং যার ফলে উৎপাদন করার জন্য পরিমাণমতো উষ্ণতা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

The Cast Iron Bridge near Caolbrookdale, painting by William Williams, 1780

*This area later grew into the village called Ironbridge

এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল আয়রন মাস্টার পরিবার (the Darbys of shropshire) এ পরিবারের তিন পুরুষ দাদা, বাবা, ছেলে যাদের বেলা হত আব্রাহাম দার্বের পরিবার, অর্ধ্ব শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমে ধাতুবিদ্যার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক ১৭০৯ সালে আব্রাহাম দার্বের প্রথম আবিষ্কার ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতি আনতে পেরেছিলেন যা ধাতুশিল্প নামে অভিহিত (১৬৭৭-১৭১৭) হয়েছিল। এভাবেই অগ্নিকুণ্ড, জ্বালানি চুল্লি প্রচণ্ড পরিমাণ উত্তাপ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। পোড়া-পাথুরিয়া কয়লা, সালফার, অপরিষ্কার কয়লা, শোধনের কাজে ব্যবহার করা হত। এভাবে চুল্লি থেকে উৎপন্ন উত্তাপ গলিত লৌহ থেকে তার অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বের করে দিত এবং খাঁটি লৌহ উৎপন্ন করতে শুরু করেছিল। এভাবে নতুন নতুন আবিষ্কার ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথ প্রসস্ত করতে আরম্ভ করেছিল। দ্বিতীয় দার্বে (১৭১১-১৭৬৮) ধীরে ধীরে লৌহ পেটার পদ্ধতি চালু করে। হেনরি কার্ট (১৭৪০-১৮২৩) সালের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বা চুল্লি তৈরির নমুনা বের করে এভাবে গলিত লৌহ থেকে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নিষ্কাশন করা হত। তারপর রলিং মিলে বাষ্পচালিত শক্তির মাধ্যমে লৌহপাত তৈরি করার ব্যবস্থা চালু করা হল। ক্রমে লৌহশিল্প বিপুল আকারের লৌহ উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হল। সুদৃঢ় লৌহ দ্বারা গঠিত হতে আরম্ব হলো জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি, কাঠ দ্বারা নির্মিত রকমারি জিনিসপত্রের গুরত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু হল। কাঠ ছাড়া লৌহকে তার পদার্থবিদ্যা বিষয়ক ও রাসায়নিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য খণ্ড খণ্ড টুকরায় বিভক্ত করা হত। ১৭৭০ সালে জন উইলকিনসন (১৭২৮-১৮০৮) প্রথম লৌহ নির্মিত কুরশি (chair), সুরা রাখিবার বৃহৎ পাত্র, ভাটিকানার জন্য এবং কারখানার ও চোলাইখানার জন্য ও বিভিন্ন ধরনের লৌহ পাইপ তৈরি করেছিলেন।

MAP 1: Britain: The iron industry

১৭৭৯ সালে তৃতীয় দার্বে (১৭৫০-৯১) কোলব্রুক ডেইল নামক জায়গায়, এ অঞ্চল পরবর্তী সময়ে বর্ধিত হয়েছিল আয়রণ ব্রীজ গ্রামে। বিশ্বের প্রথম লৌহ সেতু তৈরি করেন সিভারন (Severn) নদীর উপর। এ ব্রিজ তৈরি করার জন্য উইলকিনসন (Welkinson) ছাঁচে ঢালা লম্বা লৌহ পাইপ প্রথম ব্যবহার করেন। (৪০ মাইল লম্বা লৌহ পাইপ প্যারিসে জল বণ্টনের জন্য) লৌহশিল্প কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে

কার্যক্রম ২

লৌহসেতু জর্জ আজকে বৃহৎ উত্তরাধিকার অঞ্চল, তোমরা উত্থাপিত করতে পার কেন?

সীমাবদ্ধ ছিল। যা কয়লাখনি ও লৌহ উৎপাদনের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল।

এক্ষেত্রে ব্রিটেন খুব সৌভাগ্যশালী দেশ ছিল তার কারণ ব্রিটেনের অবস্থান ছিল জ্বালানি কয়লা ও লৌহ খনির পাশাপাশি। এগুলি বন্দরের নিকটবর্তী অঞ্চলে। পাঁচটি সমুদ্রতটবর্তী কয়লা সংরক্ষন স্থান যা সরাসরি তৈরি জিনিস জাহাজে পৌঁছাতে সক্ষম ছিল। সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলের সংলগ্ন কয়লাখনি থাকার জন্য জাহাজ তৈরির কারখানা বাড়তে শুরু করে এবং এরফলে জাহাজের ব্যবসা (shipping) ক্রমান্বয়ে বাড়তে আরম্ভ করে। এভাবে ব্রিটেনের লৌহশিল্প তিনগুন পরিমাণে বাড়তে শুরু করে (১৮০০ সাল থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে) এবং এ সকল তৈরি বস্তুর মূল্য ইউরোপে সবচেয়ে সুলভ ছিল। ১৮২০ সালে দেখা গেছে একটন পিগ লৌহ (Pig Iron) তৈরির জন্য ৮ টন কয়লার প্রয়োজন হত। কিন্তু ১৮৫০ সালে তার থেকে উৎপন্ন হত মাত্র ২ টন। ১৮৪৮ সালে ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার অপরিষ্কার ধাতু গলিয়ে লৌহ তৈরি করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি ছিল।

সূতা কাটার যন্ত্র এবং বুনন শিল্প

বুনন শিল্পের সাহায্যে ব্রিটিশ লোকেরা কাপড় তৈরি করত। ১৭০০ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ তুলা ইংল্যান্ড ভারতে হতে আমদানি করেছিল চড়া দামে। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক মানচিত্রে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং এর সুবাদে ব্রিটিশ শাসকদল ভারতবর্ষ থেকে কাপড়, কাঁচা তুলা আমদানি করতে আরম্ভ করে এবং এই কাঁচা মাল ব্যবহার করে কাপড় তৈরি করতেও আরম্ভ করে। ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত সূতা কাটার কাজ ছিল খুব কষ্টসাধ্য। দশজন সূতা কাটার লোক পর্যাপ্ত পরিমান পাকানো সূতার তৈরি করার প্রয়োজনে এবং তার জন্য একজন তাঁতি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং সূতা কাটার লোকেরা সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকত। এবং তখন তাঁতিরা অপেক্ষারত হয়ে থাকত পাকানো সূতার প্রয়োজনে। লাগাতার প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কার সকল অসুবিধা দূরীভূত করতে সাহায্য করেছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাঁচা তুলা থেকে পাকা সূতা ও সূতা থেকে নানা ধরনের শিল্প কৌশলের কাজ তৈরি করার প্রকল্প শুরু হয়। এভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূতাকাটার যান্ত্রিক শিল্প ক্ষুদ্রশিল্প থেকে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৭৮০ সাল থেকে এভাবে কটনশিল্প বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে শিল্পায়নে রূপান্তরিত হয়। এ শিল্পে দুটি উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল যা অন্যান্য শিল্পে ও পরিলক্ষিত হয়।

কাঁচা তুলার আমদানি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তুলা ব্যবহার করে নতুন কাপড় তৈরি হতে আরম্ভ হয় এবং সেকল তৈরিবস্তু রফতানি করা হত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঔপনিবেশিকরণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কায়েম হয়েছিল।

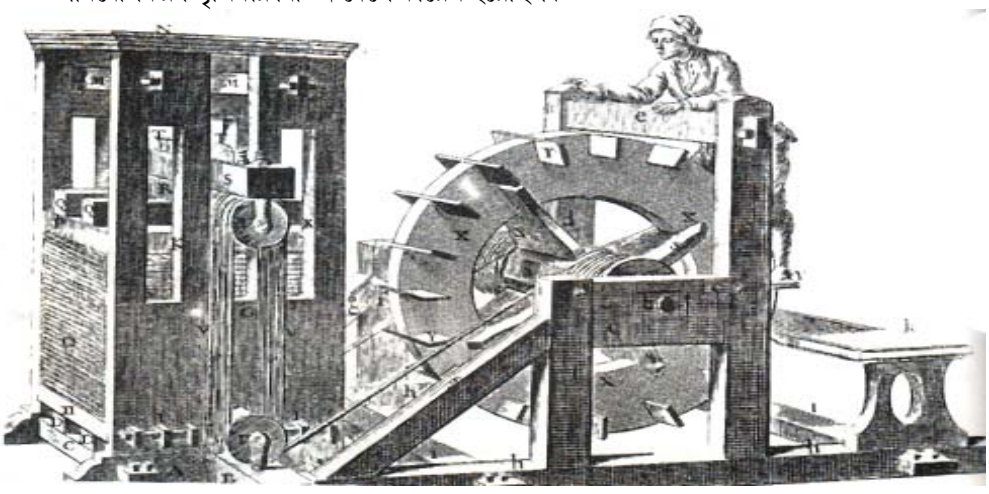

Manpower (in this picture, woman-power) worked the treadmill that lowered the lid of the cotton press.

১। উড়ন্ত তন্তুবায়ের মাকু তুলা (The flying shuttle loom) যন্ত্রটির নমুনা তৈরি করেন জন কে John Kay (১৭০৪-৬৪)। ১৭৩৩ সালে স্বল্প সময়ে তাঁতবস্ত্র বুনার জন্য প্রচুর পরিমাণ পাকানো সূতা যোগানের এবং এভাবে তাঁতবস্ত্র তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছিল।

২। স্পিনিং জেনি (Spinning Jenny) তাঁত বুনার যন্ত্র নামে এক প্রকার যন্ত্র তৈরি করেন হারগ্রিভস (Hargreeves) (১৭২০-৭৮) ১৭৬৫ সালে। যারফলে এক ব্যক্তি অনেকগুলো সূতা তুলা থেকে অতি অল্প সময়ে তৈরি করতে সমর্থ হত। এভাবে অতি দ্রুত পদ্ধতিতে তাঁত থেকে নানাপ্রকার তাঁতবস্ত্র তৈরি করতে সম্ভব হয়েছিল।

৩। ওয়াটার ফ্রেম (Water frame) নামক যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন রিচার্স আর্করাইট (Reachard Arkwright) ১৭৬৯ সালে। তাঁর এই যন্ত্রটি শক্ত সূতা তৈরি করতে সক্ষম ছিল যা ইতিপূর্বে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এ যন্ত্রটির দ্বারা বিশুদ্ধ তুলা উৎপাদন করা সহজ হয়েছিল এবং সক্ষম ছিল তুলা দ্বারা বাহির ও ভিতরে নানা প্রকার সূক্ষ্ম কাজ করার বস্ত্র তৈরির করার জন্য।

৪। অশ্বতর (mule) এই চলতি নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন সেমুয়েল ক্রম্পটন (Samual Crompton) ১৭৭৯ সালে। (১৭৫৩-১৮৪২)। এ যন্ত্রটি খুব সূক্ষ্মভাবে সূতা কাটতে সমর্থ ছিল।

৫। এডমন্ড কার্টরাইড দ্বারা (Edmund Cartwright) আবর্তনশীল যন্ত্র আবিষ্কারে পরিবর্তন ধারার ফলে কটনশিল্পে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনতে সক্ষম হয়েছিল সূতাকাটা ও বুননশিল্পে। এরফলে পাওয়ার লুমের (Powerloom) পরিসমাপ্তি ঘটেছিল (১৭৪৩-১৮২৩) ১৭৮৭ সালে। ইহা সহজ লভ্য ছিল কাজটির জন্য তৈরি করা, সূতা কাটা, মেশিন বন্ধ করা ইত্যাদি কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করত। এভাবে ১৮৩০ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটতে আরম্ভ করে এবং শ্রমিক কর্মীদের উৎপাদন করার শক্তি বৃদ্ধি পায় যার ফলে অন্য কোনও নতুন যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল না।

MAP 2: Britain. The cotton industry

সুতরাং এভাবে ব্রিটেন সমস্ত তুলা (কটন) শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলার যোগান ও তার জন্য বাজার গড়ে তোলার ব্যবস্থাও সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করতে ও সমতা বজায় রেখে চলতে সমর্থ হয়েছিল। এই শিল্প বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল মহিলা ও শিসুদের উপর। তারাই মূলত কারখানার কাজ সম্পাদন করত। এটাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী শিল্পায়নের কুৎসিত চেহারা আমাদের সামনে ধরা পড়ে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

বাষ্পচালিত শক্তি—বাষ্পচালিত শক্তি শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ। বাষ্পচালিত শক্তি মূলত প্রচুর পরিমাণ শক্তির উৎস ছিল যা কলকারখানার উৎপাদনের ক্ষেত্রে শক্তির যোগান

দিত। জল বিদ্যুৎশক্তি (Water hydraulic Power) ছিল মুখ্য শক্তির উৎস যুগ যুগ ধরে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু অঞ্চলে যা কিছু পরিবর্তন ও জলের গতিবেগের উপর নির্ভরশীল ছিল। এভাবে বিভিন্নভাবে তার ব্যবহার শুরু হয়। বাষ্পচালিত শক্তির তৈরি করা উচ্চ তাপ প্রক্রিয়া বড় বড় মেশিনকে চালানোর শক্তি যোগান দিত এবং এই বাষ্পচালিত শক্তির সাহায্যেই বড় বড় কলকারখানার যন্ত্রগুলি অতি দ্রুত কম খরচে সহজে চালানো সম্ভব হয়েছিল, জিনিস বা বস্তু তৈরি করার জন্য।

স্টিম শক্তি প্রথম ব্যবহার করা হয় খনি থেকে খনিজ পদার্থ তোলার জন্য। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পচালিত শক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকে প্রচুর পরিমাণে এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ খনি থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজনে ও তৎসঙ্গে তার বৃদ্ধি হয়েছিল। খনিতে জলের পরিমাণ বেশি থাকার ফলে কয়লা সংগ্রহ করা একটি জটিল সমস্যা ছিল। টমাস সেভেরি (১৬৫০-১৭১৫) ১৬৯৮ সালে স্টিম ইঞ্জিনের একটি নমুনা তৈরি করেন যা মাইনর্স ফ্রেন্ড (Miner's Friend) নামে খুব পরিচিত ছিল। এই ইঞ্জিন খনি পরিষ্কারের জন্য উপযোগী ছিল। এই ইঞ্জিনগুলি খুব মন্থরগতিতে কাজ করে স্বল্প গভীরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। টমাস নিউকমেন (Thomas Newcomen) ১৭১২ সালে আরেকটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন (১৬৬৩-১৭২৯)। কিন্তু যন্ত্রটি এতটি যুক্ত ছিল। কারণ প্রতিনিয়ত সিলিন্ডার ঠাণ্ডা করার জন্য হাওয়া প্রয়োজন হত।

জেমস ওয়াট (James Watt) (১৭৩৬-১৮১৯) এ উন্নততর বাষ্পচালিত যন্ত্র আবিষ্কারের প্রাক অবধি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা হত কয়লা খনি থেকে কয়লা তুলে আনার কাজের জন্য। কিন্তু ১৭৬৯ সালে উন্নতমানের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন যাকে জেমস ওয়াট নামক ব্যক্তির আবিষ্কার বলা হত, এই সমস্যার সমাধানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। ওয়াট এর এই যন্ত্রটি শুধু পাম্প থেকে প্রাইমমুভারে রূপান্তরিত করেছিল এবং যার সামর্থ ছিল কারখানার শক্তিচালিত ইঞ্জিনের জন্য যোগান দিতে সাহায্য করতে। ধনী শিল্পপতি Mathew Boulton এর সাহায্যে (১৭২৮-১৮০৯) ওয়াট তৈরি করেন 'Soho Frondry' (Soho নামক ঢালাইয়ের কারখানা) বার্মিংহাম নামক শহরে ১৭৭৫ সালে। যার ফলে ওয়াটস্ (Watt's) এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সমর্থ হয়েছিল প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যা আগে কখনও সম্ভবপর হয়নি। এভাবে ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাবে ওয়াটস্-এর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন জলবাহী শক্তির রূপান্তরের কাজ আরম্ভ করেছিল।

১৮০০ শতাব্দীর পর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রযুক্তির পূনরায় উন্নতি ঘটেছিল পাতলা ও শক্তিশালী ধাতুর ব্যবহারের সাহায্যে। এরফলে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও সঠিক মাত্রা আসে এবং উন্নততর বৈজ্ঞানিক জন ও তার বিস্তার লাভ করেছিল। ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সত্তর শতাংশেরও বেশি ইউরোপীয় 'horse power' (এক অশ্বের সমানশক্তি অর্থাৎ ১ মিনিটে প্রায় ৪০২ মন ওজন ১ ফুট উঁচু করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, অশ্বশক্তি) এর সমতুল্য শক্তি যোগানের উপযোগী হয়ে ওঠে।

Watt's inventions were not limited to the steam engine. He invented a chemical process for copying documents. He also created a unit of measurement based on comparing mechanical power with that of the previous universal power source, the horse, Watt's measurement unit, horsepower, equated the ability of a horse to lift 33,000 pounds (14,969 kg) one foot (0.3 m) in one minute. Horsepower remains as a universally used index of mechanical energy.

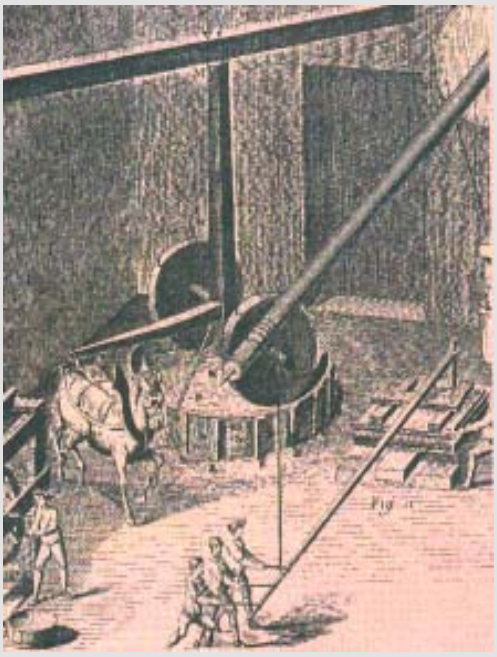

কৃত্রিম নালা ও রেলরাস্তা

প্রাথমিক অবস্থায় কৃত্রিম নালা নির্মাণ করা হত কয়লাখনি থেকে শহরে পৌঁছানোর জন্য। তার কারণ ছিল কৃত্রিম নালার মাধ্যমে বজরার দ্বারা কম খরচে কয়লা শহরে পৌঁছানো যেত যা সড়ক মাধ্যমে পৌঁছানো অনেক সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কলকারখানার শক্তির যোগান, গৃহে আলোর ব্যবস্থা ও উত্তাপ তৈরি করার কাজে কয়লা ছিল মুখ্য খনিজ পদার্থ। সুতরাং কয়লা যোগানের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তার পরিবহন ব্যবস্থা ছিল সীমিত। এই কারণে কয়লার যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন দ্রুত বাড়তে শুরু করেছিল। ১৭৬১ সালে প্রথম ইংলিশ কৃত্রিম নালা, যাকে worsley canal বলা হত যার নির্মাতা James Brindly (১৭১৬-৭২)। কয়লা এলাকা থেকে worsley নামক কয়লা সংরক্ষিত এলাকায় আনার জন্য ইহা (ম্যাঞ্চেস্টার এর আশপাশে) তৈরি করা হয়েছিল। এখান থেকে কয়লা অন্যত্র পৌঁছানো হত। এভাবেই এই কৃত্রিম নালা নির্মাণ করার ফলে কয়লা বহনের মূল্য অর্ধেক মূল্যে পৌঁছেছিল।

খনি,পাহাড় এগুলির কদর বৃদ্ধি করার জন্য জমিদার শ্রেণীর লোক খনন করত বড় বড নালা। নতুন শহরতলিতে বাজার তৈরি করার জন্য নদীর সঙ্গমস্থলে কৃত্রিমনালা তৈরি করা হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বার্মিংহাম (Bermingham) শহর তৈরি হয়েছিল কৃত্রিমনালার ঠিক মধ্য অংশে যা লন্ডন শহরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ব্রিস্টলের কৃত্রিম নালার (Bristol channel) যোগাযোগ ছিল Mersey এবং হাম্বার (humber) নদীর সঙ্গে। ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে ২৫টি কৃত্রিমনালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এই সময়টিকে কৃত্রিমনালা তৈরির উন্মত্ততা নামে (Canal mania) জানা যায়? ১৭৮৮ ,থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে ৪৬টি নতুন কৃত্রিম নালা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী যাট বছরের মধ্যে চার হাজারের (৪,০০০) বেশি মাইল নালার উপর পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। স্টিফেনসন রকেট (Stepphenson's Rocket) নামে এক ব্যক্তি ১৮১৪ সালে প্রথম স্টিম লকোমটিভ (locomotive) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এভাবেই রেলের আবির্ভাব ঘটে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয় যার ফলে সহজ মূল্যে দ্রুত জিনিসপত্রও যাত্রীরা এক স্থান থেকে অন্যত্র পৌঁছাতে পেরেছিল।

১৭৬০ সালে দুটি যুগ্ম আবিষ্কার হয়েছিল— উডেনট্রেক (woodentrack), লৌহট্রেক (irontrack), এভাবেই লৌহট্রেকের ব্যবহার বাড়তে শুরু করে। রেল রাস্তার আবিষ্কার শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল। Richard Trevethick ১৮০১ সালে (১৭৭১-১৮৩৩) আবিষ্কার করেন "Puffing Devil" নামে একটি ইঞ্জিন যার সাহায্যে খনির আশপাশে মোটর লরী তোলার কাজ করা হত এবং সে স্থানটি ছিল কর্নওয়াল (Cornwall)। ১৮১৪ সালে জর্জ স্টিফেনশন (George Stephenson) (১৭৮১- ১৮৪৮) রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার লোকমটিভ (locomotive) নামে যন্ত্রটি যা "The Blucher" নামে পরিচিত যন্ত্রটি নির্মাণ করেন যার ফলে ত্রিশ টন ওজন পাহাড়ের উপর ৮ mph সময়ের মধ্যে তুলার ক্ষমতা ছিল। প্রথম রেললাইন ১৮২৫ সালে স্টকটন (stockton) এবং ডার্লিংটন (Darlington) শহরের মধ্যে সংযোগ করে যার দূরত্ব নয় কিলোমিটার এবং দু'ঘণ্টা গতিবেগে ২৪ mph অতিক্রম করেছিল এবং পরবর্তী রেলওয়ে লাইন সংযোগ করেছিল লিভারপুল (liverpool) থেকে মাঞ্চেস্টার (Manchester) পর্যন্ত ১৮৩০ সালে। বিশ বছরের মধ্যে তার সাধারণ গতি বত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ছিল।

১৮৩০ সাল থেকে কৃত্রিমনালার ব্যবহার সমস্যার পুনরাবৃত্তি শুরু করে। যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ ধীরে ধীরে শুরু করে সমস্যার সৃষ্টি নালাপথে যাতায়াত করার সময়ে ফলে যাতায়াত করার

পথে যানবাহন চলাচল কমিয়ে দেওয়া হয়।

রেলওয়ে এখন থেকে সবচেয়ে সহজলভ্য ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ১৮৩০ -৫০ সালের মধ্যে ব্রিটেন প্রায় ছয় হাজার মাইল রেললাইন যাতায়াত ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলে। যা তৈরি হয়েছিল দুটি ছোট পাতের উপর। যাকে আমরা মিটারগজ বলে থাকি। ১৮৩৩-৩৭ সালের মধ্যে লিটিল রেলওয়ে মেনিয়া "little railway mania" এর উদ্যোগে চৌদ্দ হাজার (১৪,০০০) মাইল রেললাইন নির্মাণ করা হয় এবং বড় "mania" এর অধীনে ১৮৪৪-৪৭ সালের মধ্যে আরও নয় হাজার পাঁচশত (৯,৫০০) মাইল রেললাইন নির্মাণের কাজ অনুমোদন করা হয়। প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ ব্যবহার করা হয়েছিল এই প্রকল্প নির্মাণের জন্য এবং প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিকের নিযুক্তি দেওয়া হয় যার সাহায্যে সত্বর কাজের অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়। ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রায় সমগ্র ইংল্যান্ড শহর রেল ব্যবস্থার দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছিল।

আবিষ্কারক কারা ছিল?

যাদের আবিষ্কার বিভিন্ন দিক থেকে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিল তাদের কথা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল খুব সীমিত, বিশেষভাবে পদার্থশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে তাদের আবিষ্কারগুলো ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। তাঁদের আবিষ্কার অনেকটাই পরীক্ষালব্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা কিছু ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা ইংল্যান্ডে ঘটেছিল পৃথিবীর অন্য কোথাও সেভাবে এ ধরনের প্রভাব আবিষ্কারকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিনগুলো অনেক ধরনের অনুসন্ধানপত্র যা বিজ্ঞান সম্পর্কিত ছিল তা প্রকাশ করেছিলেন এবং যার ফলে এগুলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করে, যাকে দিগন্তকারী যুগ বলা যায়। ছোট শহর থেকে বড় শহর সর্বত্র বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের তৃষ্ণা বাড়তে আরম্ভ করে। সোসাইটি অফ আর্টস (Society of Arts) এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৫৪ সালে যা এক্ষেত্রে কিছু পথ প্রদর্শকের কাজ করতে আরম্ভ করে। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ভাষণ দান করতেন কখনও কফিহাউস "coffee house" গুলোতে ভাষণ দিতেন এবং এধরনের প্রক্রিয়া বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল ১৮০০০ শতাব্দীতে।

আবিষ্কারের মূল উৎস আগ্রহ, কৌতুহল এবং ভাগ্য নির্ণয় করে গড়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে এগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যুক্ত হয়ে আবিষ্কারগুলোর সংস্কার করা হয়েছিল। কটন (তুলা) শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু আবিষ্কারক, আবিষ্কারের প্রাক্কাল থেকে বুনন ও কার্পেনটারি (carpentary) সম্পর্কে অভিহিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জনকে দেইমস হারগ্রিডস, রিচার্ড আর্করাইট। রিচার্ড আর্করাইট নিজে ছিলেন একজন নাপিত ও পরচুলা তৈরিকারক। সেমুয়েল ক্রমটন, Wingmker প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অনভিজ্ঞ লোক ছিলেন। এডমন্ড কার্টরাইট অধ্যয়ণ করতেন সাহিত্য, মেডিসিন এবং কৃষি বিজ্ঞান। প্রথমদিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল একজন সম্ভ্রান্ত যাজক (clergyman) হবেন। তাঁর কার্যসাধনের বন্দোবস্ত সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অল্পবিস্তর জ্ঞান ছিল। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারক টমাস সেভারী (Thomas Savery) যিনি সৈনিক বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। ঠিক সেভাবে জন মেটকার্ফ রাস্তা নির্মাণের কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে এক্ষেত্রে কার্যসম্পাদন করেছিলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন বটে। কৃত্রিম নালা নির্মাতা ছিলেন নিরক্ষর ব্যক্তি। তিনি খুব সহজ বানান যেমন নেভিগেশন উচ্চারণ করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিশ্বাস্য মস্তিষ্ক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ও কল্পনাশক্তি এবং মনঃসংযোগ ছিল ভাবনাতীত।

জীবনের পরিবর্তন

সে সময় লোকের পক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আর ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল। ধনী ব্যক্তিরা নিজেরা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে বড় বড় শিল্প, কলকারখানা নির্মাণ করতে শুরু করেছিল যাতে ভবিষ্যতে

তাদের বিনিয়োগ করা অর্থ থেকে মুনাফা আসে এবং তা দ্বিগুণ মুনাফা হয়ে দাঁড়ায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ করা অর্থ হয়েছিল দ্বিগুণ। অভিনবভাবে সম্পদ উৎপাদিত রকমারি জিনিসের মাধ্যমে আয়, চাকরি, জ্ঞান, উৎপাদনের গুণগতমান ইত্যাদি এগুলোর উপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে অনেক নিষ্ক্রিয় শক্তির পাশাপাশি সমাজের ও মানুষের জীবনের জীবনীশক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকেরা তাদের আদি বাসস্থান ছেড়ে কর্মসূত্রে দূরদূরান্তে যাত্রার কাজ আরম্ভ করে এবং তারফলে সেকল লোক যারা কলকারাখানার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অবস্থার অবনতি হতে আরম্ভ করেছিল। ইংল্যান্ডে শহরের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ হল এবং জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে বৃদ্ধি পেলে এবং এ দুটি থেকে বৃদ্ধি হয়েছিল ১৭৫০ সালে ২৯ যা ১৮৫০-এর নিকট। ইংল্যান্ডে শিল্পায়নের জোয়াড় যেভাবে এসেছিল ঠিক তেমনি জনজীবনে উন্নতির জোয়াড় আসেনি। তার কারণ উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, অপরিকল্পিত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয়জলের অভাব এবং শহরাঞ্চলে দ্রুত লোকসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

Far left: Coalbrookdale, Carpenters' Row, cottages built by the company for workers in 1783.
Left: The houses of the Darbys; painting by William Westwood 1853.

**The gates of Hell.*

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নবাগতদের বাধ্য করা হত বস্তি অঞ্চলগলিতে বসবাস করার জন্য যেগুলো ছিল কলকারখানার নিকটবর্তী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের পাশাপাশি আবার অন্যদিকে ধনী ব্যক্তিগণকে এ সমস্ত নোংরা পরি রেশের সঙ্গে কখনও মোকাবিলা করতে হত না। তারা নিজেদেরকে এরকম নোংরা পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে রাখত এবং শহরতলি বা উপপুরে গৃহনির্মাণ করত যেখানে বি শুদ্ধ বায়ু ও জলের সু ব্যবস্থা ছিল।

এডওয়ার্ড কার্পেন্টার ১৮৮১তে তার কবিতা 'In a Manufacturing Town' এ এ সমস্ত নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন,

'As I walked restless and despondent through the gloomy city,
And saw the eager unresting to and bro as of ghosts in some sulphurous Hades*–
And saw the crowds of tall chimneys going up, and the pall of smoke covering the sun- covering the earth, lying heavy against the very ground–
And saw the huge refuse heaps Writhing with children picking them over,
And the ghostly half foofles as moke blackend houses, and the black river flowing below,–
As I saw these, and I saw again farway the capitalist quarter,
With its villa residences and its high walled gardens and its well appointed carriages and its face turned away form the wriggling poverty which made it rich,.....
I shuddered.

শ্রমিকেরা

১৯৪২ এর সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে সাধারণ শ্রমিকের গড় আয়ু শহরে বসবাসরত মানুষদের গড় আয়ু থেকে কম। বার্মিংহামে (Bermingham) এ ছিল পনেরো বছর, ম্যাঞ্চেস্টার (Manchester) এ ছিল সতেরো বছর এবং দার্বে (Derby) ছিল ২১ বছর। অনেক লোক যারা কলকারখানার নিকটে বসবাসত করত তারা অল্প বয়সে মারা যেত। তারা মূলত তাদের গ্রামের বাসস্থান থেকে শহরে এসেছিল। তাদের সন্তানদের মধ্যে অর্ধেক পাঁচবছর বয়সের মধ্যে মারা যেত। উদ্বাস্তু জনসংখ্যা ছাড়াও শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্ম দেওয়া ছেলেমেয়ে সব মিলিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ ছিল মহামারী। মহামারী হওয়ার মূল কারণ ছিল নোংরা জল এবং এর ফলে কলেরা, টাইফয়েড ও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে লোকেদের মৃত্যু হত। ১৮৩২ সালে কলেরা রোগে একত্রিশ হাজারেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়। ১৯০০ শতাব্দীর শেষভাগে মিউনিসিপল্ কমিটির গাফিলতির ফলে ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অজ্ঞতা ও গাফিলতি ও সকল দুরূহ মহামারী থেকে জনসাধারণকে বাঁচানো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

মহিলা, শিশু এবং শিল্পায়ন

মহিলা ও শিশুশ্রমিকের আগমণের ফলে শিল্পায়ন ও শিল্পবিপ্লব গড়ে উঠেছিল। শিশুরা মূলতঃ গ্রামে নিজেদের বাসস্থানে বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করত খাদ্যের তত্বাবধানে এবং সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক তেমনি মহিলারাও দক্ষতার সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত, তারা গৃহপালিত জন্তুর প্রতিপালনের কাজেও নিমজ্জিত ছিল। তারা জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ করত, চরকার দ্বারা সূতা কাটার ব্যবস্থাও তাদের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিল। অন্যদিকে ফ্যাক্টরিতে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ও অধিক সময় কঠোর পরিশ্রম সহকারে কাজ করতে হত সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যার ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত ও শোষণের শিকার হয়েছিল। কাজে ফাঁকি দিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। এরকম কাজ তাদের গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে কখনও করতে হত না। পুরুষের রোজগার কম থাকার দরুণ জীবনধারণের জন্য মহিলা ও শিশুদেরকেও সমানভাবে কাজে অংশীদার হতে বাধ্য করা হত নিজেদের জীবনধারণ করার প্রয়োজনে। শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিক ও মানব শ্রমের গুরুত্ব কমতে আরম্ভ হয় ফলে পুরুষের চেয়ে মহিলা ও শিশুদের কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে কাজে ব্যবহার করা হত।

বিশেষভাবে লাংকেশিয়ার (Lancashire) এবং (Yorkshire) ইয়র্কশিয়ার শহরে তুলার ফ্যাক্টরিতে শ্রমিককে কাজে লাগানো হত।

Woman in gilt-button factory, Birmingham. In the 1850s, two-third of the workforc in the button trade were women and children. Men received 25 shillings a week, women 7 shillings and children one shilling each, for the same hours of work.

শ্রমিকরাও) বার্মিংহামে ধাতু শিল্প তৈরির কাজে মূল শ্রমিক ছিল। তুলার তৈরি পোশাক নির্মাণে শিশু শ্রমিকদের অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হত তার কারণ ছিল সূক্ষ্ম কাজের জন্য শিশুদের ছোট ছোট অংশগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত করা সম্ভব ছিল। শিশুদেরকে প্রায়শই কাপড় নির্মাণের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ দেওয়া হত। কারণ তারা খুব শক্ত হাতে তাড়াতাড়ি মেশিনারী জিনিসপত্র বাধতে পারত। অনেক ঘণ্টা কাজ করার পরও রবিবার দিনেও তাদেরকে মেশিনারী যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে হত এবং খোলা আকাশের নীচে মুক্ত হাওয়া বা ব্যায়াম চর্চা করার অনুমতি দেওয়া হত।

কখনও তাদের কাজের সময় অসাবধানবশত হাত পা কাটা পড়ে যেত এবং অনেকের তার ফলে মৃত্যু হত। কয়লাখনিতে কাজ করা খুব বিপজ্জনক ছিল। প্রায়ই দড়ি ছিড়ে কিংবা চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটত। কয়লাখনির মালিকরা শিশুদেরকে কয়লা খনিতে কয়লা তুলে আনার জন্য ব্যবহার করে থাকত। কারণ কয়লাখনিতে প্রাপ্তবয়স্করা রাস্তা ছোট থাকার জন্য ভিতরে যেতে সমর্থ হত না। যুবকরা কয়লা খনি থেকে তুলে আনা, খনিতে গিয়ে কাজ করা, গাড়িতে কয়লা পিঠে করে উঠানো ইত্যাদি সমস্ত কাজে ব্যবহৃত হত। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার কয়লাখনিতে শিশু শ্রমিকদের সঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছিল। ব্রিটিশ ফ্যাক্টরি রেকর্ডের প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় যখন তারা কাজে যোগদান করে তখন তাদের বয়স ছিল দশ বছরের চেয়েও কম এবং আঠাশ (২৮) ভাগ শ্রমিকের বয়সছিল চৌদ্দ (১৪) বছরের নীচে। তুলনামূলকভাবে মহিলাদের রোজগার ছিল ভাল এরা ছিল স্বাধীন। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। শিশুরা তাদের যৌবন উপভোগ করার কোনও সুযোগ পেত না কারণ তাদেরকে শহরের নোংরা পরিবেশে থেকে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হত বাধ্যতামূলকভাবে। যার ফলে তাদেরকে শহরাঞ্চলে বাধ্য হয়ে বসবাস করতে হত কাজের প্রয়োজনে।

A lane in the pooreer quarters of London: engraving by the French artist Dore, 1876.

শিল্পায়নের প্রভাবে গরীবের যে কষ্ট সে সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সবচাইতে বেশী সোচ্চার হয়েছিলেন সমসাময়িক (লেখক চার্লস ডিফেন্স ১৮১২-৭০)। তার উপন্যাস 'Hard Times' তিনি Coketown বলে একটি কল্পিত শিল্প নগরীর বর্ণনা করেছেন

"It was a town of red brick' or a brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it but as matters stood it was a town of unnatural red and black like the pointed face of a savage. It was town of a machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed themselves for ever and ever, and never got uncoiled. It had a black canal in it and a river that ran purple with ill smelling dye, and vast piles of building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where the piston of the steam engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a stare of melancholy madness.'

কার্যক্রম ৩
বর্ণনা কর শিল্পায়নের প্রাথমিক ফলাফল ব্রিটিশ শহরগুলি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এবং এগুলিকে ভারতের অনুরূপ অবস্থার সাথে তুলনা কর।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি. এইস. লরেন্স তার লেখনীর মাধ্যমে কয়লা- অঞ্চলের একটি গ্রামের পরিবর্তনগুলোর ছবি এঁকেছে। এ সমস্ত পরিবর্তন লরেন্সের নিজের চোখে দেখা নয়, বয়োবৃদ্ধ লোকের মুখ থেকে শোনা ঘটনা।

'Eastwood.... must have been a tiny village at the beginning of the nineteenth century, a small place of cottages and bragmentary rows of little four-roomed miners' dwellings, the homes of the old colliers... But somewhere about 1820 the company must have sunk the first big shaft.... and installed the first machinery of the real industrial colliery... Most of the little rows of dwelling were pulled down, and dull little shops began to rise along the Nottingham Road, while on the down slope... the company erected what is still known as the New Buildings... little four room houses looking outward into the grim. blank street, and the back looking into the desert of the square shut in like a barracks, enclosure, very strange.'

মতদ্বৈধ আন্দোলন

পূর্ববর্তী দশকের শিল্পায়ন মিল খাইয়েছিল নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে যার পথ প্রদর্শক ছিল ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-৯৪)। ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক চেতনা উন্মোচনে যারা পথ প্রদর্শক ছিলেন তারা ফরাসী দেশে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল 'স্বাধীনতা' (liberty) 'সমতা' (equality) ভ্রাতৃত্ব (Fraternity) যার প্রসার ঘটেছিল সামগ্রিকভাবে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে এবং যার ফলে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ ফরাসীদেশে গড়ে উঠে এবং এর ফলে ১৭৯০ সালে ফরাসী পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি (French Parliamentary Assembly) গঠিত হয় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের উপরও পড়েছিল এবং শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিবাদ, ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অবিচার ও এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছিল ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা এবং তারা ভোটের অধিকার দেওয়ার দাবি আনতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। সরকার প্রতিবাদ দমনের জন্য আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিক এ ধরনের আইন মানতে বাধ্য হল না। ১৭৯২ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফরাসী দেশের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং এর ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হতে শুরু হল, ফ্যাক্টরি বন্ধ হতে আরম্ভ হল, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেল এবং নিত্ত নৈমিত্তিক জিনিসের দাম মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেল।

এককথায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা বিকল হয়ে পড়েছিল। ১৭৯৫ সালে পার্লামেন্ট যুগ্ম আইন প্রণয়ন করেছিল (Two combination Act) এবং সংবিধান এই আইন অনুযায়ী লোকেদের রাজা বা সরকারের বিরুদ্ধে বাক্য প্রয়োগ, ভাষণ দেওয়া কিংবা সংবিধানের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে প্রকাশ করা অনুমোদনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিল।

পঞ্চাশজন লোক একসঙ্গে কোথাও কোনও জনসভায় মিলিত হলে তা বেআইনি বলে ঘোষিত হত। কিন্তু তা সত্ত্বে প্রতিবাদ চলতে থাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর (Privillege class) সঙ্গে রাজতন্ত্রের ও পার্লামেন্টের যোগাযোগ ছিল। এধরনের প্রতিবাদ

বাড়তে আরম্ভ করার পিছনে মূল কারণ, পার্লামেন্টের সদস্যরা, ভূস্বামীর কারখানার মালিক, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা শ্রমিক শ্রেণীকে ভোটের অধিকার না দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ আরম্ভ করে। তারা কর্ন আইন (cornlaws) এর পক্ষে প্রতিবেদন দিতে আরম্ভ করে যতদিন পর্যন্ত স্বল্পমূলের আমদানি দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট স্তরে ব্রিটেনে বর্ধিত না হয়।

শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে শহর ও ফ্যাক্টরিতে বর্ধিত হতে আরম্ভ করে এবং তাদের চাপা ক্ষোভ বিদ্রোহের দাবানলে জ্বলে উঠেছিল এবং এভাবে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার কারণে ১৭৯০ সালে দেশের সর্বস্তর আন্দোলনের দাবানল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে অন্যথায় তাদের বেঁচে থাকার জন্য কোনও পথ খোলা ছিল না।

রুটি, দুস্তকারক ও দরিদ্রশ্রেণীর লোকেদের একমাত্র প্রধান খাদ্য ছিল। রুটির মুল্য তাদের জীবনধারনের মানদণ্ডের প্রতীক। মুনাফা লাভের আশায় ব্যবসায়িরা সঠিক ও স্বল্পমূল্যে বিক্রয় না করে বেশি মূল্যে রুটি বিক্রয়ের জন্য রুটির যোগান বন্ধ করে দিয়েছিল। যার ফলে ১৭৯৫ সালে দাঙ্গা শুরু হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং লাগাতার এই দাঙ্গা ১৮৪০ সাল পর্যন্ত চলেছিল। আরেকটি বিশেষ দিক হল 'অধিগ্রহণ' (enclosure) যার ফলে ১৭৭০ সাল থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরি (খামার) ভূস্বামীদের অঞ্চলের সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছিল শক্তিশালী ভূস্বামী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য।

গরিব পরিবারের লোকেরা কারখানার কাজ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ করেছিল। কটনশিল্পে যন্ত্রপ্রযুক্তির ব্যবহার করার ফলে গ্রামাঞ্চলের হাতে বোনা বস্ত্রশিল্প তৈরি করার কারখানা বা কুটিরশিল্পগুলোকে সমূলে উৎপাট করতে শুরু করেছিল যার ফলে দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থা অসহায় হয়ে পড়ে। এভাবে হাজার হাজার পরিবার আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে আরম্ভ করে। তাদের হাতে বুনা শিল্পের সাহায্যে তৈরি করা নানা দ্রব্য মেশিনের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে অসমর্থ ছিল। ১৭৯০ সালে সকল গরিব শ্রমিকরা দাবি করতে শুরু করে তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য কিন্তু পার্লামেন্ট তাদের এই ন্যূনতম দাবি মানতে সম্মত ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিল যাতে তারা তাদের ন্যূনতম দাবি আদায় করতে পারে কিন্তু সরকার শক্ত হাতে তাদের আন্দোলন প্রতিহতকরেছিল। লাঙ্কেশিয়ার (Lancashire) নামক স্থানে সংঘটিত প্রতিবাদের ফলে শ্রমিকরা তৈরি কটন দাবানলে ফেলে দেয় যাতে করে বস্ত্র তৈরি করা সম্ভব না হয় তার কারণ ছিল বস্ত্রশিল্প তাদের একমাত্র রুটি রোজগারের অবলম্বন, নটিংহাম Nottingham এ woollen knitting চালু করার ব্যাপারে তারা প্রচণ্ড বাধা দেয়। লাঙ্কেশিয়ার (Lancashire) এবং দার্বেশিয়ার (Derbyshire) এ দুটি অঞ্চলে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল ইর্য়কশিয়ার Yorkshire নামক অঞ্চলে বড় কাঁচির মতো যন্ত্র প্রস্তুতকারকগণ এধরনের কাঁচি ব্যবহার করে বীজ ধ্বংস করতে আরম্ভ করে, তারা মূলত চিরাচরিতভাবে ও পেশাগতভাবে ভেড়া কাটার কাজ করত অর্থাৎ কসাই ছিল।

১৮৩০ এর বিদ্রোহে ফার্মে কর্মরত শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের শ্রম বিপদের মুখে কারণ ধান মাড়ানোর জন্য শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে রবিশস্য পৃথক করে খোলসফেলে দেওয়ার জন্য। এরফলে বিদ্রোহী শ্রমিকরা মেশিন (যন্ত্র) গুলো ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। এ সমস্ত কারণের জন্য নয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং চারশ পঞ্চাশ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং শাস্তিমূলকভাবে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পাঠানো হয়েছিল। (প্রসঙ্গ দশ)

এ আন্দোলনগুলো লুধি মতবাদ নামে (Luddism) পরিচিত। (১৮১১-১৭)। যার শুরু করেছিল জেনারেল নেড লুধ নামে এক দক্ষ জেনারেল ভিন্ন ধরনের প্রতিবাদের নজির সৃষ্টি করার জন্য। লুধি মতবাদ (Luddism) শুধু যন্ত্র প্রযুক্তির বিরোধিতা করে স্থগিত ছিল না। আন্দোলনে যোগদানকারীরা তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক দাবি করেছিল। মহিলা ও শিশুশ্রমিকদের শ্রম কমানোর স্বার্থে প্রতিবাদ করেছিল। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে কার্যচ্যুত কর্মচারীদের স্বার্থে এবং ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে

*This name was made up to rhyme with 'Waterloo'; the French army had been defeated at Waterloo in 1815.

তোলার জন্য প্রস্তুত হন যাতে করে তাদের প্রকৃত চাহিদা আইনসঙ্গতভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

শিল্পবিপ্লবের প্রারম্ভে শ্রমিকদের কোনও ধরনের আইন প্রণয়ন করার করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। যাতে করে তারা তাদের পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্যটুকু পেয়ে থাকে। তাদের ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না। কোনও ধরনের আইন তাদের সুবিধার্থে প্রণয়ন করা হয়নি যাতে তারা তাদের ক্ষোভ আইনের সাহায্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। এসমস্ত কারণে তাদের জীবন অতিশয় সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৮১৯ এর আগস্ট মাসে মাঞ্চেস্টার শহরে সেন্ট পিটার্স এর মাঠে (Manchester) আশি হাজার লোকের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই জনসভায় তারা গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও প্রেমের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের অভিপ্রায় জানাতে আরম্ভ করে। তারা পিটারলো মেসাকার (Perterloo Massacre) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং 'Six Act' তাদের চাহিদাগুলোকে অগ্রাহ্য করার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানা যায়, পার্লামেন্ট থেকে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল একই সময়ে। 'Peterloo' এর ঘটনার পর হাউস অব কমনস্ (house of commons) এর প্রতিনিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন গুরুত্ব পেয়েছিল তার কারণ ছিল লিবারেল পলিটিক্যাল গ্রুপ (liberal political group) এর দ্বারা তা অনুমোদিত হয়েছিল এবং 'সমন্বয় আইন' (combination act) এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল, ১৮২৪-২৫ সালে।

আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্কার

মহিলা ও শিশুদের সম্পর্কে সরকারের সচেতনতা কতটুক?

১৮১৯ সালের আইন অনুসারে নয় বছরের নীচে শিশু শ্রমিকদের কলকারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ ও বেআইনি বলে ঘোষিত করা হল। এবং নয় বছর থেকে ষোল বছরের মধ্যে শ্রমিকদের বারো (১২) ঘণ্টা কাজ প্রতিদিন ধার্য করা হল। কিন্তু ত্রুটিমুক্ত আইনের ফলে তা বলবৎ করা সম্ভব হল না। ১৮৩৩ সালের পর ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে আইন পাশ করা হয় যাতে নয় বছরের নীচে শিশুরা শুধু সিল্ক ফ্যাক্টারিতে কাজ করতে পারবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য কাজের সময় নির্ধারণ করা হয় এবং একইসঙ্গে সঠিকভাবে আইন বলবৎ হল কি না তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর পদের নিযুক্তি দেওয়া হল। সবশেষে ৩০ বছর লড়াইয়ের পর ১৮৪৭ সালে (Ten hours) দশ ঘণ্টা বিল পাশ করা হল। এর ফলে কৃষক ও মহিলাদের জন্য প্রত্যহ কাজের সময়সীমা নির্ধারিত করা হল। পুরুষ শ্রমিকদের জন্য প্রত্যহ দশ ঘণ্টা সময় কাজের সময়সীমা নির্ধারিত করা হল।

কার্যক্রম ৪

ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে কারখানার কর্মরতদের সম্পর্কে সরকারের আইনাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অবস্থার বিবেচনা কর ।

এই আইনগুলো বা আইনের ধারাগুলো বয়নশিল্পের জন্য (Textile Industry) ও প্রযোজ্য ছিল। খনিজ শিল্পের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য ছিল না। ১৮৪২ সালে সরকার খনিক মিশন (Mines commission) গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে খনিতে কাজ করা রীতিমতো তখন কঠিন সমস্যার বিষয় ছিল। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদেরকে খনিতে কাজ করার জন্য বাধ্য করা হত। দশ বছরের নিচে ও মহিলাদেরকে খনিতে কাজ বন্ধ করার আদেশ জারি করা হল খান এবং কুলিদের জন্য আইন (The Mines and collieries act) ১৮৪২ অনুসারে।

শিল্পবিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিতর্ক

১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইতিহাসবিদগণ (১৭৮০ থেকে ১৮২০) পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মত পোষণ করেছিলেন যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল "শিল্পবিপ্লব"। তখন থেকে বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে ও প্রসঙ্গটি নিয়ে নানা ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তর্ক বিতর্কের প্রকৃত অর্থে ইন্ডাষ্ট্রিলাইজেশনস্ (Industrialisation) মানে ধারাবাহিক গতিতে শিল্প সমৃদ্ধি বা কলকারখানা গড়ে তোলা এক্ষেত্রে বিপ্লব শব্দটি উপরিউক্ত শব্দটির সমার্থক শব্দ নয়।

শিল্পবিপ্লবের সূচনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারাগুলিকে ইতিপূর্বে নির্ধারিত উপাদানগুলোর পথে সঠিকভাবে অগ্রগমন করানো।

ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকের প্রতি মনোযোগ ও অর্থের বিপুল ব্যবহারের পাশাপাশিভাবে শিল্পবিপ্লব গড়ে উঠার জন্য সম্পর্ক যুক্ত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিশাল অঞ্চল শিল্পবিপ্লবের আওতার বাইরে ছিল। ফ্যাক্টরি ও খনির খোঁজ প্রকৃত অর্থে সে অঞ্চলগুলিতে হয়নি যার ফলে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রকৃত পক্ষে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে জড়িত হতে পারেনি। সুতরাং "শিল্পবিপ্লব" কথাটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ইংল্যান্ডের পরিবর্তনগুলি মূলত হয়েছিল প্রাদেশিক অঞ্চলগুলিতে যেমন লন্ডন, মাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম, নিউক্যাসেলস্ ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে, সমগ্র ইংল্যান্ডে তা গড়ে উঠেনি।

কটনশিল্পে (তুলা), লৌহশিল্প বা বিদেশি ব্যবসার ক্ষেত্রে এই বিপ্লব সত্যিই কি পরিবর্তন আনতে পেরেছিল। ১৭৮০ থেকে ১৮২০ এর সময়সীমার মধ্যে?

ধারণা থেকে অনুমান করা যায় কটন কারখানার বৃদ্ধি ঘটে যন্ত্রে প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে তার মূল কারণ ছিল সে সময় ব্রিটিশ সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করত এবং নিজের দেশে নিয়ে যেত যার ফলে যন্ত্র প্রযুক্তির উদ্ভব হয়, বিশেষত তুলা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিদেশ থেকে আমদানি করা হত তারপর নির্মিত বস্ত্র মেশিনের সাহায্যে তৈরি করে ভারতের মতো দেশগুলিতে বেশি মূল্যে রফ্তানি করা হত । উনবিংশ শতাব্দীতে শেষভাগে ধাতুনির্মিত যন্ত্রশক্তি ও বাষ্পচালিত যন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

১৭৮০ সাল থেকে ব্রিটিশ আমদানি ও রফ্তানির ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল তার মূল কারণ ছিল উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসার পূর্ণগ্রহণ তার কারণের হেতু ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

১৮১৫-২০ সালের মধ্যে গড়ে উঠা শিল্পায়ন অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে যা শুরু করেছিল তা সময়সীমার আগে নয় পরে শুরু হয়েছিল।

১৭৯০ এরপর থেকে যে ধারণা হয়েছিল তাতে দেখা যায় ধ্বংসাত্মক ফলাফল ফরাসী বিপ্লবের এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছিল। শিল্পায়ন শব্দটিকে ব্যবহার করা যায় রাষ্ট্রের সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে, বিল্ডিং তৈরি করার ক্ষেত্রে, মেশিন প্রযুক্তির উন্নতি সাধনে যাতে তার মাধ্যমে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

১৮২০ সালের পর উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বিনিয়োগ শুরু হয়েছিল এবং তার ফলে উৎপাদনের মাত্রাও বৃদ্ধি ঘটেছিল। ১৮৪০ পর্যন্ত কটন (তুলা), লৌহ, কারিগরি শিল্পের অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিবেচনায় উন্নতি অর্ধেক হয়েছিল। কারিগরি শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়নি কিন্তু কৃষি ও মৃতশিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি তুলনায় কম হয়েছিল।

উত্তর অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ১৮১৫ সালের পর খুব দ্রুত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উন্নতি হতে আরম্ভ করেছিল যা পূর্বে হয়ে উঠেনি। ইতিহাসবিদদের মতে ব্রিটিশরা ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ এ সময়ের মধ্যে পাশাপাশি দুটো দিকে মনোনিবেশ করেছিল — শিল্পায়ত্ত করা, এবং ইউরোপের সঙ্গে যুদ্ধ, উত্তর আমেরিকা ও ভারতের সঙ্গে তার মধ্যে সম্ভবত এক জায়গায় পরাজিত হয়। ব্রিটেন যুদ্ধে ৬০ বছর রত ছিল তার মধ্যে ছয়ত্রিশ (৩৬)টি যুদ্ধ করেছিল ১৭৬০ সাল থেকে। অর্থসম্পদ উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত না হয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। নাগরিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধের ক্ষতি পূরণের মাত্র পয়ত্রিশ শতাংশ আদায় করা হয়েছিল। শ্রমিকদের ফ্যাক্ট রি ও ফার্ম থেকে সৈন্যে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটার ফলে সাধারণ মানুষের স্বল্প আয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে যথেষ্ট সমর্থ ছিল না।

নেপোলিয়নের অন্তরায় (Blockade) নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হতে বাধ্য করেছিল যার ফলে ইউরোপ মহাদেশে বাণিজ্যিক স্থিতির ব্যাঘাত হয়ে গতি হারিয়ে ফেলে।

The Great Exhibition of 1851 displayed "the Works of Industry of all Nations", particularly the spectacular progress of Britain. It was held in London's Hyde Park, in the Crystal Palace, made of glass panes set in iron columns manufactured in Birmingham.

ব্রিটিশ রপ্তানী দ্রব্যের অর্ধেক সামগ্রী ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর হাতে ছিল।

শিল্পসংক্রান্ত (Industrial Revolution, বিদ্রোহ) এই শব্দটি সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। শব্দ দুটির মধ্যে শব্দের ব্যবহার গত ত্রুটি ছিল। অর্থনৈতিক বা শিল্পায়নের অধিক ও রূপান্তরের ফলে সমাজে দুটি শ্রেণী সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল ঃ বুর্জোয়া (bourgeoisie) নব্য প্রলেটেরিয়ান শ্রমিকগোষ্ঠী শহর ও দেশ জুড়ে।

১৮৫১ সালে ভ্রমণকারী ও দর্শনার্থীরা, বিরাট শিল্প, প্রদর্শনীর মাধ্যমে লন্ডন তৈরি 'ক্রিষ্টেল পেলেস্' ('Crystal palace') এর দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হত। যা ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পের নিদর্শন। সেসময় সর্বমোট লোক সংখ্যার অর্ধেক শহরে বসবাস করত, তার মধ্যে শহরে বসবাসকারী শ্রমিকরা ছিল ফ্যাক্টরির হস্তশিল্পি। ১৮৫০ সাল থেকে লোকসংখ্যা সমানুপাতে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক কারখানার শ্রমিক ছিল। মাত্র বিশ শতাংশ ব্রিটিশ কর্মচারী গ্রামে বসবাস করত। শিল্পায়নের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় ইংল্যান্ডে এ ধরনের পরিস্থিতি পরিমাণে বেশি অনুপাতে হয়েছিল ।

তার খোলাখুলি অধ্যয়ন ব্রিটিশ শিল্প নিয়ে যা এ.ই মাসন্ (A.E. Musson) প্রস্তাব করেছিলেন যে "There are good grounds for regarding the period 1850-1914 as that in which the Industrial Revolution really occurred on a massive scale, transforming the whole economy and society much more widely and deeply than the earlier changes had done."

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ব্রিটিশ কিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল যা ব্রিটিশ শিল্পের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল?

২। কৃত্রিমনালা ও রেলপথের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধামূলক সম্পর্কগুলি কি ছিল।

৩। এ সময়ের আবিষ্কারের আকর্ষণীয় উপাদানগুলি কি ছিল?

৪। নির্দেশকর কিরূপে কাঁচামালের যোগানশিল্প বিপ্লবের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করেছিল।

সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও

৫। শিল্পবিপ্লবের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের জীবন যাত্রার পথে কি ধরনের প্রতিফলন ঘটেছিল।

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেলব্যবস্থার আবিষ্কারের প্রতিফলনের তুলনামূলক আলোচনা কর ।

প্রসঙ্গ ১০

দেশীয় লোকের স্থানচ্যুতি

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাসকারী দেশীয় লোকদের ইতিহাসগত দৃষ্টি কোন সম্পর্কে এ অধ্যায়ে পুনারালোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গ আটে বর্ণিত হয়েছে যে স্পেনিস ও ওলন্দাজরা তাদের ঔপনিবেশ দক্ষিণ আমেরিকায় স্থাপন করেছিল। ১৮০০ শতাব্দীতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে উদ্বাস্তুরা ইউরোপে থেকে এসে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিল, যার ফলে বহুদেশীয় লোক নিজের জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায়। ইউরোপীয়রা নিজেদের বসবাস স্থানকে কলোনী (Colony) বলে অভিহিত করত।

তাদের কলোনীগুলি যখন স্বাধীন হয়েছিল তাকে তখন রাষ্ট্র বলা হত। সেই সমস্ত দেশে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার লোকেরা স্থানান্তরিত হয়েছিল। আজ ইউরোপীয়রা ও এশিয়াবাসীরা যেখানে সংখ্যাগুরু ও দেশীয় লোকেরা সংখ্যালঘু সমাজে পরিণত হয়েছে। আজ সংখ্যালঘু সমাজ শহরে সীমাবদ্ধ ও তাদের ধারণাটুকুও হারিয়ে গেছে যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ একদা নিজেদের করলে আনতে সমর্থ হয়েছিল। অধিকাংশ অঞ্চলের নামকরণ বা নদীর নাম তাদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল। যেমন - আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মিশিশিপি (Messississippi) এবং Seattle, কেনেডায় Saskatchewan, Wollongong এবং অষ্ট্রেলিয়ায় পারামাট্টা (Parramatta)।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ানদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয়রা কিভাবে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছিল তাও বর্ণিত হয়েছে। তাদের যুদ্ধের বিবরণ, ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের নাম কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৪০ সালে নৃতত্ববিদরা তাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমেরিকায় গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৬০ সালে দেশীয় লোকদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল তাদের ইতিহাস রচনা করার জন্য যাকে মৌখিক ইতিহাস বলা হয় (Oral histary)।

আজকের দিনে তাদের লেখা ইতিহাস বুঝা বা অনুধারণ করা সম্ভব কারণ এটা নিয়ে গবেষণা হয়েছে এবং মিউজিয়ামে তাদের দ্বারা তৈরি চিত্রকলা ও তাদের সম্পর্কিত নানা জিনিস অনুধারনের অন্বেষণে দর্শকরা দেখতে আসে এবং অনুধারণ করার প্রয়াস করে থাকে।

জাতীয় সংগ্রহ শালায় (National Museum) আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কিত অনেক কিছু আছে যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও সেগুলি দেখাশুনা করার দায়িত্বে আছে এই আমেরিকান ইন্ডিয়ান যাজকরা।

ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদ

১৭০০ শতাব্দীর পর স্পেন ও পুর্তগালে আমেরিকার সাম্রাজ্য বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। তারপর অন্যান্য দেশগুলি যেমন - ফ্রান্স, হলান্ড, ইংলেন্ড তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে এবং সাথে সাথে আরম্ভ করে আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও আয়্যারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ও মহাদেশে তাদের ঔপনিবেশ গড়ে তুলতে। মূলত তারা ইংলন্ডের ঔপনিবেশ এবং সবভুস্বামীরা ইংলন্ডের লোক হিসেবে সেখানে বসবাস করত।

১৮০০ শতাব্দীতে লাভজনক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি ঔপনিবেশ গড়ে

তোলার মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে। এই তাৎপর্য্য মূলক বিষয়টির মধ্যদিয়েই তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়েছিল।

দক্ষিণ এশিয়ায় এই ব্যবসায়ি কোম্পানিগুলি যেমন - ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) বাণিজ্যের সাথে সাথে স্থানীয় লোকদের পরাস্ত করে রাজশক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল ও দেশীয় রাজ্যগুলি ও অধিগ্রহণ করতে শুরু করেছিল। তারা ভূস্বামীদের নিকট হতে কর আদায় করতে আরম্ভ করে অথচ তাদের আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক ছিল। পরবর্তী সময়ে রেল ব্যবস্থার প্রসার ঘটে যাতে করে অতি সহজে ব্যবসা বাণিজ্য করা সম্ভব হয়ে উঠে এবং খনিজ পদার্থ তাদের দেশে কাঁচামাল হিসেবে পাঠাতে শুরু করে এবং এভাবে আবাদ বা ঔপনিবেশ গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল।

শুরুতে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশ ছেড়ে সমুদ্র নিকটবর্তী অঞ্চল গুলিতে ইউরোপীয়রা তাদের ব্যবসা শুরু করেছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তারা সে সমস্ত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অভিযান ও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। তারপর বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশ সেখানে গঠন করে এবং আফ্রিকা মহাদেশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

ঔপনিবেশবাসী (Settler) শব্দটি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ওলন্দাজ জাতিগোষ্ঠীদেরকে বলা হত। তাছাড়া আয়্যারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ব্রিটিশদেরকে এভাবে সম্বোধন করা হত। আমেরিকায় ইউরোপীয়দের তদ্রুপ বলা হত। এসব কলোণী বা ঔপনিবেশ গুলির সরকারী ভাষা ইংরাজী কিন্তু কেনেডায় সরকারী ভাষা ছিল ফরাসী।

নতুন পৃথিবীর দেশগুলিকে ইউরোপীয়দের দেওয়া নাম

আমেরিকা (America)	আমেরিকা নামটি প্রকাশ হয়েছিল প্রথম যখন এমিরিগো ভেসপুসি (Amerigo vespucci) তার ভ্রমণ শেষ করেছিল। (১৪৫১-১৫১২)
'কেনেডা' (Canada)	'কানাটা' (Canata) হতে উৎপত্তি হয়েছে (= গ্রাম Huran Iroquois দের ভাষায় অনুসন্ধানকারী) জেরিউস্ কারটিয়ার (Jacquees cartier) প্রথম অনুধারণ করেছিল ১৯৩৫ সালে।
অষ্ট্রেলিয়া (Australia)	বিখ্যাত দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রতট ভূমি যার নাম ১৬০০ শতাব্দীতে দেওয়া হয়েছিল। (অষ্ট্রেল যার অর্থ লেটিন ভাষায় হল দক্ষিণ)
নিউজিল্যান্ড (Newzealand)	হলান্ডদেশের তসমান (Tasman) নামটি রেখেছিলেন কারণ ১৬৪২ সনে উনি প্রথম দ্বীপটি দেখতে পেয়েছিলেন (জি হচ্ছে ওলন্দাজদের জন্য 'সমুদ্র')

ভৌগোলিক অভিধানে (পৃঃ ৮০৫-৮২২) একশতটি স্থানের নাম দেওয়া আছে। নতুন (New) শব্দের মাধ্যমে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম শুরু হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা

আরটিক সার্কল (Arctic cercle) হতে ট্রপিক কেনসার (Tropic cancer) এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যমহাসাগর পর্য্যন্ত পশ্চিমে রকি পর্বতের শৃঙ্গের শৃঙ্ঘল এলাকা থেকে এরিজন (Arizon) ও নেভেডা (Nevada) মরুভূমির মধ্যদেশ পর্য্যন্ত এবং পূর্বদিকে বৃহৎ সমতল। বিখ্যাত হ্রদ, মিশিশিপি এবং ওহিও (Oheo) ও আপ্পালাচেন পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকা মহাদেশটি বিস্তার লাভ করেছিল। তার দক্ষিণে হচ্ছে মেক্সিকো। শতকরা চল্লিশ শতাংশ কানাডা বনাঞ্চলে আবৃত। বিভিন্ন অঞ্চলের মূল উপাদান তেল, গ্যাস ও খনিজ পদার্থ যা কেনেডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প গড়ে উঠার মূল উৎস। আজকের দিনে ও গম, ভূট্টা এবং ফলমূল কেনেডায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং মৎস চাষ একটি প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

ইউরোপ হতে আগত উদ্ধাস্তুরা তাদের বিগত ২০০ বৎসর খনিজ, (Mining) কৃষি ইত্যাদিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার বসবাসকারীরা বিগত হাজার বৎসর ধরে ইউরোপীয়দের বসবাসের পূর্ব হতে তাদের অস্বিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

নেটিভমানে স্থানীয় অধিবাসী। বিংশ শতাব্দরে প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত উক্তিটি বর্ণনা করার জন্য ইউরোপীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল দেশগুলির বসবাসকারী লোকেদের সম্পর্কে যারা উপানিবেশে পরিবর্তীত হয়েছিল।

'Native' means a person born in the place he/she lives in. Till the early twentieth century, the term was used by Europeans to describe the inhabitants of countries they had colonised.

দেশীয় জনগণ

এশিয়া মহাদেশ হতে আগত বাইরিং ষ্ট্রেইট (Bireng straight) হয়ে ৩০,০০০ হাজার বৎসর পূর্বে আমেরিকায় প্রথম বসবাসকারীরা এসেছিল। এবং শেষ বরফ যুগ (Ice age) অর্থাৎ ১০,০০০ বৎসর পূর্বে এসব জাতি গোষ্ঠী পুনরায় দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেছিল।

> 'At sunset on the day before America [that is, before the Europeans reached there and gave the continent this name], diversity lay at every hand. People spoke in more than a hundred tongues. They lived by every possible combination of hunting, fishing, gathering, gardening and farming open to them. The quality of sails and the effort required to open and tend them determined some of their choices of how to live. Cultural and social biases determined some of their choices of how to live. Cultural and Social bases determined others. Surpluses of fish or grain or garden plants or metals helped create powerful, tired societies here but not there. Some cuttures had endured for millennia. – William Macleish, *The day before America*.

এই জাতি গোষ্ঠীগুলি দলবদ্ধভাবে নদীতীরের গ্রামগুলিতে বসবাস করত। তারা মূলত মাছ, মাংস আহার করে জীবনধারণ করত এবং শাকসব্জি ও ভূট্টা চাষ করত। তারা খাদ্যের অন্বেষণে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাতায়াত করত এবং জঙ্গলে বাইসন (Bison) নামক জন্তুর খোঁজে ঘুরে বেরাত। ১৭০০ শতাব্দীতে স্পেনিস বসবাসীকারীদের নিকট হতে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করা শিখেছিল এবং জানোয়ারদের তাদের আহারের প্রয়োজনে নিধন করত। প্রকৃত অর্থে খাদ্যের প্রয়োজনে তারা জন্তু জানোয়ারের শিকার করে থাকত।

বাড়তি খাওয়ার তেমন চাহিদা না থাকায় তারা কৃষিকার্য্যে তেমন আগ্রহী ছিল না। তাদের রাজ্য বা স্থায়ী বাসস্থানের তেমন অভিপ্রায় ছিল না। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় তখন ও সাম্রাজ্যের তেমন প্রসার ঘটেনি। সীমা অধিকার নিয়ে কিছু কিছু জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। তাদের ভূমি বা বাসস্থানের স্বায়িত্ব সম্পর্কে কোন স্পষ্ট চিন্তা বা মনোভাব ছিল না। তাদের মূল চাহিদা ছিল খাদ্য আহরণ করা এবং ভূমির প্রয়োজন ছিল বসবাসের জন্য। তারা খাদ্য অন্বেষনের জন্য এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যেত। তারা সম্পর্ক তৈরি করত, বন্ধুত্ব গড়ে তুলত মূলত একে অন্যের মধ্যে উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে এবং এটাই ছিল তাদের মূল কৃষ্টি বা সভ্যতা। তাদের উপহার কোন ভাবেই ক্রয় করা হত না কিন্তু তবু ও এটা ছিল উপহার এরকম একটা বোধ তাদের ছিল।

Wampum belts,made of coloured shells sewn together, were exchanged by native tribes after a treaty was agreed to.

উত্তর আমেরিকার লোকেরা নানা ভাষায় কথা বলত কিন্তু এগুলি লিখিত ভাবে ব্যবহৃত হয় নি। কথ্য ভাষাই তাদের মূল যোগাযোগের মাধ্যম ছিল। তারা বিশ্বাস করত সময় পরিবর্তনশীল সুতরাং তাদের বংশধারা তাদের ইতিহাস, উৎস এ সমস্ত বংশাক্রমিক ভাবে প্রসার করবে। তারা দক্ষ ছিল হস্তশিল্পে ও সুন্দর কার্পাস বস্ত্র বা পশম বস্ত্র তৈরি করতে।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে বৈরীতা ও মোকাবিলা

দেশীয় নাগরিকদেরকে কেন্দ্র করে ইংরেজীতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে নতুন পৃথিবী (New world) শব্দটিকে।

আদিবাসী - অষ্ট্রেলিয়ার দেশীয় জনজাতি লেটিন্ ভাষায় 'এব' (ab) মানে হতে, Origine অর্থ 'উৎপত্তি' অর্থাৎ প্রারম্ভ বা শুরু।

আমেরিকার ইন্ডিয়ান (American Indian) / এমিরিন্ড (Amerind) / এমিরিন্ডিয়ান (Amerindian)

দেশীয় জনজাতি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কেরেবিয়ানদের বোঝায়।

প্রথম দেশীয় জনজাতি (First Nation peoples) — গোষ্ঠীবদ্ধ জনজাতি যারা কেনেডার সরকার দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে (১৮৭৬ সনে ভারতীয় আইন 'গোষ্ঠী' শব্দটির সংজ্ঞা ব্যবহার করে। কিন্তু ১৯৮০ থেকে 'জাতি' হিসেবে পূর্ববর্তী শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।

আদি জাতি গোষ্ঠী (Indigenous people) — যে সমস্ত লোক প্রকৃতি গত ভাবে এক জায়গায় বসবাস করে।

দেশীয় আমেরিকারলোক (Native American) — আমেরিকার আদি জনজাতি বা জাতিগোষ্ঠী (এখন শব্দটি বহুল ভাবে প্রচলিত)

'Red Indian' তামাটে রংয়ের লোকেরা / জনজাতি — তামাটে রংয়ের সংমিশ্রণে গঠিত জনজাতি যাদেরকে কলম্বাস নামক নাবিক ভারতীয় ভেবে ভুল করেছিল।

(Winnebago) উহনিবেগো নামে এক মহিলা Wisconsin নামক স্থানে বাস করত। ১৮৬০ সনে (Nebraska) নেবরাসকা তে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

দেশীয় জাতি গোষ্ঠীদের নামগুলি প্রায়সই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেগুলির সাথে তাদের সাথে যুক্ত ছিলনা ডেকোটা Dakota (উড়োজাহাজ) চেরোকি Cherokee (দীপ গাড়ি) পনটিয়াক (Pontiac) (গাড়ি) Mohawk (ছোটচুল)

'It was indicated on the stone taleles the Hopes had that the first brothers and sisters would come back to them would come as turtles across the land. They would be human being, but they would come as turtles so when the time came class the Hopes were at a special village to welcome the turtles that got up in the morning and looked out at the surprise. They looked out across the desert and they saw the Spanish conquistadores coming, covered in armour, like turtles across the land. So this was them so they went aut to the spanish man and they intended their hand hoping for the handshake but into the hand the shyness man dropped a trinkel. And so word spread throughout North America that there was going to be a hard time, that may be some of the brothers and sisters had forgotten the sacredness of all things and all the human beings were going to suffer far this on the earth'

– From a talk by lee Brown, 1986

Hopi দেশীয় জাতিগোষ্ঠী বর্তমানে Calefarnia এর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে।

দুমাসের কষ্টকর সমুদ্র যাত্রার পর ১৭০০ শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাবিকগণ উত্তর আমেরিকার সমুদ্রতটে গিয়ে পৌঁছায়। পৌঁছানোর পর দেশীয় লোকদের নিকট হতে উষ্ণ অভিনন্দন ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিল। স্পেনিশরা অর্পযাপ্ত সোনা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নিজেদের দেশে নিয়ে আসে। অন্বেষকরা মাছ ধরতে এসেছিল এবং শিকারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হতে সাহায্য পেয়েছিল।

দক্ষিণের অতিরিক্ত অঞ্চল ও মিশিশিপি (Mississippi) নদীতীরে দেশীয় লোকদের জমায়েত ফরাসী লোকেরা দেখতে পেয়েছিল। এবং তাদের নির্মিত হস্তশিল্প বস্তু ও বিভিন্ন রকমারী বস্তু, খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করেছিল যেহেতু এগুলো অন্যত্র পাওয়া যেতনা। স্থানীয় রকমারী জিনিষ পত্র বিনিময় করার জন্য ইউরোপীয়রা তাদেরকে কম্বল, লোহার নির্মিত বস্তু, ও অন্যান্য জিনিষপত্র যেমন - বাসন, বন্দুক, তীর ধনুক তৈরি করার সামগ্রী যার সাহায্যে পশু হত্যা করা যায় সেগুলো দিত। এগুলোর বিনিময়ে দেশীয় লোকেরা মদ্য পান করতে পারত। সম্ভবত শেষ দ্রব্যটি সম্পর্কে তাদের পূর্বে ধারণা ছিল না। মদ্য পান করার ফলে তারা ধীরে ধীরে নেশাগ্রস্থ হতে আরম্ভ করে যার ফলে অতিসহজে ইউরোপীয়রা তাদের চাহিদা মত জিনিষপত্র ও অন্যান্য জিনিষ সহজে আদায় করে নিয়ে যেতে পেরেছিল। (ইউরোপীয়রা তাদের নিকট হতে তামাক (Tabacco) সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল।

কিউবেক (Quebec)	আমেরিকার ঔপনিবেশ গুলো (American colonies)
জনকেবট ১৯৪৭ সালে নিউফাউন্ডল্যান্ড নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন।	১৫০৭ সনে এমিরিগো ভেসপুসির (Amerego vespucce's) ভ্রমণ কাহিনী মুদ্রিত হয়েছিল।
১৫৩৪ সন্দে সেন্টলরেন্স নদী (St Lawrence river) পর্য্যন্ত জেকস্কাটিয়ার (Jacques cartier) পৌছায় যা দেশীয় লোকদেরবসবাসের অঞ্চলের সাথে মিলিত হয়েছে।	
	১৬০৭ সনে ঔপনিবেশ এর খোজ ব্রিটিশরা পেয়েছিল ১৬২০ সনে ব্রিটিশ প্লাইমাউত (Plymouth) খুঁজে পায় যা মেসাচুট (Mas sachusetts) এ অবস্থিত।

পাস্পরিক ইন্দ্রিয় সর্ম্পকিত উপলব্ধিকরণ

১৮০০ শতাব্দীতে শিক্ষিত শ্রেণি বলতে ইউরোপের 'সভ্য লোক' দেরকে বুঝানো হত। তাছাড়া সমষ্টিগত ধর্মাবলম্বী ও শহরাঞ্চল বোধ যাদের ছিল তাদের কে 'সভ্য' বলা হত। কিছু লোকের দ্বারা যেমন - জিনজেকসরুশো (gean gacques Rousseau) তিনি তাদের প্রতি যুদ্ধভাবে প্রসংসা করেছিলেন, যারা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সভ্যতার দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতেন। সে সময় একটি জনপ্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হত যাকে বলা হত 'বিশেষ অসভ্য'। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়াউওয়াই তার কবিতার ভিতরের কিছু অংশে আরেকটি দর্শানুপাতের নির্দেশ করেন। ইহাদেরকেই সে ও রুশোদেশীয়। আমেরিকানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাদের বন্য পশুর ন্যায় বর্ণনা করেছিলেন। স্বাধীনতা ছিল যা তাদের ভাষায় করুনার সমতুল্য। করুনা শব্দটি তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ এরূপ তারা প্রকৃতির কোলে বা পাশে বাস করত কিন্তু তাদের কল্পনাশক্তি অনুভূতি, আবেগ ছিল সীমিত।

আমেরিকার তৃতীয় রাষ্ট্রপতি Thomas gefferson words warth এর সমসাময়িক ছিলেন। দেশীয় জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তার ব্যক্ত শব্দ

ওয়ার্ডওয়ার্থের চাইতে বয়োঃকনিষ্ঠ লেখক ওয়াশিংটন আরভিং যিনি স্থানীয় লোকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তার বর্ণনায় বলেছেন-

'The Indians I have had an opportunity of seeing in real life are quite different from those described in poetry .... Taciturn they are, it is true, when in company with white men, whose goodwill they distrust and whose language they don't understand; but the white man in equally tacitum under like ciruemstances. When the Indians are among themselves, they are great mimics, and entertain themselves excisively at the expense of the white .... who have supposed them impressed with profound respect for their grandeur and dignity .... The whiteman (as I have witnessed) are prone to treat the poor Indians as little better than animals.'

দেশীয় লোকদের ইউরোপীয়দের সাথে বিনিময় হওয়া বস্তুগুলি উপহার ছিল। তাদের মনে-হত এগুলি তাদের বন্ধু উপহার দিয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয়দের কাছে এগুলি স্বপ্নের বস্তু যা তাদেরকে ধনবান হতে সাহায্য করবে। যেমন - মাছ ও পশুলোম তারা ইউরোপের বাজারে চড়াদামে বিক্রী করত। দ্রব্যের আমদানীর উপর নির্ভর করে বছর বছর দ্রব্য মূল্য ভিন্ন-হত। ইউরোপীয়রা তাদেরকে বিনিময়ের সময় কখন ও বেশি পরিমাণ আবার কখন ও কম পরিমাণ জিনিষ দিত এবং এতে দেশীয় লোকেরা ধাঁধায় পড়েযেত। এভাবে দেশীয় লোকেরা ইউরোপ থেকে আগত বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পশুলোম সংগ্রহের নেশায় অধের্য্য হয়ে ও যথেচ্ছ ভাবে ধীবর হত্যা করতে কুণ্ঠা বোধ করত না যার জন্য দেশীয় লোকেরা সবসময় ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল কারণ যেকোন মূহুর্তে তারা ধীবরদের প্রাণ সংহার করতে পারে।

প্রথম ইউরোপীয় ব্যবসায়ী জাতি গোষ্ঠী কালদিনে আমেরিকায় বসবাস করতে আরম্ভ করে। ১৭০০ শতাব্দীতে একদল ইউরোপীয়ান বিভিন্ন খ্রীষ্ট ধর্মালম্বী মতবাদে বিশ্বাসী নিজ দেশ হতে রাজনৈতিক কারণে নির্বারিত হয়েছিল শাস্তি প্রদানের জন্য। প্রটেষ্টান্ট মতবাদী লোকেরা বাসকরত কেথলিক মতবাদে বিশ্বাসী দেশ গুলিতে বা কেথলিক দেশে প্রটেষ্টান্ট ছিল রাজধর্ম তাদের অনেকে ইউরোপ পরিত্যাগ করে নতুন জীবনের উদ্দেশ্য আমেরিকা গমন করেছিল।

*Many folk tales of the natives mocked Europeans and described them as greedy and deceitful, but because these were told as imaginary stories, it was only much later that he Europeans understood the references.

যারফলে ধীরে ধীরে ইউরোপের জনবসতি হ্রাস পেতে আরম্ভ হয়। জমি ব্যবহারের জন্য লোকের অভাব ঘটে যদিও বাস্তবে এটা সমস্যা ছিল না। তাসত্ত্বে ও ইউরোপীয়রা দেশীয় গ্রাম সংলগ্নদ্বীপ গুলি তাদের কবলে আনতে প্রয়াসী হয়ে পড়ে। কৃষি কাজ করার প্রয়োজনে লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জঙ্গল পরিস্কার করার কাজ শুরু করে। দেশীয় ও ইউরোপের লোকের জঙ্গলে কাজ করার সময় জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নানা ধরনের জিনিষ দেখতে পেত। বিশেষ ভাবে দেশীয় জনজাতি বা জাতি গোষ্ঠী অদৃশ্য লোকের পদচিহ্ন দেখতে পেত যা ইউরোপীয়রা সহজে দেখতে পেত না। ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল জঙ্গল কেটে ভূট্টার জমি চাষের উপযোগী করবে। জেফার সন এর স্বপ্ন দেশ ছিল ইউরোপীয়দের দ্বারা জনবহুল ও ছোট ফার্মগুলি এদের সঙ্গে ছিল। দেশীয় লোকদের উৎপাদিত শস্য তাদের খাদ্যের প্রয়োজনের জন্য ছিল, বিক্রী করার কোন প্রকার প্রয়াস ছিল না। তারা তাদের উৎপাদন স্থলকে মাতৃভূমি বোধ করত না। এজন্য জেফারসন (Jefferson) তাদেরকে অসভ্য জাতি (Uncivilised) বলে অভিহিত করেন।

কার্য্যসূচী ১

বিভিন্ন প্রতিকৃতির বর্ণনা কর যা ইউরোপীয় এবং দেশীয় আমেরিকানদের একে অন্যের সাথে ছিল এবং বিভিন্ন পথগুলি যার সাহায্যে তারা প্রকৃতিকে বুঝতে বা দেখতে পেত।

কেনেডা	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
১৭০১ সনে ফরাসীদের সঙ্গে কিউবেক এবং দেশীয় লোকদের সন্ধি	
১৭৬৩ সনে ব্রিটিশ জয় লাভ করে। ১৭৭৪ সনে কিউবেক আইন পাশ হয়।	১৭৮১ সনে ব্রিটেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে।
১৭৯১ সনে কেনেডার সাংবিধানিক আইন পাশ হয়।	১৭৮৩ সনে ব্রিটিশ মধ্যপ্রাচ্য (Midwest) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়।

বর্দ্ধিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র

১৮০০ শতাব্দীর শেষ পর্বে কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ নামে পরিচিত হয়। সে সময় তাদের কবলে ছিল একাংশ অঞ্চল বা বিভাগ এখন তা পরিপূর্ণ হয়েছে। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে তাদের সীমা বর্দ্ধিত হয় অতিরিক্ত ভুমি বা দেশ জয়লাভের জন্য এবং বর্তমান ভৌগলিক পরিধি এগুলির পরিনাম। তারা বিশাল অঞ্চল অর্থের জোরে ক্রয় করতে সক্ষম হয়। ফরাসী দেশের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে জমি নিজেদের দখলে আনতে পেরেছিল। লুইসেইনা (Loueseana) অঞ্চল ক্রয় করে রাশিয়ার নিকট হতে। তার পর আলাসকা অঞ্চল ক্রয় করে। মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধকরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকা জয়লাভকরে। তাদের একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে কোন রূপ আলোচনার প্রয়োজন হয় নি এমনকি দেশীয় লোকদের সাথে কোন রূপ আলাপ আলোচনার প্রয়োজন বোধ ও করেনি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছিল পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র যেখান থেকে দেশীয় লোকদের বাধ্য করা হয় অন্যত্র বা আরও পিছনে অবস্থিত অঞ্চলে চলে যেতে।

কেনেডা (Canada)	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (USA)
	১৮০৩ সনে লুইজেয়না (Loueseana) ফ্রান্স থেকে ক্রয় করে।
	১৮২৫ - ৫৮ দেশীয় জাতিগোষ্ঠীকে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে পাঠানো হয়।
১৮৩৭ সনে ফরাসী -কেনেডিয়ান (French Canadian) বিদ্রোহ।	১৮৩২ সনে (Justice Marshall's) বিচারক মার্শালের এর সিদ্ধান্ত
১৮৪০ সনে কেনেডার উচ্চ ও নিম্নবর্গে কেনেডিয়ান সংঘটন তৈরি হয়	১৮৪৯ সনে আমেরিকান (Gold Rush) গোল্ডরাস
১৮৫৯ কেনেডায় গোল্ডরাস অর্থাৎ নবাস্কৃতি স্বর্ণখ ণির দিকে লোক ধাবিত হয় (Gold Rush)	১৮৬১-৬৫ আমেরিকার গৃহ যুদ্ধ
১৮৬৭ সনে কেনেডার সংঘ গঠন করা হয়	১৮৬৫-৯০ আমেরিকান ইন্ডিয়ান যুদ্ধ
১৮৬৯-৮৫ কেনেডার Metis জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত হয় Red River বিদ্রোহ	১৮৭০ ট্রান্স কন্টিনেন্টেল রেল যোগাযোগ
১৮৭৬ সনে আমেরিকায় Canada Indians আইন	১৮৯০ সনে বাইসন (Bison) জন্তুটি প্রায় নির্মূল করা হয়
১৮৮৫ সনে পূর্ব ও পশ্চিমী উপকূল অঞ্চলগুলিতে ট্রান্স কন্টিনেন্টেল রেলওয়ে যোগাযোগ চালু হয়।	১৮৯২ সনে সমাপ্তি ঘটে প্রদেশ সংঘর্ষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচন্ড ভাবে আমেরিকার স্থলভাগের দৃশ্য চিত্রের পরিবর্তন ঘটে। দেশীয় লোকদের থেকে আলাদাভাবে ইউরোপীয়রা জমি ব্যবহার করত। ইংল্যান্ড ফ্রান্স থেকে আগত যুবক পুত্র নিজেদের পৈত্রিক সম্পতি ত্যাগ করে আমেরিকা এসে নিজ বাসস্থান তৈরি করেছিল কিংবা নিজভূমি পাওয়ার জন্য অভিলাসী ছিল।

পরবর্তী সময়ে বহু বহিরাগত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন - জার্মানি, সুইডেন এবং ইটালি হতে আগত নিজস্ব ঘড়বাড়ি পরিত্যাগ করে নিজস্ব খামার বাড়ি তৈরি করার উদ্দেশ্য প্রয়াস চালিয়ে যায়। পোলান্ড হতে আগত লোকেরা সামান্য ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ ঘাস ভুমিতে কাজ করতে আনন্দ পেত এবং তাদের গৃহ নির্মাণ করে এবং তারপর উৎসাহ সহকারে অতি অল্প মূল্যে বিশাল

সম্পতি ক্রয় করেছিল। জমি পরিস্কার করে কৃষি উপযোগী করেছিল এবং ধান ও তূলার চাষ করতে আরম্ভ করে যা ইউরোপে উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। তারা এগুলি অধিক মূল্যে বিক্রী করত। বন্য পশুর হাত থেকে যেমন - সিংহ, চিতাবাঘ, তাদের খামার বাড়ি তাদেরকে রক্ষা করত। কাঁটাতারের বেড়া ১৮৭৩ সনে আবিষ্কার হওয়ার ফলে তারা পুরোপুরি ভাবে সুরক্ষিত হতে সক্ষম হয়েছিল। বন্য প্রাণীর হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে খামার বাড়ি ঘিরে রাখত এবং এভাবে নিজেদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছিল।

দক্ষিণ প্রান্তের বর্হিভাগে অত্যন্ত গরম থাকার দরুণ ইউরোপীয়রা কাজ করার সময় প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হত। যার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশ গুলিতে প্রচুর পরিমাণে ক্রীত দাসের মৃত্যু হত। সেইজন্য বাগান মালিকরা বাধ্য হয়ে আফ্রিকা থেকে ক্রত দাস আনার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে ক্রীত দাস ব্যবসার বিরোধীপক্ষ আইন এর আশ্রয় নিয়ে ক্রীত দাস ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু আমেরিকায় বসবাসকারী আফ্রিকানদের কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের শিশু সন্তানদের ক্ষেত্রে ও কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি।

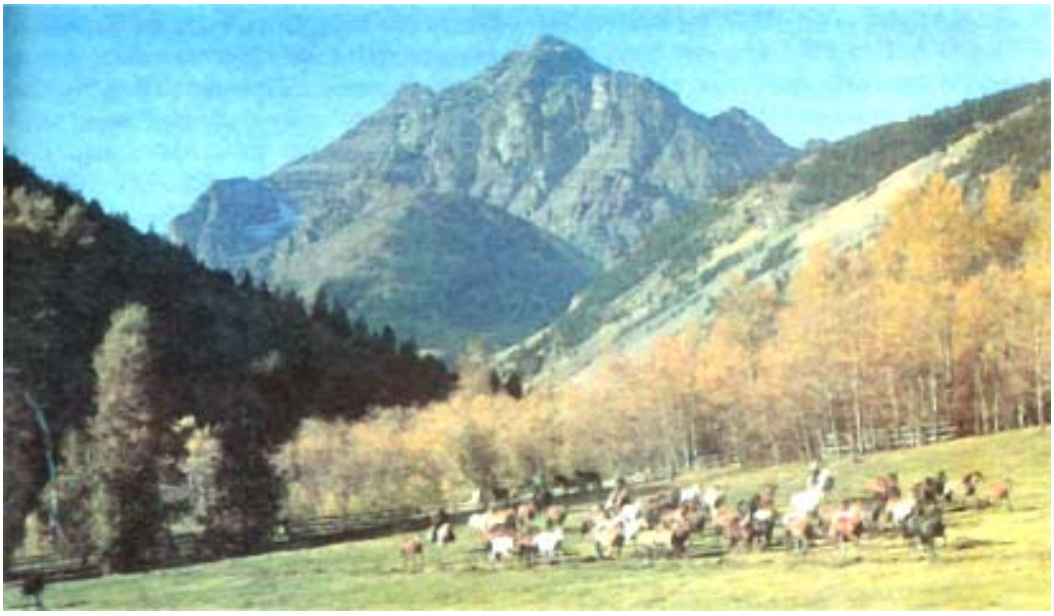

A ranch in Colorado.

আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল গুলোর অর্থনীতি ঔপনিবেশ বা আবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাদের মনে ক্রীত দাস ব্যবসা একটি অমাণবিক সামাজিক অবক্ষয় প্রথা সুতরাং এরকম ব্যবস্থা বাতিল করার পক্ষে তারা সহমত পোষণ করেছিল। ১৮৬১-৬৫ এই সময় সীমা ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়ার ক্রীত দাস ব্যবস্থার সুরাহা করার প্রয়োজনে। পরবর্তী সময়ে ক্রীত দাস ব্যবস্থার অবসান ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় বসবাসকারী আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তৈরি হওয়া পৃথকীকরনের মনোভাব যেমন - স্কুল, যোগাযোগ ব্যবস্থায় তার অবসান ঘটে।

কেনেভিয়ান সরকারের বহুদিন ধরে চলা সমস্যা ছিল যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমাধান করা সম্ভব পর হয়ে উঠেনি এবং সেটি প্রতিভাত হয়েছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভাবে যা ১৭৬৩ সালে ব্রিটিশ দেশীয় লোকদের নিয়ে উঠা প্রশ্নের চেয়ে ও বেশি। ফরাসীদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করে কেনেডা তাদের অধীনে নিয়ে আসে। ফরাসী বসবাসকারী তাদের জন্য স্বায়ত্ব শাসন দাবী করতে আরম্ভ করে।

১৮৬৭ সালে আমেরিককা যুক্তরাষ্ট্র কেনেডায় এক অধিবেশনের আয়োজন করে এবং কেনেডাকে একটি স্বশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দেশীয় লোকেদের নিজভূমি থেকে বিচ্যুতিকরণ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত বোঝা পড়ার মাধ্যমে দেশীয় লোকদের বাধ্য করেছিল তাদের নিজভূমি বিক্রী করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য। তাদেরকে অতি অল্প মূল্যে ভূমি বিক্রী করতে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমেরিকার লোকেরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি মত তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে জমি দখল করে নেয়। (আমেরিকান শব্দের অর্থ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইউরোপীয় লোকেরা)

দেশীয় জনজাতিকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও তেমন উৎসাহ দেখায়নি সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় চেরোকি (Cherokee) জাতিগোষ্ঠী শাসিত হত দেশীয় আইন অনুসারে কিন্তু তারা নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাদের প্রতি এধরনের অবমানবার পরও তারা আমেরিকানদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেছিল এবং ইংরাজী ভাষা শিখার জন্য প্রয়াসী হয়েছিল।

১৮৩২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূখ্য বিচারক এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তার মতে চেরোকি (Cherokee) অধিকৃত জমির উপর কোন ধরনের আইন বলবৎ করা হবেনা। তারা জমি ভোগের জন্য কোন ধরনের আইনের আওতায় আসবে না; এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এনড্রো জেকসন (Androw Fakson) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষ সুবিধা আদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মর্য্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইন্ডিয়ানস্ (Indians) এর ক্ষেত্রে তার মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি মূখ্য বিচারকের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীকে আদেশ দেন চেরোকিজ (Cherokees) জাতিগোষ্ঠীকে তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং গ্রেট আমেরিকার মরুভূমি নামক অঞ্চলে তাদেরকে স্থানান্তরিত করার জন্য। সর্বমোট ১৫ হাজার লোককে বাধ্য করেন এই দূর্গম অঞ্চলে যেতে তার মধ্যে অনেকেরই পথে মৃত্যু হয়।

যারা দেশীয় জাতি গোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি জোরকরে দখল করেন তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে তারা তাদের জমি কাজে লাগাতে সক্ষম ছিলনা। সমালোচকরা তাদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করে যে তারা অতিশয় অলস প্রকৃতির জন্য হস্তশিল্পের দক্ষতা থাকা স্বত্তে ও তা তারা কাজে লাগাতে পারেনি যার ফলে বাজারে বিক্রী করার মতো ভাল কাপড় তারা তৈরি করতে পারেনি। তাদের কোন প্রকার ইচ্ছা ও ছিলনা। ইংরাজী শিক্ষা ও সঠিক ভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরতে সক্ষম ছিল না (অর্থাৎ ইউরোপীয়দের মতো হতে তাদের কোন প্রকার অভিলাষ ছিল না) তাদের ধারণা ছিল তারা একদিন মারা যাবে। উত্তর আমেরিকার তৃণাচ্ছাদিত সামান্য ঢেউঘেলানো বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষি কাজ করার প্রয়োজনে পরিস্কার করা হয়েছিল এবং বাইসন নামক ভয়ানক জন্তুকে হত্যার কাজ শুরু হয়েছিল। একজন ফরাসী দর্শনার্থীর উক্তি যে, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলার ফলে এ সকল আদিবাসী ও বন্য জন্তুদের ধীরে ধীরে বিনাস হতে আরম্ভ হয়েছিল।

দু ধররনের লোক সংখ্যা ভিত্তিক পরিসংখ্যা

	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৮২০	স্পেনিস আমেরিকা ১৮০০
দেশীয় জাতি গোষ্ঠী	০·৬ মিলিয়ন	৭·৫ মিলিয়ন
শ্বেতাঙ্গ	৯·০ মিলিয়ন	৩·৩ মিলিয়ন
মিশ্র ইউরোপীয়ান	০·১ মিলিয়ন	৫·৩ মিলিয়ন
কৃষ্ণাঙ্গ	১·৯ মিলিয়ন	০·৮ মিলিয়ন
মোট	১১·৬ মিলিয়ন	১৬·৯ মিলিয়ন

ঠিক সে মূহুর্তে দেশীয় জাতি গোষ্ঠীকে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্যত্র ভূমি দেওয়া হয় তাদের কে চির স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য। কিন্তু তাদের বসবাস করা স্থানে যদি কোন ধরনের খনিজের যেমন শিশা বা সোনা বা তেলের খনির সন্ধান পাওয়া যেত তবে আবার অন্য জায়গায় তাদেরকে যেতে হত। এভাবে ভ্রাম্যমান জীবনের সাথে লড়াই করার ফলে অসহ্য হয়ে পড়ে এসব জনজাতি/জাতি গোষ্ঠী এবং এরফলে নিজেদের বসবাসের জন্য জায়গা দখলের প্রয়োজনে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জমি সংঘর্ষ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। যার ফল শ্রুতি ঘটে যে তারা এভাবে ছোট ছোট অঞ্চলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সীমাবদ্ধতার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ১৮৬৫ থেকে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত এধরনের সংঘর্ষগুলি সমাধানের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেনা বাহিনীকে তাদের লাগাতার বিদ্রোহ দমনে মোতায়েন করতে বাধ্য হয় এবং বিদ্রোহ দমন করা হয়। কেনেডায় মেটিস (Metis) রা সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে (তারা ছিল দেশীয় ইউরোপীয়দের বংশধর) ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের এর মধ্যে। তার পর সমস্যার সমাধান হয়েছিল।

১৮৫৪-তে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি Chief Scattle বলে পরিচিত একজন স্থানীয় নেতার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। পূর্বে রাষ্ট্রপতি তাদের অধ্যুষিত জমির একটা অংশ আমেরিকার সরকারকে দান করবার জন্য এই গোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জবাবে দলপতি জানান —

'How can you buy or sell the sky the warmth of the land'? The idea is strange to us. If you do not own the breshness of the air and the sparkle of the water how can one buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy share, every mist in the dark wood, every clearing and every humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memories of the red man ...

So, when the great chief in Washington sends words that he wishes to buy our land, he asks much of us. The great chief sends ward that he will reserve us a place so that we can live comfortably . He will be our father and we will be his children. So we will consider your offer to buy our land. But it will not be easy. For this land is sacred to us. The shining water that moves in the streams and rivers is not just water but the blood of our ancestors. If we sell you land, you must remember that it is sacred and you must teach your children that it is sacred and that each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water's murmur is the voice of my father's father.

নৃতত্ব

তাৎপর্য্যপূর্ণ হচ্ছে যে ইহা এ সময় ছিল (১৮৪০ সাল হতে) যে নৃতাত্বিক বিষয় যা উন্নত হয়েছিল ফ্রান্সে যা উত্তর আমেরিকায় পরিচিত হয়েছিল কৌতুহলের বশীভূত হয়ে দেশীয় লোকদের জাতিগোষ্ঠীগুলির এবং ইউরোপের সভ্য লোকদের জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য সূচক ব্যবধান সম্পর্কে অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল। কয়েকজন নৃতত্ব বিশারদ অভিমত পোষণ করেছিলেন যে তারা শুধুমাত্র আদিম লোক ছিল না যাকে ইউরোপে পাওয়া যাবে, আমেরিকার আদিম লোক অধিকন্তু লুপ্ত হবে।

A native lodge, 1862, Archaeologists moved this from teh mountains and placed it in a museum in Wyoming.

নবাবিস্কৃত স্বর্ণখনির দিকে ধাবিত হওয়া এবং শিল্পায়নের অগ্রগতি

সর্বদাই আশা করা হয়েছিল উত্তর আমেরিকায় স্বর্ণখনি আছে। ১৮৪০ সালে কেলিফর্নিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণখনি পাওয়া গিয়েছিল। যার ফলে হাজার হাজার ইউরোপীয়ান স্বর্ণখনির দিকে ধাবিত হতে আরম্ভ করে নিজেদের ভাগ্য বদলানোর উদ্দেশ্যে। মহাদেশে শুরু হয় রেল নির্মাণের কাজ এবং হাজার হাজার চীনা শ্রমিক কাজে নিযুক্তি পায়।

Moving to California as part of the 'Gold Rush', photograph.

এক দেশীয় লোকের বামা, ১৮৬২ নৃতত্ত্ববীদ ইহা হতে সরে গিয়েছিল পর্বতগুলি হতে এবং ইহাকে অবস্থিত করেছিল wyoming এর সংগ্রহশালায়। ১৮৭০ সালে আমেরিকাতে রেল লাইন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৮৮৫ সালে কেনেডা পর্য্যন্ত রেললাইন প্রসারিত হয়। মহাদেশের বাহিরে ও রেললাইন পৌছে গিয়েছিল পুরাতন দেশাগুলিতে (Old Nation) ও খুব মন্থর গতিতে কাজ অগ্রসর হয়। এনড্রো কার্নিজিয়া (Andrew Carnegie) এর দরিদ্র বহিরাগত স্কটল্যান্ডবাসী যিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মিলিয়নার শিল্পপতি প্রজাতন্ত্রের বজ্রপাত ধাবিত হয়েছিল দ্রুত চলমান এক্সপ্রেসের মত।

ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হওয়ার মূল কারণ ছিল চাষীরা তাদের জমি বড় বড় চাষীদের কাছে দিয়ে গেছিল এবং তারা নিজেদের জমি পরিত্যাগ করে কলকারখানায় কাজের প্রতি ধাবিত হয় (প্রসঙ্গ ৯ দেখ)। উত্তর আমেরিকায় শিল্পায়ন হওয়ার ভিন্ন কারণ ছিল। রেল ব্যবস্থার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার জিনিষ পত্র, কলকব্জা তৈরি করার কাজ শুরু হয় এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এসব কারণে মেশিনারী ও যন্ত্র পাতির সহায়তায় উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কেনেডায় শিল্প নগরীর ও কলকারখানার বিস্তার হতে শুরু করে। ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি অনুন্নত রাষ্ট্র ছিল। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ছিল দুর্বল। ১৮৯০ থেকে মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্রে পরিগণিত হয়। যাকে আমরা বলি শিল্প কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কৃষি ব্যবস্থার বিপুল প্রসার ও উন্নতি ঘটে। বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকৃত অঞ্চল গুলি কৃষি উপযোগী হয়ে উঠে এবং জমি, কৃষক ও ফার্ম হাউসের মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ১৮৯০ সালে বাইসন জন্তু প্রায় নির্মুল হয়েছিল। এর ফলে হাজার বছরের পুরনো শিকার বৃত্তির সমাপ্তি ঘটে। ১৮৯২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্য মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিভক্ত হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে। শতাব্দী পুরনো ইউরোপীয়দের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করার কাজের সমাপ্তি ঘটে। অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশ হাওয়াই (Hawaii) ও ফিলিপাইনস্ (Phillippines) পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

Above: Immigrants welcomed by the USA, colour print, 1909

Below: The ranch on the prairie that was the dream of poor European immigrants, photograph.

সাংবিধানিক অধিকার

১৭৭০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসকারীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তাদের স্বাধীনতা অর্জনের আত্মনাদ প্রাচীন পৃথিবীর রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে ছিল। রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে এই আত্মনাদ ছিল অস্তিত্ব রক্ষার বিরুদ্ধে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সংবিধান গঠন, ব্যক্তিগত অধিকার এবং সম্পতির অধিকার যা তখন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পুরোমাত্রায় স্বীকৃতি লাভ করেনি। যাইহউক গণতান্ত্রিক অধিকার (অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠানো এবং যার দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিন করা) এবং 'সম্পত্তি র অধিকার' মূলত শেতাঙ্গদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ডেনিয়েল পল (Daneil pal) এক দেশীয় কেনেডিয়ান তুলে ধরেন ২০০০ সালে টমাসপেইনিধি গণতন্ত্রের পৃষ্টপোষক যিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ও ফরাসী বিপ্লবের সময় 'ইন্ডিয়ানস্' (Indians) দেরকে ব্যবহার করেন এক নমুনা হিসেবে কারণ সমাজ কিরূপে গড়ে তোলা যায় তার এক প্রতি চ্ছবি বা আদর্শের প্রতীক ছিল এরা। তার মতে দেশীয় আমেরিকানরা তাদের দ্বারা উদাহরণ বানাতে পেরেছেন যে কিভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার বীজ বপন করা যায়। তাদের দেওয়া উদাহরণ আমেরিকার চলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। (আমরা বর্বর জাতি নই পৃঃ ৩৩৩)

কার্লমার্ক্স
(১৮১৮-৮৩)
বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, বর্ণনা করেছিল আমেরিকার সীমান্তকে শেষ নিশ্চিত পুজিবাদী ইতপিয়া (utopia).... সীমাহীন প্রকৃতি এবং জায়গা। যার নিকট ছিল সীমাহীন তৃষ্ণা মুনাফা লাভের জন্য যা নিজেদের দ্বারা উপযোগী করে লয়েছিল।

পরিবর্তনের বাতাবরণ বা আবহাওয়া .....

১৯২০ সাল পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কেনেডার দেশীয় জাতিগোষ্ঠীদের তেমন পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 'The problem of Indian Administration' এক সমীক্ষায় সমাজ বিজ্ঞানী লুই মেরিয়াম (Lewis Meriam) এর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল রিপোর্ট ১৯২৮ সালে। তার কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে। এই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে আমেরিকাবাসী ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বিভৎস চিত্রকলা থেকে সহজে তা অনুমান করা সম্ভব হয়।

যাই হউক শেতাঙ্গ আমেরিকাবাসী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে আরম্ভ করে তার কারণ মূলত তাদের করুণ অবস্থা। এগুলি ছিল তাদের নিজস্ব কৃষ্টি, সভ্যতা ও নাগরিকত্বের বিকাশ হওয়ার প্রয়োজনে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই ধারা The Indian reorganisation Act 1934 এ কথা স্পষ্ট করে যে তাদের সংরক্ষণ, জমি ক্রয় করার অধিকার ও ঋণ গ্রহণের কারণে করা হয়েছিল।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কেনেডিয়ান সরকার ভেবেছিল দেশীয় লোকদের জন্য বিশেষ অনুবিধির অবসান ঘটিয়েছিল এই আশা নিয়ে যে তারা মূল স্রোতে যোগদান করবে অর্থাৎ ইউরোপীয় কৃষ্টি গ্রহণ করবে। কিন্তু দেশীয় লোকেরা তা চায়নি। ১৯৫৪ সালে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। ভারতীয় অধিকার ঘোষণা (Declaration of Indian Rights) এবং কিছু সংখ্যক দেশীয় নাগরিক আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিল এই মতে যে তাদের সংরক্ষণকে বাতিল করা যাবে না এবং তাদের কৃষ্টিতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা চলবেনা। কেনেডার জনগোষ্ঠী বিষয়ক আলোচনায় এরকম একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৬৯ সালে কেনেডা সরকার তাদের চিরাচরিত প্রাচীন নিয়ম কানুনগুলো মানতে অস্বীকার করে। আদিগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করে। সরকারের সম্পর্কে এবং বেড়ে এটা সমালোচনার সূত্রপাত করে যাতে সরকার তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৮২ সাল পর্য্যন্ত তাদের সমস্যার সঠিক মূল্যায়ন

করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সরকারের সংবিধান কর্তৃক প্রণীত আইন তাদের এসব চলিত প্রথা মেনে নিতে বাধ্য হয়নি। অনেক আলোচনা হয়ে থাকে তথাপি তার সমাধান করা সম্ভব পর হয়ে উঠেনি যাইহোক আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কেনেডায় তাদের সংখ্যা অতি নগন্য কিন্তু ১৮০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত তারা সমর্থ হয়েছিল নিজেদের চিরাচরিত প্রথা ও কৃষ্টি অটুত রাখতে নিজেদের প্রচেষ্টায়, সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনেডায় তুলনামূলক ভাবে তার মাত্রা অনেকটাই পরিলক্ষিত হয়।

কার্য্যক্রম - ৩
বর্ণনা কর উপর দেওয়া মতামতগুলি অনুসরণকর যা আমেরিকার ইতিহাসবীদগণ দিয়েছেন হাওয়ার্ড স্পোডেক (Howard Spodak) দেশীয় আদি জাতিগোষ্ঠীর জন্য যা আমেরিকার বিপ্লবের ফলাফল ছিল যা ঠিক উল্টো ছিল সে সকল বসবাসীকারীদের হতে বৃদ্ধি সংকোচিত হতে আরম্ভ করে। গণতন্ত্র সৈরতন্ত্রে পরিগণিত হয় সমৃদ্ধি পরিগণিত হয় দারিদ্রতায় এবং স্বাধীনতা পরিগণিত হয় কাবাব রোধে।

ব্রিটিশের অধীনে ভারতীয়রা	জোড় করে কর আদায় করা হত; যদি ও তাতে সমতা ছিল না (মানবিকতা বোধ - প্রস্তুত ছিল না দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রতিনিধি দ্বারা সরকার গঠনে,
দেশীয় জাতিগোষ্ঠী আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়	তারা দেশের নাগরিক নহে। তারা কেনেডার সভ্য জাতিগোষ্ঠীর সমতুল্য নহে। তাদের নিজস্ব ভবিষ্যৎ, কৃষি এগুলো সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট। যাযাবর জাতি হিসেবে চিহ্নিত।
আফ্রিকার ক্রীত দাস আমেরিকাতে	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী নহে; সমান নহে মানবিকতার দিক থেকে - দাসত্ব তাদের সমাজিক নিয়মের এক অংগ, কৃষ্ণাঙ্গরা এখন ও অ বহেলিত।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ

আমেরিকাবাসীদের মত আষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী মানব জাতির এক নিস্তর ইতিহাস রয়েছে। 'আদিবাসী' (সাধারণতঃ এ নামটি বিভিন্ন সামাজিক জাতি গোষ্ঠীদের নিকট হইতে গৃহীত) আদিবাসীরা প্রায় ৪০ হাজার বৎসর পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাস শুরু করেছিল। তারা মূলত নিউজুনিয়া নামক অঞ্চল থেকে এসেছিল যা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে একটি ভূমি সেতু দ্বারা যুক্ত করেছিল। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে (land bridge) এটা স্পষ্ট যে তারা অষ্ট্রেলিয়ার জাতিগোষ্ঠী নহে কিন্তু এ স্থানে বসবাস করেছিল। বিগত শতাব্দীকে বলা হয় 'Dreamtime' অর্থাৎ 'কল্পনাকাল'। ইউরোপীয়দের কাছে এটা একটা জটিল সমস্যা ছিল কারণ তারা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ব্যবধান করতে সমর্থ ছিল না বা তাদের কাছে এটি অস্পষ্ট ছিল। ১৮০০ শতাব্দীর শেষ দিকে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বিভিন্ন জনজাতির সংখ্যা ছিল ৩৫০ থেকে ৭৫০টি। তাদের প্রত্যেকের একটি নিজস্ব ভাষা ছিল। (আজ ও মোটামুটি ভাবে ২০০টি ভাষাভাষি জনজাতি নিজেদের ভাষায় কথা বলে) উত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত 'টরেস ষ্ট্রেইট আয়ল্যান্ডারস্' (Torres straet Islanders) নামে অভিহিত এক বিশাল জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তাদেরকে আদি জাতিগোষ্ঠী 'Aborigini' বলা হত না কারণ তারা অন্য অঞ্চল থেকে এখানে এসেছিল বসবাস করার জন্য। তারা মূলত অন্য জাতিগোষ্ঠীর বংশধর ছিল। ২০০৫ সালে সর্বমোট তাদের শতকরা ২.৪ জন অষ্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ছিল। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত অনিবিড়। আজও বেশির ভাগ শহর সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। (১৭৭০ সালে প্রথম ব্রিটিশরা অবতীর্ণ হন) তার কারণ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ স্থলভূমি মরুভূমিতে আবৃত।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইউরোপীয়দের পদার্পন

১৬০৬ সালে ওলন্দাজ ভ্রমণকারী প্রথম দেশটি দেখতে পায়।

১৬৪২ সালে তসমান (Tasman) ভূমি দ্বীপের ভিতর যার পরবর্তী সময়ে নামকরণ হয় তসমানিয়া (Tasmania)

১৭৭০ সালে জেমস্ কোক (James Cook) পৌছান বটানি সমুদ্র (Botany Bay) যার নাম নিউ সাউথ ওয়েলস্ (New South Wales)

১৭৮৮ সালে দন্ডিত অপরাধীদের (Penal Colony) জন্য ঔপনিবেশ গড়ে তুলেন, সিডনি (Sydney) শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের মানচিত্র নং ২

ইউরোপীয়দের অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাস, দেশীয় জাতিগোষ্ঠী এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভূমি এ গুলির মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এটা গল্পের মিমস্ত্রিয়া থেকে অনুমান করা যায়। যদি ও এ গল্পের অবতারণা শুরু হয় প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে। কেপ্টেন কোক ও তার নাবিকদের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে তাদের সাথে সংঘর্ষ দেশীয় লোকদের যা উৎকর্ষ মূলক তাদের প্রতি বন্ধুত্ব পূর্ণ আচার আচরণের জন্য। ব্রিটিশদের অনুমান থেকে এটা স্পষ্ট যে কোক (Cook) এর হত্যা হয় দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর লোকের হাতে হাওয়াই (Hawaii) নামক স্থানে যা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে অবস্থিত নহে। এ ঘটনা থেকে পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল।

A Description of the sydney Area in 1970

'Aboriginal production had been dramatically disturbed by the British presence. The arrival of a thousand Hungary mouths, followed by hundreds more, put unprecedented pressure on local food resources.

So what would the Daruk people have thought of all this? To them such large scale destruction of sacred places and strange, violent behaviour towards their land was inexplicable. The newcomers, seemed to knock down trees without any reason, for they were not making canoes gathering bush honey

or catching animals stones were moved and stacked together, clay dug up, shaped and cooked, holes were made in the ground, large unwidely structures built. At first they may have equated the clearing with the creation of a sacred ceremonial ground .... perhaps they thought a huge ritual gathering was to be held, dangerous business from which they should steer well clear. There is no doubt the Daruks Subsequently avoided the settlement, for the only way to bring them back was by an official kidnapping.'

– (P. Gremshaw, M. Lake, A Megranth, M. Quartly, Creating a Nation.)

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তারা দেশীয় আদি গোষ্ঠীর নিছিন্ন হওয়ার যথাযথ কারণ গুলি খুঁজে পেয়েছিল যে ৯০ শতাংশ লোক বীজানু সংক্রমনের ফলে, বাসস্থানের অভাবে লাগাতার উদ্ভাস্তুদের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। ব্রাজিলে পূর্তগীজ জাতির অসহ্য কর ব্যবহার এবং অবাধ আসা যাওয়া করার কারণে দেশীয় জাতিগোষ্ঠীরা বাধ্য হয়েছিল তাদের সাথে বিরোধিতা করতে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশ গুলির ইতিহাস অনেকটা এরকম ছিল। ব্রিটিশদের নির্যাতীত মনোভাব আমেরিকানদের-কে ও সহ্য করতে হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের প্রাককাল অবধি। তারপর তারা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ও একই রকম ব্যবহার চালিয়ে গিয়েছিল। শুরুতে বেশির ভাগ বসবাসকারীরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং ইংল্যান্ড থেকে এসব কারণের জন্য তাদেরকে জেলে স্থানান্তরিত করা হত। জেলের সময়-সীমা শেষ করার পর তারা ইংল্যান্ডে ফিরে না গিয়ে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে চলে যেত এবং মুক্ত জীবন যাপন করার অনুমতি পেত। এরপর কখন ও তারা ইংল্যান্ডে ফিরে যায় নি। যেখানে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না শুধু ছিল জমি, মাটি যা তাদের জীবন শৈলীর জন্য অর্পযাপ্ত ছিল না এবং তাদের চলমান জীবনের ধারা থেকে ভিন্ন ছিল। তারা বিনা দ্বিধায় জীবন যাপনের প্রয়োজনে দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর নিকট হতে বলপূর্বক চাষ বাস করার উদ্দেশ্যে জমি দখল করে নিত এবং তাদেরকে জমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে উন্নতির বাতাবরণ

অষ্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশগুলি ১৮৫০ সালে স্বায়ত্ব শাসনের অনুমতি পায়।
১৮৫১ সালে চীনের শ্রমিকদের অনুপ্রবেশ ঃ ১৮৫৫ সালে তাহা আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করা হয়
১৮৫১-১৯৬১ এ সময়ে লোকেরা নবাবিস্কৃত স্বর্ণখনির দিকে ধাবিত হয়েছিল।
১৯০১ সালে ছটি রাষ্ট্র নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ফেডারেশন গঠন করা হয়।
১৯১১ সালে কেমবেরা (Camberra) রাজধানী হয়েছিল।
১৯৪৮-৭৫ দু মিলিয়ন ইউরোপীয় অষ্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি ইউরোপীয়দের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল এবং তদ্রুপ আমেরিকার ক্ষেত্রে ও হয়েছিল। অনেক শ্রমের বিনিময়ে বিশাল জাহাজ নির্মাণ নগরী, খনি সংরক্ষিত এলাকার বিকাশ হয়েছিল। এসমস্ত হয়েছিল বায়ুচালিত কল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য, এবং গম চাষের অনুকরণের ফলে। এ সকল উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে দেশের সার্বিক উন্নতি। ১৯১১ সালে দেশগুলির

সংঘবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে নতুন রাজধানী গড়ে তুলার প্রকল্প ও নির্মাণ করা হয়। একটি নাম সিদ্ধান্ত আকারে প্রস্তাবিত হয়েছিল। উল উয়িট গোল্ড (Wool wheat gold) শেষপর্য্যন্ত কেমবেরা (Camberra) রাজধানীর নাম করণ হল কেমবেরা (Camberra) একটি দেশীয় শব্দ যার অর্থ জনসমাবেশের স্থান।

কিছু দেশীয় লোক সর্তসাপেক্ষ মোতাবেক ফার্মে কাজ করতে আরম্ভ করে। সর্তগুলি নিম্নমানের ছিল যার অনেকটাই ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে মিল ছিল। পরবর্তী সময়ে কেলিফোর্নিয়ায় অনেক চীনা শ্রমিক স্বল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে কাজে নিযুক্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের নিয়ে সমস্যা শুরু হওয়ার কারণ সরকার তাদের আগমনে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত জনমানসের মধ্যে রয়েছিল এটা ভেবে যে কৃষ্ণাঙ্গ লোকেরা যারা দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হতে আগত যার কারণে তাদেরকে সম্ভবত অষ্ট্রেলিয়া পাঠানো হতে পারে এটা অনেকটী সরকারী নীতি ছিল শেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ থেকে পৃথকী করনের জন্য।

কার্য্যক্রম - ৪
১৯১১ সালে ইহা ঘোষিত হয়েছিল যে নতুন দিল্লী এবং কেমবেরা (Camberra) তৈরি হবে রাজধানী শহর হিসেবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের এবং গণ মঙ্গল অষ্ট্রেলিয়ার তুলনা কর এবং রাজনৈতিক বাতাবরণ গুলির দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের সে সময় সে সকল দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করে।

পরিবতনের বাতাবরণ

১৯৬৮ সালে নৃতত্ববিদ ডাবলিউ-ই-হ ষ্টেনার (W.E.H. Stanner) তার ভাষনের দ্বারা জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করেন যার মূল বিষয় বস্তু ছিল তার লেখনী প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে এবং প্রকাশিত মতবাদ গুলির মাধ্যমে যা বিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ানদের নিরবতা ("The Greart Australean") নামক পুস্তকে প্রকাশিত যা ইতিহাসবীদদের আদি জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে নীরব ভূমিকার সাক্ষ্য পালন করে ছিল। ১৯৭০ সালে উত্তর আমেরিকায় দেশীয় লোকদের সম্পর্কে জানার কৌতুহল মুক্তি হয়েছিল যা নৃতত্বের উপর ভিত্তি না করে। জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, অদ্ভুত পদ্ধতির সাহায্যে তাদের প্রকৃতি ও আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা শৈলী মনোভাব তাদের তৈরি শিল্পকলা, রঙ্গিন চিত্র এবং খোদাই করা নির্মিত কৌশল থেকে সহজে অনুধারণ করা গিয়েছিল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রর্দশনের জন্য এবং তাদের সম্পর্কে নানা তথ্যের ও পুঞ্জীভূত করণ করার কাজ শুরু হয়েছিল। এ সমস্ত জরুরী সমীক্ষা পুঞ্জীভূত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যা পরবর্তী সময়ে হেনরী রেনল্ডস্ (Henry Reynolds) এর 'Why weren't we Told' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে এ ধরনের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বাতিল হয়েছিল তার কারণ ছিল 'কেপ্টেন কোক' এবং তার আবিষ্কার যা এক্ষেত্রে একটি নতুন দীগন্তের দোয়ার খোলে দেয়।

তখন হতে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সম্পর্কে আলোচনা ও পড়াশুনার জন্য নতুন বিভাগ খোলে যাতে করে লোক এসব আদি গোষ্ঠীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্প কলা এসম্বন্ধে জানতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এছিল একধরনের নতুন সংযোজন। সংগ্রহ শালার বৃদ্ধি করা হয় যাতে তাদের সম্পর্কিত বিষয় বস্তুগুলি সংগ্রহ শালায় পুঞ্জীভূত করা যায় যেমন - প্রাক্ঐতিহাসিক জন্তু জানোয়েরের নমুনা, এবং এগুলির উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের কল্পনা প্রস্তুত নমুনা তৈরি করা সম্ভব হয়ে উঠে এবং এই অভিনব পদ্ধতির সাহায্যে লোকদের সম্পর্কে নানা কথা, গল্প ও তাদের ইতিহাসকে ধরে রাখা সম্ভব হয়।

এজটিল পদ্ধতির অবতারনা করার মূল কারণ ছিল দেশীয় জনজাতিদের প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে মানব মনে তাদের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করার জন্য ও এসকল জাতিগোষ্ঠীগুলির ইতিহাসকে অবিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

১৯৭৪ সালে বহু সংস্কৃতিবাদ নীতি ছিল অন্যতম সরকারী পন্থা। অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত

জাতিগোষ্ঠী দেশীয় জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করার কারণে ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতি প্রয়াসে। কারণ তারা বেশির ভাগ ছিল অন্যান্য দেশ বা জনজাতির প্রজাতি অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে।

'Kathy my sister with the torn heart,
I don't know how to thank you
for your dreamtime stories of joy and grief
written on paper back.
You were one of the dark children
I wasn't allowed to play with –
River bank campers, the wrong colour
(I could not turn you white.)
So it was late. I met you,
late I began to know
They hadn't told me the land I loved
was taken out of your hands'.
'Two' Dreamtime written for oodgeroo Noonuccal.

যুধিত রাইট (Judeth wright)
(১৯১৫-২০০০)
অষ্ট্রেলিয়ার লেখক, যিনি অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি রচনা করছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ট ছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কবিতা লিখেছেন এবং শেতাঙ্গদেরকে কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে পৃথক করে রাখার উপর বেশি জোড় দেন।

১৯৭০ সাল থেকে ইউনাইটেড নেসন্স অর্গেনাইজেসন (UNO) ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলির আলোচ্য বিষয় ছিল "মানব অধিকার" নিরুৎসাহিত অষ্ট্রেলিয়ার লোকজন অনুভব করে যে এবং তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কেনেডা এবং নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এসব দেশে ও মহাদেশে ইউরোপীয়দের দ্বারা জমি অধিগ্রহণ করার ব্যাপারে দেশীয় লোকদের সাথে তাদের কোন ধরনের সম্বন্ধ বা চুক্তি হয়নি। রীতিসিদ্ধ কোন ধরনের সম্পর্ক তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে গড়ে উঠেনি। সরকার সব সময়ে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে "terra mullius" নামে অভিহিত করে। যার অর্থ হয় কারো জন্য নহে বা কারোর ভূমি নহে।

শিশুদের ইতিহাস ছিল মিশ্র কারণ তাদের উৎস থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা সম্ভব যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাথে মিশ্রণের ফলে তাদের উদ্ভব হয় এবং এভাবে তাদের সম্পর্কিত নিকট আত্মীয় থেকে তারা পৃথক হয়ে পড়ে। এগুলি নিয়ে নানা মতবাদ ও সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সর্বশেষে দুটি গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় — তাদেরকে অর্থাৎ আদিবাসীগণকে স্বীকৃতি দেওয়া কারণ তাদের একটি ইতিহাস রয়েছে এ ভূমিকে কেন্দ্র করে এবং তারা এভূমিকে 'পবিত্র স্থান' মনে করত। দ্বিতীয় তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার জন্য কারণ তাদের শিশুদের প্রতি অবিচার হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে শেতাঙ্গ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীদের বাদ দিয়ে শুধু তাদের জন্য এ ধরনের মনোভাব পোষণ করা হয়।

অনুশীলনী

উত্তর দাও

১। দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে পার্থক্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ইংরেজদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার মূল উপাদানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কত দূর প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

৩। আমেরিকানেরা 'সীমান্তবর্তী' অঞ্চল বলতে কি ধারণা করেছিল?

৪। অষ্ট্রেলিয়ান জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস এতকাল ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি কেন? আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৫। সংগ্রহশালাগুলিতে আদি জাতিগোষ্ঠী ও তাদের জনজীবনের কৃষ্টি সম্পর্কিত প্রদর্শনী গুলি ফুটিয়ে তুলতে তোমরা কতটুকু সক্ষম। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ শালার সম্পর্কে উদাহরণ দাও?

৬। কল্পনাকর কেলিফর্নিয়ার ১৮০০ শতাব্দীর ('Four people') চার দেশীয় জাতিগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার, পূর্ববর্তী আফ্রিকার ক্রীত দাস, চীনের শ্রমিক, এক জার্মান যিনি বাবিস্কৃত স্বর্ণ খনি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দেশীয় হপি (Hopi) অধিবাসী। তাদের কথোপকথন বর্ণনা কর।

প্রসঙ্গ ১১

আধুনিকতার বিভিন্ন দিশা

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব এশিয়াতে চীনের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। সেখানকার কুইং (Qing) বংশের একটি পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ছিল এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হত চীন একটি সুরক্ষিত শক্তিশালী রাজ্য। অন্য দিকে জাপান ছিল একটি ক্ষুদ্র এবং আপাত ভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ রাষ্ট্র। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই চীনে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং চীন ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবিলা করতে ও ব্যর্থ হয়। যেখানকার সাম্রাজ্যবাদী সরকার রাজনৈতিক কতৃত্ব হারিয়ে ফেলে; যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে সরকারের ব্যর্থতার ফলে দেশে একটি গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। অন্যদিকে জাপান নিজস্ব শিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলে একটি আধুনিক জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হল। তাইওয়ান (১৮৯৫) ও কোরিয়া (১৯১০) দখল করে জাপান তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও গড়ে তুলল। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সে এলাকার আদর্শ ও কৃষ্টির উৎস চীনকে এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তি রাশিয়াকে জাপান যুদ্ধে পরাজিত করে।

চীন আধুনিক যুগের উপযুক্ত হয়ে উঠবার জন্য তার পরম্পরাকে নতুন ভাবে সাজানোর উদ্যোগ নিলে এ পথে তাকে যথেষ্ট বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। চীনের লক্ষ্য ছিল জাতীয় শক্তিকে পূর্ণগঠিত করে জাপান ও পাশ্চাত্যের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করা। চীনদেশীয়দের ধারণা হল একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তারা সমস্ত অনৈক্য দূর করে দেশকে পূর্ণগঠিত করতে পারে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টী দেশে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭০ নাগাদ চীনদেশীয় নেতাদের মনে হল যে আদর্শগত বিভেদের ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য বিস্তৃত অর্থনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টীর শাসন কালেই চীন দেশে পুজিবাদ ফিরে আসে এবং খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করা হয়।

জাপান একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠলে ও সে দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণাম ছিল দুঃখজনক। জাপানকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির কাছে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অবশ্য আমেরিকা জাপান অধিকার করে একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। জাপানের অর্থ-নীতির পূর্ণগঠনের ফলে ১৯৭০ নাগাদ জাপান একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিগণিত হল।

পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকতা আধিপত্যের সময়ে জাপান পুজিবাদী নীতির পথ অবলম্বন করে। আধুনিকতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যের আধিপত্য খর্ব করে এশিয়াকে মুক্ত করাই ছিল জাপানের লক্ষ্য। তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য সমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি গ্রহণ করবার ক্ষমতা ও জাতীয়তাবোধ ছিল জাপানীদের অগ্রগতির মূল কারণ।

চীন ও জাপানের শাসকদের সামনে ইতিহাস পথনির্দেশিকার কাজ করত বলে এই দুই দেশে ঐতিহাসিক লিখনের দীর্ঘ পরম্পরা বজায় ছিল। অতীত ইতিহাসের আলোতে শাসকদের

যোগ্যতা যাচাই করা হত। আবার শাসকেরা নথি সংরক্ষণ করবার ও রাজ পরিবারের ইতিহাস লিখে রাখবার জন্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। সিমা কোয়ান ছিলেন প্রাচীন চীনের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ। সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে জাপানে ও ইতিহাসকে সমান ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তথ্য ও নথি সংগ্রহ করে মেজী বংশের পুণঃস্থাপনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য ১৮৬৯ খ্রিঃ মেজী সরকার একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার লিখিত তথ্য ও লিখন শৈলী সে সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। তার ফলে তখনকার অনেক লিখিত তথ্য সূত্র যেমন সরকারী নথি, পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনা, জনপ্রিয় সাহিত্য, ধর্মীয় লিখন ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রাক-আধুনিক যুগে মুদ্রণ ও প্রকাশনা ছিল একটি গুরুত্ব পূর্ণ শিল্প। ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন বা জাপানে প্রকাশিত একটি বই সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য অবগত হওয়া যায়। আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা এই পুরনো তথ্য গুলোকে নতুন ও ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যাদের লিখার উপর ভিত্তি করে চীন জাপানের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন জাপানের ইতিহাস নির্মাণের অগ্রদূত -- পণ্ডিত লিয়াং কুইচাও (১৮৩৯-১৯৩১)। তাছাড়া ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা (যেমন ইটালীর মার্কপোলো ১২৫৪-১৩২৪, চীনদেশে ১২৭৪-১২৯০) এবং ম্যাটাও রিকি (Mateo Ricci) ও লুই ফ্রয়েস (Louis Frois) নামক হেসুইট যাজকেরা যারা যথাক্রমে চীন ও জাপানে দীর্ঘদিন বাস করেছেন, তাদের বিবরণী থেকে ও চীন ও জাপান সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর খ্রিস্টান মিশনারীদের অবদান ও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

চীন সভ্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা ও জাপানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যথাক্রমে যোসেফ নিধাম এবং জর্জ স্যানসম বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। ইদানীং কালে চীনা ও জাপানী পণ্ডিতদের গবেষণা ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এ দুটো দেশ সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে এবং আমরা এখানকার সভ্যতা সম্পর্কে বহু তথ্য লাভ করেছি।

* জাপানে পদবী আগে লিখা হয়

নেইটো কোনান* (১৮৬৬-১৯৩৪)

নেইটো কোনান নামে একজন জাপানী পণ্ডিত চীনদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে চর্চা করেছেন। তার উদ্যোগে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কিয়েটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শিনারনে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বলেন যে সুং বংশের সময় থেকে (৯৬০-১২৪৯) চীন দেশে অভিজাতদের যে আধিপত্য এবং ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ ছিল তা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের আমলে ভেঙ্গে পড়ে। তার মতে চীনের ইতিহাসের মধ্যেই এ দেশের আধুনিকতা এবং গণতন্ত্রের উৎস ছিল। এছাড়া চীন দেশে জাপানের ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে কোনান চীনা জাতীয়তাবাদকে প্রাপ্য সম্মান দিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন।

ভূমিকা

চীন ও জাপানের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য ছিল। চীন একটি বিশাল দেশ যেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া বিভিন্ন ধরনের। দেশের কেন্দ্রভাগে তিনটি নদী বহমান — হোয়াং হো, ইয়াংলি এবং পার্ল নদী; এক বৃহৎ অঞ্চল হল পর্বত সংকুল।

মানচিত্র পূর্ব এশিয়া

দেশের মধ্যে প্রভাবশালী জাতি ছিল হান্-বা এবং প্রচলিত ভাষা ছিল চীনা ভাষা। অন্যান্য জাতিগুলো ছিল উইগার, হুই, মাঞ্চু এবং তিব্বতী। ক্যান্টনিজ এবং সাংহাইনিজ ছাড়া অন্যান্য ভাষা ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কথিত হত।

চীন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার প্রচলিত ছিল। সবচাইতে বেশি প্রচলিত ছিল দক্ষিণ ভাগের অর্থাৎ ক্যান্টন অঞ্চলের খাবার। উত্তর চীনে প্রধান খাদ্য ছিল গম। প্রাচীন যুগে রেশম পথ ধরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যে মশলা আনতেন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকেরা যে লঙ্কা আমদানী করতেন তার প্রভাব সিঝুয়ান অঞ্চলে ঝালস্বাদ যুক্ত খাবারের প্রচলন ছিল। পূর্ব চীনের লোকেরা ধান ও গম — দুজাতীয় খাবার খেতেই অভ্যস্ত ছিল।

অন্যদিকে দ্বীপমালার দেশ জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপ হচ্ছে হোনসু, কিরসু, শিককু এবং হোককাইডো। বাহামার সঙ্গে এক অক্ষরেখায় অবস্থিত অকিনাওয়ান দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান জাপানের দক্ষিণতম অংশে। মূল দ্বীপগুলোর ৫০ শতাংশের ও বেশি ভূখণ্ড পর্বতসংকুল এবং জাপানের অবস্থান একটি তীব্র ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে। দেশের ভৌগলিক অবস্থান এখানকার স্থাপত্যকে ও প্রভাবিত করেছে। জনসংখ্যার অধিকাংশই জাপানী, এছাড়া কিছু সংখ্যক আইনু ও কোরীয় লোক ও জাপানে বাস করে। যখন কোরিয়াতে জাপানের উপনিবেশ ছিল তখন এদের সেখান থেকে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসা হয়।

জাপান

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

জাপান কিয়টোতে অবস্থানরত একজন সম্রাট দ্বারা শাসিত হত। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ সম্রাটের আধিপত্য খর্ব হয়ে ক্ষমতা চলে যায় সোগানের (SHOGUN) হতে। সোগান সম্রাটের

নামে শাসন পরিচালনা করতেন। সমগ্র দেশ ২৫০ এর ও অধিক এলাকায় ভাগ করে প্রত্যেকটি এলাকা ডায়মিও (DAIMYO) বলে একজন শাসকের শাসনাধীন ছিল। এই ডায়মিওরা সম্পূর্ণভাবে সোগানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। কোনরকম সোগান বিরোধী কার্যকলাপে যাতে তারা লিপ্ত না হতে পারেন, সেজন্য তাদের রাজধানী এডো (Edo, আধুনিক Tokyo) তে থাকতে বাধ্য করা হত। সোগান গুরুত্বপূর্ণ নগর ও খনি গুলোও নিয়ন্ত্রণ করতেন। সামুরাই নামে যোদ্ধা শ্রেণি শাসনকার্যে যোগান ও ডায়মিওদের সাহায্য করত। ১৬০০ শতাব্দীর শেষভাগে তিন ধরনের পরিবর্তন ভবিষ্যত উন্নতির ধারাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথমত, কৃষক শ্রেণিকুলকে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছিল এবং শুধু সামুরাইরা তরোয়াল বহন করতে পারত। এই নিয়ম শান্তি ও শৃঙ্খলাকে নিশ্চিত করে পূর্ববর্তী শতাব্দীর ঘন-ঘন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয়ত ডায়মিওদের (Daimyo) আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানীতেই বসবাস করেন। তৃতীয় ভূমি জরিপ করে জমির প্রকৃত মালিকদেরে এবং করদাতাদেরে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলকে গুণগত মানের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাজন করে রাজস্বের পরিমাণ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।

ডায়মিওদের রাজধানী অনেক বৃহৎ হয়ে উঠার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুধু এডো (Edo) জাপানের একমাত্র জনবহুল নগরী ছিল না, অসাকা এবং কোয়োটো ও (Osaka and Kyoto) আরও দুটি বৃহৎ নগরী ছিল, এ ছাড়াও আরও দু'টি প্রাসাদ নগরীতে লোকসংখ্যা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) এর ও বেশি ছিল। (অপরপক্ষে, তৎকালীন অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলিতে মাত্র একটি বৃহৎ নগরী ছিল।) এভাবে জাপান বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং অর্থনৈতিক নীতি ও ঋণদান পদ্ধতি গড়ে তোলে। ব্যক্তিগত পদমর্যাদার চেয়ে এখানে প্রতিভাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছিল। নগর গুলিতে এক সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতির প্রস্ফুটন ঘটেছিল। দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত বণিক শ্রেণি দ্বারা নাটক কলাবিদ্যা ইত্যাদি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। লোকেরা বিদ্যাচর্চার প্রতি উৎসাহিত হওয়ায় প্রতিভাবান লেখকেরা একমাত্র লেখনীর মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পেরেছিলেন। এডোতে (Edo) লোকেরা এক বাটি নুডুলস্ (Noodles) এর মূল্যের বিধিময়ে একটি বই ভাড়া করতে পারত। এ থেকে পড়াশুনার জনপ্রিয়তা এবং মুদ্রণ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

জাপান নানা দেশ থেকে বিলাস সামগ্রী, যেমন চীন থেকে রেশম ও ভারত থেকে কাপড় আমদানী করত এই পটভূমিতে জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিবেচিত হত। সোনা ও রূপের বিনিময়ে এ ধরনের আমদানী দেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে টকুগোয়া (Tokugawa) এসব মূল্যবান ধাতুর রপ্তানির উপর বাধা আরোপ করেছিল। তারা আমদানীর পরিমাণ কমানোর জন্য কয়োটোর নিশিজিন অঞ্চলে (Nishijin in Kyoto) রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিশিজিনে উৎপন্ন রেশম ক্রমে পৃথিবীতে সর্বোৎকষ্ট রেশম হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল। অন্যান্য পরিবর্তন, যেমন মুদ্রার বহুল ব্যবহার এবং চালের বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি (Stock merket in rice) প্রমাণ করে যে নতুন উপায়ে জাপানের অর্থনীতির বিকাশ ঘটছিল।

সামাজিক ও বৌদ্ধিক পরিবর্তন, যেমন প্রাচীন জাপানি সাহিত্যের অধ্যয়ন জাপানের উপর চীনের প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগায়। তারা যুক্তি দেখায় যে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের বহু আগে থেকেই জাপানীরা সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ছিল। এ ধরনের প্রাচীন সাহিত্যে যেমন গেঞ্জীর কাহিনী (Tale of the Genji) এবং উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে জাপানের

*Printing was done with wood blocks. The Japanese did not like the regularity of European printing.

দ্বীপগুলি দেবতাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখানকার সম্রাট ছিলেন সৌরদেবীর উত্তরসূরী।

গেঞ্জীর কাহিনী

হিয়ান রাজসভার মুরাসাকি শিকিবু (Murasaki Shikibu) লিখিত একটি কল্পকাহিনী জাপানী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ সময়ে মুরাসাকির মতন আরও কয়েকজন মহিলা লেখিকার অভ্যুদয় হয়েছিল যারা জাপানী লিপি ব্যবহার করতেন। পুরুষেরা যে সময়ে চীনা লিপিতে লিখতেন। উল্লিখিত উপন্যাসে অঙ্কিত রাজপুত্র গেঞ্জির জীবন ধারার মাধ্যমে হিয়ান রাজসভার সম্ভ্রান্ত পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন যাত্রায় ও স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের যে স্বাধীনতা ছিল তার আভাস ও এই উপন্যাসে রয়েছে।

কিয়াটোর একটি এলাকা নিশিজিন। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে ৩১ টি পরিবার নিয়ে গঠিত একটি তাঁতী সংগঠন ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ৭০,০০০ তাঁতী এই গোষ্ঠীতে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। এখান থেকে রেশম শিল্পের বিস্তার হয় এবং এখানকার বিশেষত্ব ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের রেশমের কাপড়। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে একটি আঞ্চলিক উদ্যোগী শ্রেণি গড়ে ওঠে এবং তারা টোকগাওয়া শাসনকে প্রত্যাহ্বান জানায়। ১৮৫৯ তে যখন বিদেশী বাণিজ্য শুরু হয় তখন রেশম রপ্তানি করে জাপান যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে থাকে।

মেইজী বংশের পুণঃপ্রতিষ্ঠা ঃ

আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও বাণিজ্যিক চাহিদা রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে একই বিন্দুতে যুক্ত ছিল। ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৫৩ খ্রিঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কমোডোর ম্যাথিউ পেরীকে (Commodore Mattheupery) (১৭৯৪-১৮৫৮) (১৭৯৪ থেকে ১৮৫৪ খ্রিঃ পর্যন্ত) জাপানে প্রেরণ করে ছিল। ১৮৫৪ খ্রিঃ জাপান এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। আমেরিকা থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথের ধারে জাপানের অবস্থান। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে একটি লাভজনক বাজার হিসাবে গণ্য করেছিল।

এছাড়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে তিনি শিকারের জাহাজ গুলিতে পুণঃরায় জ্বালানী ভরার কেন্দ্র হিসাবে ও জাপানের গুরুত্ব ছিল। সে সময় পাশ্চাত্যের দেশগুলির মধ্যে এক মাত্র হল্যান্ডের সঙ্গেই জাপানের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

জাপানের রাজনীতিতে পেরীর আগমনের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল। জাপানের তৎকালীন সম্রাট সোগান যার রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন পর্যন্ত অত্যন্ত নগন্য ছিল তিনি সে সময় একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পুনঃরায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬৮ সনে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে বল প্রয়োগ করে সোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং সম্রাটকে এডো-কে (Edo) ক্ষমতাসীন করা হয়। এডো তে রাজধানী স্থাপন করে এর নতুন নামকরণ হয় টোকি ও (Tokyo) যার অর্থ হল প্রাচ্যের রাজধানী (Eastern Capital)

সরকারী কর্মচারী ও লোকেরা অবগত ছিল যে কিছু ইউরোপীয় দেশ ভারত ও অন্যান্য জায়গায় তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছে। ব্রিটেনের হাতে চীনের পরাজয়ের (২৪৪ পৃঃ দেখ) সংবাদ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল এমন কি জনপ্রিয় নাটক গুলিতে ও এই ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছিল। ফলে জাপানে ও একদিন উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারে বলে ভীতির সঞ্চার হয়। চীনদেশীয়রা ইউরোপীয় ভাবধারাকে এতদিন অবজ্ঞা করে এলে ও জাপানের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও এদেশের নেতারা এই নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করতে উৎসাহী ছিলেন। অন্য আরেকটি দল ইউরোপীয় প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণ করতে রাজী থাকলে ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহী ছিলেন না। কিছু সংখ্যক জাপানী ধীরে ধীরে এবং সীমিত ভাবে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন।

পেরীর জাহাজ ঃ একটি জাপানী চিত্র।

দেশী জাহাজের কাঠের জোর গুলোতে আলকাতরা ব্যবহার করা হত বলে জাপানীরা তাদের লিখার মধ্যে এগুলোকে কালো জাহাজ (Black Ships) বলে উল্লেখ করেছে। এই জাহাজের চিত্র বাইরের দেশের কাছে জাপানের দরজা খুলে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে। (সম্প্রতি পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেন যে জাপান বহু পূর্ব থেকেই পূর্ব এশিয়া বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে আসছে। তাছাড়া ডাচ ও চীনাদের মাধ্যমে বৃহত্তর জ্ঞানের জগতের সঙ্গে ও জাপানের যোগাযোগ ছিল।

ফুকোকু কোয় হেই ('Fukoku Kyo Hei') (ধনী দেশ শক্তিশালী সেনাবাহিনী) শ্লোগানটিকে অবলম্বন করে সরকার একটি নতুন নীতি গ্রহণ করে। তারা একটি উন্নত মানের অর্থনীতি ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল হয়তো একদিন তারা ও ভারতবর্ষের মতন ইউরোপের অধীনস্ত হয়ে পড়বে। নতুন নীতি কার্য্যকরী করতে হলে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা ও প্রজাদেরে সুনাগরিকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন ছিল। একই সময়ে নতুন সরকার 'সম্রাট পদ্ধতি' ('Emperor System') গঠন করার জন্য ও কাজ করছিল (জাপানী পন্ডিতরা এই শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করে ছিলেন যে আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্রাটে ও ছিলেন এই ব্যবস্থার (পদ্ধতির) একটি অংশবিশেষ। সরকারি কর্মচারিদেরে ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়েছিল যাতে এর উপর ভিত্তি করে তারা তাদের নিজেদের মত করে নমুনা তৈরি করে। সম্রাটের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা হবে কারণ তিনি সূর্য্যদেবীর প্রত্যক্ষ উত্ত রসূরী ছিলেন, কিন্তু তাঁকে পাশ্চাত্য-করনের নেতা হিসেবে ও দেখানো হয়েছিল। তাঁর জন্মদিন জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে গণ্য হয়েছিল, তিনি পাশ্চাত্যের ধারা অনুসারে সামরিক পোষাক পরেছিলেন এবং তাঁর নামে নির্দেশ জারী করে আধুনিক প্রতিষ্ঠান গুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৮৯০ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুশাসন জারীর মাধ্যমে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে, জনকল্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সাধারণ স্বার্থকে উন্নীত করতে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

Commodore Perry as seen by the Japanese.

১৮৭০ এর দশক হতে একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়। ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং ১৯১০ সাল নাগাদ শিক্ষা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা মাসুল ছিল নগন্য। পাঠ্যক্রম তৈরি হয়েছিল পাশ্চাত্যের আদর্শের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু ১৮৭০ এর দশকে যখন আধুনিক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তখন আনুগত্যের উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল এবং জাপানের ইতিহাস অধ্যয়নের উপর ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বইয়ের নির্বাচনের উপর এবং সাথে সাথে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। 'নৈতিক কৃষ্টি' শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে এবং মূল্য পাঠ্য বইগুলোতে পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে, দেশের প্রতি অনুগত থাকতে, এবং সুনাগরিক হয়ে উঠতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল।

কার্যক্রম - ১

ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে জাপানীদের ও আজটেকদের সংঘর্ষের তুলনা মূলক আলোচনা কর।

জাপানী লিপিঃ কানিজ (চীনা চিহ্নমালা লাল), কাটাকানা (নীল), হিরাগানা (সবুজ).

ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানীরা চীনাদের কাছ থেকে লিপি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছিল। যাহোক, যেহেতু জাপানী ভাষা চীনাভাষা থেকে অনেক পৃথক ছিল, এজন্য জাপানিরা দুটি স্বরধ্বনির বর্ণমালা — হিরাগানা এবং কাঠাকানা (Hiragana and Katakana) নামে প্রকাশ করেছিলেন। হিরাগানাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে ধরা হয়েছে কারণ এই স্বরধনির বর্ণমালাটি হিয়ান যুগে মুরাসাকির মতন অনেক লেখিকা ব্যবহার করেছিলেন। (Heian period) চীনা চিহ্নমালা এবং স্বরধ্বনির সংমিশ্রণে লিখিত এই ধারায় শব্দের মুখ্য অংশ লিখা হয়েছিল চিহ্নের সাহায্যে — উদাহারণ ও স্বরূপ 'going' শব্দটির মধ্যে 'go' কথাটি লিখা হবে চিহ্নের সাহায্যে এবং 'ing' হবে স্বরধ্বনির মাধ্যমে। অক্ষরের বদলে চিহ্ন ও স্বরধ্বনির ব্যবহার এই কথা বুঝায় যে জ্ঞান সমাজের সবচেয়ে উচুশ্রেণির লোকদের থেকে বৃহত্তর সমাজের নিকট তুলনা মূলক ভাবে দ্রুত বিস্তারলাভ করেছিল। ১৮৮০ র দশকে প্রস্তাবিত হয়েছিল যে জাপানীরা পুরোপুরি ভাবে তাদের স্বরধ্বনির সম্বলিত লিপি প্রকাশ করবে অথবা একটি ইউরোপীয় ভাষা গ্রহণ করবে। কিন্তু কোনটাই করা হয়নি।

জাতি ঐক্যবদ্ধ করে গঠন করার জন্য মেইজী (Meiji) সরকার পুরোশে গ্রাম এবং রাজ্যের সীমানা গুলির পরিবর্তনের সাহায্যে এক নতুন শাসন সংক্রান্ত কাঠামো জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। শাসনতান্ত্রিক সংগঠনের স্থানীয়, বিদ্যালয়গুলি ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধার্থে, এবং সাথে সাথে সৈন্য বাহিনীর নিযুক্তি কেন্দ্র গুলি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় রাজস্বের প্রয়োজন ছিল। কুড়ি বৎসরের অধিক বয়সের প্রতিটি লোকদেরে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেবামূলক কাজ করতে হত। একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর বিকাশ ঘটেছিল রাজনৈতিক দলগুলির গঠন প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করতে। জনসমাবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে এবং কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা আরোপ করার জন্য একটি আইনী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে সম্রাটের সরাসরি ক্ষমতার অধীনে রাখা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে একটি সংবিধান কার্যকারী হওয়ার পর ও এই দুইটি বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এ ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে গিয়ে সরকার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং একটি আধুনিক সেনাবাহিনীর মতাদর্শের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তার ফল ছিল সুদূর-প্রসারী। এলাকা দখলের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী চাপ সৃষ্টি করছিল। ফলশ্রুতি ছিল চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং উভয় ক্ষেত্রেই জাপান বিজয়ী হয়। বৃহত্তর গণতন্ত্র গঠনের জনপ্রিয় দাবী প্রায়ই সরকারের আগ্রাসন নীতিগুলোর বিরোধীতা করছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপান উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। অর্জিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য দেশের ভেতরে গণতন্ত্রের বিস্তারকে দমিয়ে রেখেছিল এবং জাপান ঔপনিবেশিকদের সাথে কলহে লিপ্ত হয়।

অর্থনীতির আধুনিকিকরণ

মেইজি যুগের সংস্কারগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অর্থনীতির আধুনিকিকরণ। কৃষিজাত দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করে তহবিলের আয় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। টোকিও ইয়োকোহামা বন্দরের মধ্যে জাপানের প্রথম রেললাইন নির্মিত হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি ইউরোপ থেকে আমদানি করা হয়েছিল এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষা দেবার জন্য ও সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলগুলিতে শিক্ষা দানের জন্য বিদেশী প্রযুক্তিবিদদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া জাপানী ছাত্রদের দেশের বাইরে ও শিক্ষা লাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক অর্থ

লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি (Banks) গড়ে ওঠে। মিতসুবিশি ও সুমিটমো (Mitsubishi and Sumitomo) কোম্পানিগুলোকে সরকারি অর্থসাহায্য এবং করদানের সুবিধার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল। জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য জাপানী জাহাজগুলির সাহায্যে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এ দুটো জাহাজ নির্মাণকারী সংস্থাকে সহায়তা দান করা হয়। জাইবাত্সু (Zaibatsu) (পৃথক পৃথক পরিবার গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠার সমূহ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর্য্যন্ত অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাতে সরকার প্রথমে হক্কাইদর উত্তরভাগের দ্বীপে (Northern island of Hokkaido) যেখানকার স্থানীয় লোকদেরে আইনু (Ainu) বলা হয়। এবং পরবর্তীকালে হাওয়াই ও ব্রাজিলের (Hawai and Brazil) সাথে সাথে জাপানের বেড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ও জনগণকে স্থানান্তরিত করতে উৎসাহিত করেছিল। শিল্পের উন্নতিকরণের ফলে জাপানের ভেতরেই শহরগুলির দিকে স্থান পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ জনসংখ্যার শতকরা ২১ ভাগ শহরগুলিতে বাস করত; ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে শতকরা ৩২ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল (২২.৫ মিলিয়ন)

শিল্পসংক্রান্ত শ্রমিকগণ ঃ

উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৮৭০ সনে ছিল ৭,০০,০০০। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে এ সংখ্যা বেড়ে মিলিয়নে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই পাঁচজনের ও কম লোকের সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করত এবং তারা কোন প্রকার যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করত না। আধুনিক কারখানাগুলিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে অর্ধেকের ও বেশি ছিল মহিলা এই মহিলা কর্মচারীরাই ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আধুনিক ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে লাগল কিন্তু একমাত্র ১৯৩০ দশকেই পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাকে অতিক্রম করেছিল।

ক্রমে কারখানাগুলির আয়তন ও বাড়তে লাগল। যে কারখানা গুলোতে একশোর ও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, তার সংখ্যা ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ছিল ১০০০। তারপর থেকে এ ধরনের কারখানার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ এ এর সংখ্যা দাড়ায় ২০০০ এ এবং ১৯৩০ -এ ৪০০০ এ। তাছাড়া ১৯৪০ সালে ও এমন ৫,৫০,০০০টি কর্মশালা ছিল যেখানে পাঁচজনের ও কম কর্মী শিশু ছিল। এর দ্বারা একটি পরিবার কেন্দ্রিক আদর্শ ধরে রাখা হয়েছিল। সম্রাট ছিলেন একজন পরিবার প্রধানের মত। তাঁর পরিচালনায় একটি পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদকে বহন করে চলেছিল।

কাপড় মিলে শ্রমিকরা

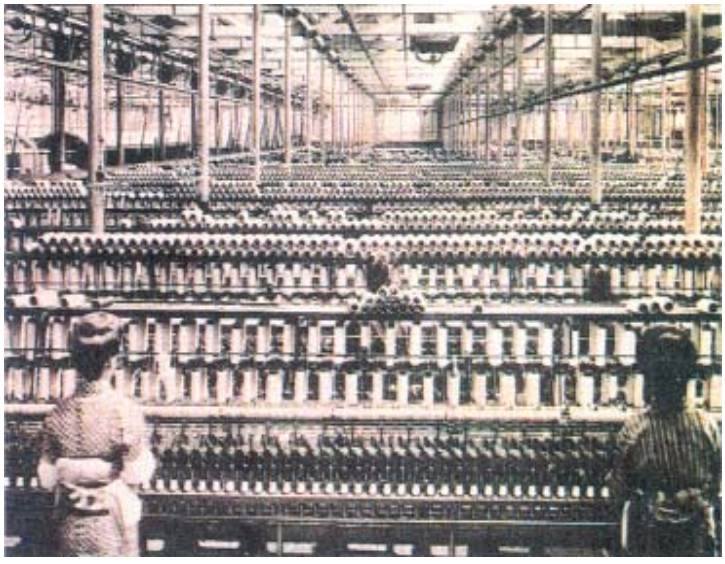

শিল্পের দ্রুত অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং কাঠের মত প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা পরিবেশগত ধ্বংসের পথ খুলে দেয়। প্রথম প্রতিনিধি সভার নির্বাচিত সদস্য তানাকা সুজো (Tanaka Shozo) শিল্পজাত দূষণের প্রতিবাদে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ৮০০ জন গ্রামবাসীকে নিয়ে প্রথম গণবিদ্রোহ ঘোষণা করে সরকারকে সঠিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য করেন।

একটি কাপড় কারখানায় শ্রমিকেরা কৃষক পরিবারের স্বশিক্ষিত পুত্র তানাকা সোজো (১৮৪১-১৯১৩) (Tanaka Shojo) একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৮০ এর দশকে সাংবিধানিক সরকার স্থাপনের দাবীতে যে আন্দোলন হয়, সেখানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম ডায়েটে ও তিনি নির্বাচিত হন। শিল্পের উন্নতির জন্য সাধারণ জনগণের যে বিড়ম্বনা, তিনি তার বিরোধিতা করতেন। আসি ও মাইন নামক একটি সংগঠন নদীর জল দূষিত করে কৃষির অবনতি ঘটায়। এর ফলে একহাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিরোধী আন্দোলন সংগঠনটিকে দূষণ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কৃষিজাত উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

অল্প বয়সীদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। ছাত্র-যোদ্ধাদের ছবি।

আক্রমণাত্বক জাতীয়তাবাদ

মেইজী (Meiji) সংবিধানের ভিত্তি ছিল সীমিত ভোটাধীকার। এ আসলে সৃষ্টি হয়েছিল সীমিত ক্ষমতা যুক্ত একটি ব্যবস্থাপক সভা (Diet জার্মাণীর আইনী আদর্শে প্রভাবিত হয়ে সংগঠনটির জার্মাণ নামকরণ করা হয়)। যে নেতারা সম্রাটকে পুণঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা যেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন, তেমনি রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জনপ্রিয়তার মাপকাটিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীগণ মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তার পরবর্তীকালে দলীয় সীমা অতিক্রম করে গঠিত মন্ত্রী সভাগুলো তাদের ক্ষমতা চ্যুত করে। সম্রাট ছিলেন সেনা বাহিনীর প্রধান এবং ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেনা বাহিনী এবং নৌবাহিনী স্বাধীন নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী আদেশ দিয়েছিলেন যে একমাত্র কর্মরত সেনাপতি ও নৌসেনাপতিরা মন্ত্রী হতে পারবেন। সেনাবাহিনীর এই শক্তি বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারে একটি অন্যতম কারণ ছিল। জাপান সর্বদাই পাশ্চাত্য শক্তি গুলোর দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করত। এই আশঙ্কার ফলে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবার ব্যাপারে কোন বিরোধিতা হয় নি। তাছাড়া এ বাবদে দেয় করের পরিমাণ ও বিনা বাঁধায় বৃদ্ধি করা হয়।

Yound people being exhorted to fight for the nation: a magazine cover. Student-soldiers: photograph

পাশ্চত্যকরণ ও ঐতিহ্য।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে বিভিন্ন প্রজন্মের জাপানী বুদ্ধিজীবীরা ভিন্ন মত পোষণ করতেন। কয়েক জনের মতে জাপানের লক্ষ্য ছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ গুলির মত সভ্যতার চরম শিখরে পৌছানো। ফুকুজাওয়া ইউকিচি, (Fukuzawa Yukichi) একজন শ্রেষ্ঠ মেইজি বুদ্ধিজীবি এভাবে মত প্রকাশ করলেন যে — জাপান তার এশীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে অতিক্রম করে পাশ্চাত্য সভ্যতার পথ অনুসরণ করে পাশ্চাত্যের অংশ হয়ে উঠবে।

ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi 1835-1901) একটি ধ্বংস প্রাপ্ত সামুরাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ফুকুজাওয়া নাগাসাকি ও ওসাকাতে প্রথমে ডাচ্ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬০ এ আমেরিকাতে প্রথম জাপানী দূতা - বাসে তাকে তর্জমাকারী হিসেবে পাঠানো হয়। এই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি সহজ ভাষায় পাশ্চাত্য সম্বন্ধে একটি বই রচনা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আজকের কিও বিশ্ববিদ্যালয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য গড়ে ওঠা একটি সংগঠনের তিনি একজন মূখ্য সদস্য ছিলেন।

তিনি জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে জাপানীদের সচেতন করেছিলেন। পাশ্চাত্যের কলকারখানা ও সংগঠনগুলোর প্রশংসা করবার পাশাপাশি তিনি সেখানকার সভ্যতার প্রতি ও অনুরক্ত ছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল এই সভ্যতার উপর ভিত্তি করে নতুন নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব। তার নীতি ছিল, 'স্বর্গ মানুষের উপর মানুষকে স্থান দেয় না, মানুষের নীচে ও মানুষের স্থান হয় না।'

সম্পূর্ণ ভাবে পাশ্চাত্য দেশীয় চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে পরবর্তী প্রজন্ম ভিন্ন মত পোষণ করত। তাদের মত ছিল যে দেশীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই দেশ ও জাতি গঠিত হবে। দার্শনিক মিয়াকে সেতুসুরেই (Miyake Setsurei) (১৮৬০ — ১৯৪৫) যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পৃথিবীর সভ্যতার স্বার্থ রক্ষার্থে প্রত্যেক জাতিকেই তার নিজস্ব গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। দেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ করা মানে পৃথিবীর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ করা। অপরপক্ষে অন্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পশ্চাত্যের উদারতার দিকে আকর্ষিত হয়েছিল। তারা জাপানকে সামরিক শক্তি হিসেবে নয়, গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মানুষের জন্মগত অধিকার ও সার্বভৌম অধিকার সংক্রান্ত যে নীতি ফরাসী বিপ্লবীরা প্রচার করেছিলেন, তার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন, জাপানের জনসাধারণের অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের নেতা ইউকি এমোরি। (Ueki Emori ১৮৫৭-১৮৯২) তিনি জাপানের জন্য সাংবিধানিক সরকারের দাবী তুলে ধরেন। এমোরি প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের জন্য এক উদার শিক্ষানীতি গ্রহণের ও দাবী জানান। স্বাধীনতা আদেশের চেয়ে অধিক মূল্যবান এই নীতি সমর্থন করে কয়েকজন নেতা এমন কি মহিলাদের ভোটাধিকারের পক্ষে ও যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এই চাপের ফলে সরকার একটি সংবিধান গঠন করতে বাধ্য হন।

দৈনন্দিন জীবন

আধুনিকতার পথে জাপানের অগ্রগতির প্রতিফলন এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থায় একই বাড়িতে পারিবারিক কর্তার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রজন্ম বসবাস করত। কিন্তু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে পারিবারিক নতুন ধারণাগুলো বিস্তারিত হতে লাগল। ক্রমে অণু পরিবার প্রথার সৃষ্টি হল যেখানে স্বামী ও স্ত্রী উপার্জনকারী এবং গৃহ ব্যবস্থাপক হিসেবে বাস করতেন। এই নতুন পারিবারিক, গঠনের ফলে নতুন ধরনের সাংসারিক সামগ্রী, পারিবারিক মনোরঞ্জনের সামগ্রী ও নতুন ধরনের বাসস্থানের

কয়েকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রঃ ভাত রান্না করবার যন্ত্র একটি আমেরিকান উনুন, একটি টোষ্টার।

চাহিদা সৃষ্টি হল। ১৯২০ এর দশকে নির্মাণ সংস্থাগুলো এককালীন ২০০ ইয়েনের প্রদানের বিনিময়ে কম মূল্যের বাসগৃহ নির্মাণ করতে লাগল। ক্রেতাকে দশ বছর ধরে প্রতি মাসে ১২ ইয়েন ঋণ বাবদ পরিশোধ করতে হত। এ সময়ে একজন উচ্চশিখিত ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মাসিক বেতন ছিল ৪০ ইয়েন।

Women's car-pool

CAR-CLUB

বিংশ শতাব্দীতে লিঙ্গ সমতা, বহু ঐতিহ্য ও উন্নত অর্থনীতির বিকাশ হয়। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি নতুন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মনোরঞ্জন ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষিত হয়। নগরীগুলোতে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীর চলাচল শুরু হয়, ১৮৭৮ এ মনোরঞ্জন কেন্দ্র ও আধুনিক বিপনি গড়ে ওঠে। ১৯২৫ এ প্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইবসেনের 'A Doll's House' নাটকে নোরার ভূমিকায় অভিনয় করে মাতসুই সুমাকো দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৯ এ চলচ্চিত্র নির্মাণে শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণ সংগঠন গড়ে ওঠে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনেক পুরনো পরম্পরা ও সামাজিক রাজনৈতিক রীতিনীতির ভিত টলে যায়।

আধুনিকতাকে অতিক্রম করা

১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে জাপান, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। এর ফলে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পালহারবার আক্রমণের পর যুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এ সময়ে একদিকে সমাজের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় ও বিরোধীদের নির্যাতন ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অন্য দিকে যুদ্ধকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে মহিলা সংগঠন সহ নানা দেশাত্মক বোধক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে 'আধুনিকতাকে অতিক্রম' করার উপর একটি প্রভাবশালী মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আধুনিকতার পথে এগিয়ে গিয়ে ও কিভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাব মুক্ত থাকা যায়, এ বিষয়ে সভায় যথেষ্ট আলোচনা করা হয়। একজন সঙ্গীতজ্ঞ, মোরই সাবুরো (Moroi Sabwro) প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে কিভাবে সঙ্গীতকে ইন্দ্রিয়াসক্ত উত্তেজনা থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ স্থাপন করা যায়। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে উপেক্ষা করেন নি। তিনি শুধু জাপানী সংগীতকে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র নির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। দার্শনিক নিশিতানি কেইজি (Nishitani Keiji) আধুনিক শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনটি ইউরোপীয় চিন্তাধারা, অর্থাৎ নবজাগরণ, প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উত্থানের সংমিশ্রণ বলে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছিল যে জাপানকে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলেন তার 'নৈতিক শক্তি' (Moral energy)। জার্মাণ দার্শনিক রেঙ্কের (Ranke) ব্যবহৃত শব্দ, এবং জাপানের কর্তব্য ছিল একটি বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া গঠন করে এক নতুন বিশ্বধারা গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান এবং ধর্ম চেতনাকে একত্রিত করে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কার্যক্রম - ২
নিশিতানির আধুনিকতার সংজ্ঞা কি তুমি সমর্থন কর?

পরাজয়ের পর ঃ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে জাপানের পুনরুত্থান

একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার যে চেষ্টা জাপান করেছিল তার সমাপ্তি ঘটে মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পরাজয়ের পর। একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আনোবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)। কিন্তু অন্যরা মনে করে যে এর ফলে অনাবশ্যক ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় তাতে (১৯৪৫ — ১৯৪৭) জাপানকে সামরিক শক্তি চ্যুত করা হয়েছিল এবং এখানে একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের ৯ নং অনুচ্ছেদে, তথাকথিত 'যুদ্ধ নয় ধারা' 'No War Clame' রাষ্ট্রনীতির যন্ত্র হিসেবে যুদ্ধকে প্রত্যাহার করেছিল। কৃষি সংস্কার ও শ্রমিক সংস্থাগুলোর পূর্ণ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া জাইবাৎসু (Zaibatsu) অর্থাৎ জাপানের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার নীতি গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিকে পুনরুজ্জিবীত করা হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালে প্রথম যুদ্ধোত্তর নির্বাচনে মহিলারা প্রথম তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বংশী পরাজয়ের পর জাপানী অর্থনীতির দ্রুত পূর্ণ গঠনকে একটি 'যুদ্ধোত্তর অলৌকিক ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়। জাপানের এ সাফল্যের মূল প্রার্থিত ছিল। এদেশের দীর্ঘ ইতিহাসে এ সময়ে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হলে ও, রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণের সীমা বিস্তৃত করবার ব্যাপারে জাপানীদের একটি গণসংগ্রাম ও বৌদ্ধিক চর্চ্চার ঐতিহাসিক পরম্পরা অতীত থেকেই বজায় ছিল। সরকার আমলাতন্ত্র ও শিল্পের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করবার জন্য যুদ্ধ পরর্বতী সময়ে সামাজিক সংযোগকে শক্তিশালী করা হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সাথে সাথে কোরিয়ান ও ভিয়েত্নামী যুদ্ধোগুলো থেকে সৃষ্ট চাহিদা জাপানের অর্থনীতিকে পূর্ণ গঠিত হতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও পরে টোকিও

১৯৬৪ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক খেলা জাপানের অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। ঠিক একইভাবে অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন রেলগাড়ী শিন্কানসেন বা বুলেট ট্রেইন চলাচল (Shinkansen বা bullet trains) শুরু হয়েছিল ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে যার প্রতি ঘণ্টায় গতিবেগ ছিল ২০০ মাইল (বর্তমানে ইহার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সস্তা ও উত্তম মানের বস্তু নির্মাণে জাপানীরা যে সমর্থ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ বহন করছে এই দ্রুত গতি সম্পন্ন যানটি। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর শিল্পয়নের কু-প্রভাব গুলো ক্রমশ ঃ প্রকট হয়ে উঠল। এর ফলে ১৯৬০ এর দশকে শিল্পায়নের বিরোধিতা করে নানা সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠল। কুপ্রভাবের প্রথম সংকেত বহন করে ক্যাডমিয়াম জনিত বিষক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি কষ্টকর রোগগুলো। পরবর্তীতে ১৯৬০ এর দশকে মিনামাটা অঞ্চলে পারদ জনিত বিষক্রিয়া ও ১৯৭০

এর দশকে বায়ুদূষণ জনিত নানা ধরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সমস্যা গুলোকে চিহ্নিত করে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য তৃণমূলস্তর থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। সরকারী পদক্ষেপ ও নতুন আইনী ব্যবস্থার ফলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। ১৯৮০ এর দশক থেকে জাপান সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছিল। আজ উন্নত জাপান তার রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতার সাহায্যে পৃথিবীর একটি প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

চীন

কীভাবে সার্বভৌমত্ব পুণরায় অর্জন করা যায়, কীভাবে বিদেশীদের অপমানজনক আগ্রাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং কীভাবে সমতা ও উন্নতির পথকে প্রশস্ত করা যায় — এ প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করেই চীনের আধুনিক ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। তিন ধরনের মতামতের উপর ভিত্তি করে চীন দেশের যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রথমতঃ প্রত্যাহ্বান মোকাবিলায় Kang youwei (১৮৫৮-১৯২৭) বা Liang Qichao (১৮৭৩-১৯২৯) এর মত প্রাচীন সমাজ সংস্কারকরা মূলতঃ চিরাচরিত ধারণা বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি Sun Yat-Sen এর মত প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী বিপ্লবীরা জাপান এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের ভাবধারা থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ, চীনের কম্যুনিষ্ট দল দীর্ঘদিনের অসাম্যের সমাপ্তি ঘটাতে এবং বিদেশীদের বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই আধুনিক চীনের সূচনা বলে ধরে নেওয়া যায়। সে সময় খ্রিস্টান সংঘ প্রচারকরা জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অংকশাস্ত্রের মত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন। এসবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সীমিত হলেও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া আলাদা মাত্রা পেয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আফিম বা অপিয়াম (Opium) ব্যবসার বিস্তার লাভ করার জন্য ব্রিটেন বল প্রয়োগ করতে শুরু করল। এর ফলশ্রুতিতেই প্রথম আফিম যুদ্ধ বা Opium War (১৮৩৯-১৮৪২) -এর সূত্রপাত ঘটল। এতে Qing বংশের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটতে শুরু হল এবং একই সঙ্গে সংস্কার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে চাহিদাগুলোকে আরও জোরদার করা হল।

আফিম যুদ্ধের চিত্র

আফিম বাণিজ্য

চীনে উৎপাদিত চা, রেশম পোর্সেলিন ইত্যাদির চাহিদা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা ক্ষেত্রে একটি অসম পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। পাশ্চাত্যে উৎপাদিত জিনিষের কোন চাহিদা চীনে ছিল না। ফলে চীন রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে পশ্চিমের জিনিষ ক্রয় করত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসময়ে ভারতবর্ষ থেকে আফিম নিয়ে চীনে বিক্রি করতে শুরু করল। লাভের অংশ দিয়ে তারা চীন থেকে চা, রেশম ও পোর্সেলিন কিনে, তা ইংল্যণ্ডে বিক্রী করত। এভাবে চীন, ভারতবর্ষ ও ইংল্যণ্ডের মধ্যে 'ত্রিমুখী বাণিজ্য' গড়ে উঠল।

কার্যক্রম - ৩
উপরের চিত্রটি আফিম যুদ্ধের তাৎপর্য সম্বন্ধে তোমাকে কি কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে?

Kang Youwei, Liang Qichao প্রমুখ Qing বংশের সংস্কারকরা নিয়ম-নীতি গুলোকে আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আধুনিক শাসন ব্যবস্থা, নতুন সেনাবাহিনী, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন এবং সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় পরিষদ (Local Assembly) গঠন করেছিলেন। চীনকে ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেছিলেন। উপনিবেশে পরিবর্তিত বিভিন্ন দেশের অন্ধকার দিকগুলো চীনের চিন্তাবিদদের মনকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ডের বিভাজন একটি বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে 'To Poland us' (bolan wo) কথাটি ক্রিয়াপদের একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষও ছিল এরকম আরেকটি দৃষ্টান্ত। চিন্তাবিদ Liang Qichao বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হলে চীনের জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, ভারতের মত একটি দেশ 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বহিরাগত শক্তি দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয়দের সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন যে, তারা নিজেদের জনসাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ব্রিটিশদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর এই যুক্তি চীনের সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল কারণ তারা লক্ষ্য করল যে, ব্রিটিশরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদেরই ব্যবহার করেছিল।

সর্বোপরি, চিরাচরিত চিন্তাধারার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তখন অনেকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেন। দার্শনিক কনফ্যুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯ খ্রিঃ পূক্ত) -এর মতবাদের মূল বিষয়ই ছিল সদাচরণ,

প্রকৃত ব্যবহারিক জ্ঞান এবং সঠিক সামাজিক সম্পর্ক। তাঁর মতাদর্শ চীনের নাগরিকদের জীবন সম্পর্কে ধারণাকে প্রভাবিত করে। তার ফলে একটি সামাজিক মাপকাঠি গড়ে ওঠে ও রাজনৈতিক নীতি ও সংগঠনেরও ভিত্তি তৈরি হয়। কনফ্যুসিয়াসের মতবাদ নতুন ধারণা গ্রহণ করবার ও নতুন সংগঠন গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে।

জনসাধারণকে আধুনিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হল জাপান, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে। অধ্যয়নপর্ব সমাপ্ত করে ছাত্ররা শুধু নতুন চিন্তাধারা নিয়েই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেনি; তাদের মধ্যে অনেকেই নেতৃস্থানীয় প্রজাতন্ত্রবাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমন কি, ন্যায়বিচার (Justice), অধিকার (Right), বিপ্লব (Revolution) ইত্যাদি বিভিন্ন ইউরোপীয় শব্দের জাপানী অনুবাদও চীনারা জাপান থেকে ধার করেছিল, কারণ তারাও চিত্রগত বা চিত্রার্পিত (Ideographic) লিপি ব্যবহার করত।

চীন দেশে শতাব্দী-প্রাচীন যে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাতে পরীক্ষার্থীরা পরবর্তী জীবনে অভিজাত শাসক শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেত ; কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের (যে যুদ্ধ চীনের ভূখণ্ডে সংঘটিত হয়) অব্যবহিত পরই সেই পরীক্ষা পদ্ধতির পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমেই অভিজাত শাসকবর্গের সৃষ্টি হত (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর সংখ্যা প্রায় ১·১ মিলিয়ন)। পরীক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে বিশুদ্ধ চীনা ভাষায় অষ্টপদী রচনা লেখতে হত। বিভিন্ন স্তরে প্রতি তিন বছরে দুবার পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। সাধারণতঃ চব্বিশ বছর বয়স সীমার মধ্যে অনুমতি প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা মাত্র এক বা দুশতাংশ ছাত্র প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় পাশ করত। তাদেরকে 'সেরা প্রতিভা' (Beautiful talent) হিসেবে গণ্য করা হত। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন ও এক সময়ে সমগ্র দেশে প্রায় ৫২৬৮ ৬৯ জন অসামরিক এবং ২১২৩৩০ জন সামরিক বিভাগে ডিগ্রীধারী ব্যক্তি ছিল বলে জানা যায়। যেহেতু চাকুরি ক্ষেত্রে মাত্র ২৭০০০ পদই সুনির্দিষ্ট ছিল, তাই নিম্ন পর্য্যায়ের ডিগ্রীধারীদের কর্মসংস্থান ছিল না। শুধুমাত্র সাহিত্যে দক্ষতাই পরীক্ষার মাপকাঠি ছিল বলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হত। যেহেতু আধুনিক বিশ্বে এধরনের পরীক্ষার কোন প্রাসঙ্গিকতা ছিল না, তাই উপরোক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটানো হল।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

ডাঃ সান ইয়াত-সেন (১৮৬৬-১৯২৫) কে আধুনিক চীনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। মানচু (Manchu) সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সান ইয়াত-সেন এর নেতৃত্বে চীনদেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। মিশনারি স্কুলে পড়াশোনার সময় গণতন্ত্র এবং খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। মেডিসিন বা চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁর পাঠ্যবিষয় হলেও চীনদেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণেও তিনি খুব উদগ্রীব ছিলেন। তাঁর কার্যসূচিকে 'তিন নীতি' (সান্ মিন্ চুই) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। প্রথমতঃ মানচু এবং অন্যান্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাতের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়তঃ সম্পদ ও জমির সমবণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজতন্ত্রের স্থাপনা।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতা বজায় রইল। যুদ্ধোত্তর শান্তি কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে তারিখে বেজিংয়ে ধর্না কার্যসূচি পালন করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটেনের নেতৃত্বে বিজয়ী মিত্র শক্তির জোট বন্ধনে থাকলেও চীন তাদের দেশের দখলি কৃত জমি ফিরে পায়নি। চারিদিকে তাই প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হল এবং আধুনিক বিজ্ঞান, গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করে 'চীন বাঁচাও' আহ্বান জানানো হল। চীনের সম্পদকে বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করা এবং অসাম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিদেশীদের উৎখাত করার বৈপ্লবিক আহ্বান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সহজ ভাষার ব্যবহার, পা-য়ের বন্ধন মুক্তি, মহিলাদের প্রতি দমননীতির বিলুপ্তি সাধন, বিবাহের ক্ষেত্রে সমান অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দরিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি ছিল আন্দোলনের কার্যসূচি। উক্ত প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশে এক বিরক্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে, দেশের স্থিরতা ও স্থায়িত্ব এবং ঐক্য সুনিশ্চিত করতে জেগে উঠল Kuomintang (জাতীয়বাদী গণতান্ত্রিক দল) এবং CCP অর্থাৎ চীনের কম্যুনিষ্ট দল। ডাঃ সান ইয়াত সেন-এর নীতি উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল Kuomintang দলের রাজনৈতিক দর্শন বা আদর্শ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং যোগাযোগ — এই চারটি জিনিসকেই মৌলিক চাহিদা বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সান ইয়াত সেন এর মৃত্যুর পর চিয়াং কাই শেক (Chiang Kai Shek) উক্ত দলের নেতৃত্বে আসীন হন। সেনাপতি (Warlords), বলপূর্বক ক্ষমত দখলকারী আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এবং কম্যুনিষ্টদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তিনি সামরিক অভিযান আরম্ভ করেন। যদি ও তিনি কনফ্যুসিয়াসের ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদের নীতিকে সমর্থন করেছিলেন, তথাপি একই সঙ্গে দেশ শাসনে সামরিক শক্তিকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। তার মতে জনগণকে একবিধ এবং অভিন্ন আচরণের অভ্যাস করতে হবে। নারীজাতিকে সতীত্ব, শারীরিক গঠন, বাক্যালাপের কায়দা এবং কাজ করার মানসিকতা — এই চর্তুগুণের অনুশীলনের জন্য তিনি উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমন কি, নারীদের পরিধেয় বস্ত্র প্রান্তের দৈর্ঘ ও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

Kuomintang এর সামাজিক ভিত্তি শুধু শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পের উন্নয়নের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাংহাই এবং অন্যান্য উন্নত শহরগুলোতে প্রায় পাঁচ লক্ষের মত শিল্পকর্মী ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিক জাহাজ নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্পকর্মে নিযুক্তি পেয়েছিল। অন্যান্যরা চলে গিয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে। শহরে শ্রমিক, বিশেষতঃ মহিলা শ্রমিকদের কাজের পরিধি বেশি হলেও পারিশ্রমিক ছিল অত্যন্ত কম। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের অধিকারের বিষয়ও আলোচনায় স্থান পেতে আরম্ভ করল। প্রেম, ভালোবাসা ও পরিবার গঠনের কথাও বিচার্য বিষয় হয়ে উঠল।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির প্রসারের ফলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হল পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়। ধীরে ধীরে সাংবাদিকতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন চিন্তাধারার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। Zao Taofen (১৮৯৫-১৯৪৪) সম্পাদিত Life weekly নামক জনপ্রিয় সংবাদপত্র সংবাদ জগতে এক নতুন গতির সঞ্চার করেছিল। পত্রিকাটি ভারতের মহাত্মা গান্ধী এবং তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মত নেতাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে দুহাজার কপি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে দুলক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল।

কার্যক্রম - ৪
বৈষম্য কীভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করে?

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের সাংহাই ঃ- চীনের সাংহাই শহরে বাক ক্লেটন (Buck Clayton) নামে এক আমেরিকান নিগ্রো তুরীবাদক ছিল। সে তার গানের দল নিয়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত এক দেশত্যাগীর মত জীবন কাটাত। যে হোটেলে তারা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করত সেখান থেকে একদিন কিছু শ্বেতকায় আমেরিকান ক্লেটন এবং তার গায়ক দলকে ধাক্কা দিয়ে বের করেছিল। সে নিজে একজন আমেরিকান হয়ে ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল বলে চীনের জনগণের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতি সে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের যুদ্ধজয়ের পর সে লিখেছিল, "The chinese onlookers treated us like we had done something they always wanted to do and followed us like a winning football team". চীনদের দারিদ্র্য এবং কঠিন জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে ক্লেটন লিখেছিল, "I would see sometimes twenty or thirty coolies pulling a big heavy cart that in America would be pulled by a truck or horses. These people seemed to be nothing but human horses and all they would get at the end of the day was just enough to get a couple of bowls of rice and a place to sleep. I don't know how they did it".

'Rickshaw Puller', woodcut by Lan Jia. The novel Rickshaw b Lao She (1936) became a classic.

Kuomintang দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে; কিন্তু সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি এবং সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সান ইয়াত সেন্ এর মুখ্য কার্যসূচির মধ্যে ছিল সম্পদের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমির সমবণ্টন; কিন্তু কৃষকদের প্রতি অবহেলা এবং সামাজিক অসাম্যের প্রতি নজর না রাখায় উক্ত কার্যসূচি ব্যর্থ হয়। সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধানের পথে না গিয়ে দল সামরিক আদেশ চাপানোর চেষ্টা করল।

The story of rising prices.

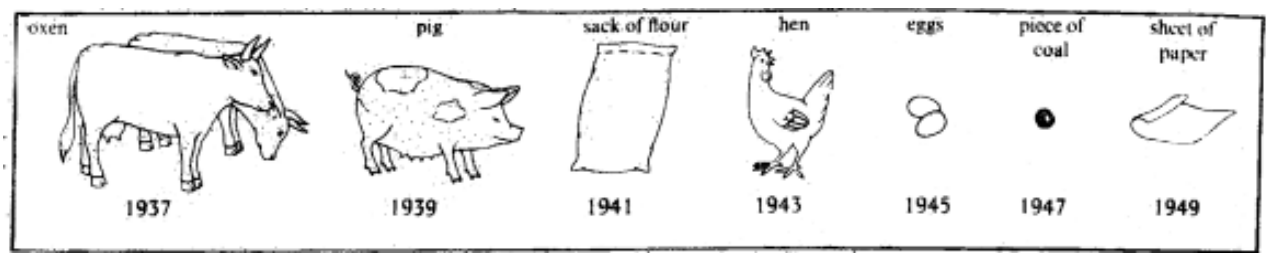

ঘটনাবলীর নির্ঘন্ট / ঘটনাবলীর সারণী

	জাপান		চীন
১৬০৩	Takugawa leyasu কর্তৃক Edo Shogunate এর প্রতিষ্ঠা।	১৬৪৪-১৯১১	Qing রাজবংশ।
১৬৩০	শুধুমাত্র ডাচদের সঙ্গে সীমিত ব্যবসায়ীক সম্পর্ক ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে জাপান সম্পর্ক ছিন্ন করে।	১৮৩৯-১৮৬০	দুটো আফিম (Opium) যুদ্ধ।
১৮৫৪	জাপানের অবরুদ্ধ যুগের সমাপ্তি ঘটিয়ে জাপান	—	—
	ও আমেরিকা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে।		
১৮৬৮	মেইজি (Meiji) বংশের পুণঃপ্রতিষ্ঠা।	—	—
১৮৭২	বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা এবং টকি ও ইয়কোহামার মধ্যে প্রথম রেললাইন।	—	—
১৮৮৯	মেইজি (Meiji) সংবিধানের বিধিবদ্ধকরণ।	—	—
১৮৯৪-৯৫	চীন - জাপান যুদ্ধ।		
১৯০৪-০৫	জাপান-রাশিয়া যুদ্ধ।	—	—
১৯১০	কোরিয়ার সংযুক্তি এবং ১৯৪৫ পর্যন্ত উপনিবেশের অধীন।	১৯১২	সান ইয়াত সেন্ কর্তৃক Kuomintang দলের প্রতিষ্ঠা।
১৯১৪-১৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	১৯১৯	চতুর্থ মে (May Fourth) আন্দোলন
১৯২৫	আন্তর্জাতিক ভাবে পুরুষদের ভোটাধিকার।	১৯২১	চীনের কম্যুনিষ্ট পাটির (CCP) প্রতিষ্ঠা।
১৯৩১	জাপানের চীন আক্রমণ	১৯২৬-১৯৪৯	চীনে গৃহযুদ্ধ।
১৯৪১-৪৫	প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ	১৯৩৪	দীর্ঘ পথ পরিক্রমা (Long March)
১৯৪৫	হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ	—	—
১৯৪৬-৫২	সামরিক অবস্থার সমাপ্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাপানের যুক্তরাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলে সংস্কার সাধন।	১৯৪৯	গণ প্রজাতন্ত্রী চীন। তাইওয়ানে চিয়াং-কাই-শেক কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা।
১৯৫৬	রাষ্ট্র সংঘের সদস্য হিসেবে জাপানের অন্তর্ভুক্তি	১৯৬২	সীমা সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে চীনের ভারত আক্রমণ।
১৯৬৪	টকিও তে অলিম্পিক ক্রীড়া (এশিয়ায় প্রথম)।	১৯৬৬	সাংস্কৃতিক বিপ্লব
		১৯৭৬	মাও-সে তুং ও চৌ-এন-লাইয়ের র্তৃক চীনকে হংকং প্রত্যর্পণ।

চীনে কম্যুনিষ্ট দলের অভ্যুত্থান

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন জাপান চীন আক্রমণ করে তখন চীনের Kuomintang পশ্চাদ্‌গমন করে। দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ফলে চীন দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিমাসে ত্রিশ শতাংশ হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ জনগণের জীবন প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের অবক্ষয়, বন্যা, পরিবেশ জনিত সমস্যা; অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক সমস্যা, শোষণ মূলক জমি জবর দখল প্রক্রিয়া, ঋণগ্রস্ততা, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অবনতি, ত্রুটি পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা চীনের গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরই ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে চীনের কম্যুনিষ্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়। রাশিয়ার সাফল্য বিশ্বজুড়ে এক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে লেনিন ও ট্রট্স্কির মত নেতৃবৃন্দ 'Comintern' বা 'Third International' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সবরকমের শোষণ দূর করার লক্ষ্যে এক 'বিশ্ব সরকার' গড়তে এগিয়ে এলেন। Comintern এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর সমস্ত কম্যুনিষ্ট দলকে সমর্থন জানাতে শুরু করল; কিন্তু তাদের কার্যপদ্ধতি ছিল পরম্পরাগত মার্কসবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের বিশ্বাস ছিল শহরের শ্রমিক শ্রেণী থেকেই বিপ্লব সৃষ্টি হবে। জাতীয় পর্যায়ে এর প্রাথমিক প্রভাব খুব বেশি হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা শুধু সোভিয়েতের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হওয়ায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দেই এর পরিসমাপ্তি ঘটল। কৃষি ভিত্তিক বিপ্লবের কার্যসূচি হাতে নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন এক মহান কম্যুনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং (১৮৯৩-১৯৭৬)। তাঁর নেতৃত্বে চীনের কম্যুনিষ্ট দল এক বিরাট রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল। Kuomintang এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্য উক্ত দলের কর্মীরা ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে শিবির গড়ে তুলেছিল। রাজকোষ অধিগ্রহণ এবং জমির পুর্ণবন্টনের মাধ্যমে গড়ে উঠল একটি শক্তিশালী কৃষকসভা (Peasants' Council) অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থেকে একটু পৃথক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে মাও-সে-তুং একটি স্বাধীন সরকার ও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। নারী সমাজের সমস্যাবলীর বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে নারী সমিতি গঠনের সমর্থন করে নতুন বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন; এছাড়াও বিবাহ চুক্তির ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে বিবাহ বিচ্ছেদের **নিয়ম-নীতি অপেক্ষাকৃত সহজ করেন।**

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ-দমন হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য মাও-সে-তুং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জুনউ (Xunwu) তে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য যেমন লবণ, সয়াবিন ইত্যাদি এবং স্থানীয় সংগঠন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর, গণিকা, ধর্মীয় সংগঠন গুলোর ক্ষমতা প্রভৃতির উপর এক নিরীক্ষা চালান। কতজন কৃষক তাদের সন্তান বিক্রী করে কত উপার্জন করল - এ তথ্য সংগ্রহ করে তিনি লক্ষ্য করলেন যে ১০০ থেকে ২০০ ইয়ান (Yuan) মুদ্রায় প্রতিটি সন্তানকে বিক্রী করা হয়েছে; কিন্তু কন্যা সন্তান বিক্রয়ের কোন ঘটনা নেই। কারণ যৌন শোষণ নয়, আসলে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ভিত্তিক কাজের প্রয়োজনেই পুত্র সন্তানদের বিক্রী করা হত। উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তিনি সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় বের করা চেষ্টা করেন।

জাতীয়তাবাদী সরকার কমিউনিষ্টদের উৎখাত করার চেষ্টা করলে কমিউনিষ্টরা গ্রামাঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধি করে। চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করতে উদ্যত হলে মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে শুরু হয় ইতিহাসখ্যাত লং মার্চ্চ। ৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে কমিউনিস্টরা ইয়ানানে তাদের নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলে। এখানে তারা জমি বণ্টন ব্যবস্থা পুণর্গঠন করতে ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে সচেষ্ট হয়। যুদ্ধকালীন কঠিন সময়ে কমিউনিস্ট দল ও ক্যুমিন্টাং সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদ প্রতি হত করে। তবে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্টরা ক্যুমিন্টাং দলকে পর্যুদস্ত করে চীনে গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে।

মানচিত্র ২: দীর্ঘ পথ পরিক্রমা

সেনাবাহিনীর দীর্ঘ পথ পরিক্রমার চিত্র

নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৪৯-৬৫

শ্রমজীবীদের একনায়ক তন্ত্র বা 'Dictatorship of the proletariat' শব্দবন্ধ কাল মার্কস্ প্রথম ব্যবহার করেন। এর সাহায্যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীই সম্পদশালী শোষক সরকারকে উচ্ছেদ করে বৈপ্লবিক সরকার গঠন করতে সক্ষম যা মোটেই প্রচলিত এক নায়কতন্ত্রের মত নয়।

চীনে গণ প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। সমাজের সর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে নতুন গণতন্ত্রের নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল সে সরকার; শ্রমজীবীদের একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship of the proletariat) উপর ভিত্তি করে নয়। অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্রমশঃ লুপ্ত হল। এই কর্মসূচী ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; এরপর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কার্যসূচি সরকার ঘোষণা করল। 'The Great Leap Forward' আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। দেশে উন্নত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন শুরু হয়। বাড়ির পেছনে খালি অঙ্গনে মানুষ

*This term was used by Karl Marx to stress that the working class would replace the repressive government of the propertied class with a revolutionary government and not a dictatorship in the current sense.

অগ্নিকুণ্ড (Furnace) নির্মাণ করতে উৎসাহী হল। গ্রামাঞ্চলে যৌথ মালিকানায় চাষ বাস করার জন্য 'কমিউন' (Commune) গড়ে উঠল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এরকম ছাব্বিশ হাজার কমিউন গড়ে উঠেছিল যার সদস্যদের মধ্যে ৯৮ শতাংশই ছিল কৃষিকার্যে কর্মরত জনগণ। নির্ধারিত লক্ষ্যে দলকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মাও-সে-তুং সাধারণ জনগণকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক (সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী) মানুষ সৃষ্টি করা যার পিতৃভূমি, জনগণ, শ্রম, বিজ্ঞান এবং সরকারি সম্পত্তির প্রতি থাকবে অসীম ভালবাসা। মহিলা, শিক্ষার্থী, কৃষক এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগণের জন্য নানা রকমের সংগঠন সৃষ্টি করা হল। সারা চীন গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন এবং সারা চীন ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৬ এবং ৩·২৯ মিলিয়ন। কিন্তু এসব উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি দলের অনেক সদস্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শিল্প সংগঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আরো বেশি মনযোগ দেওয়ার জন্য তারা আবেদন জানালেন। কমিউন পদ্ধতিতে আরেকটু পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলেন লিউ সাওচি (Liu Saochi) এবং দেং জিয়াওপিং (Deng Xiaoping)। অগ্নিকুণ্ডে যে ইস্পাত তৈরি হল তা কোন শিল্পে ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়নি।

দৃষ্টি ভঙ্গির পারস্পরিক সংঘর্ষ ১৯৬৫-৭৮

'সমাজতান্ত্রিক মানুষ' (Socialist Man) তৈরির প্রক্রিয়ায় দক্ষতার বিচার না করে শুধু নীতিকে প্রাধান্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে মাওবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দিতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাও-সে-তুং The Great Proletarian Cultural Revolution (শ্রমজীবী সাংস্কৃতিক মহা বিপ্লব) এর সূচনা করেন। পুরনো কৃষি, সংস্কৃতি, প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য ছাত্র ও সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত 'লাল প্রহরী' (Red Guards) কে কাজ লাগানো হল। গ্রামাঞ্চলের জনগণের মতামত জানার জন্য পাঠানো হল ছাত্র এবং বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পেশাদারি জ্ঞানের চেয়ে কম্যুনিষ্ট মতাদর্শকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করার ফলে দল দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় পঙ্গু হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬০ এর শেষ দিকে আবার স্রোত পরিবর্তিত হতে লাগল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দল আবার বৃহত্তর সামাজিক শৃংখলা এবং শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দিতে শুরু করল যাতে বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই চীন এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

১৯৭৮ থেকে সংস্করণ প্রক্রিয়া

সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অনুসরণ করল রাজনীতির কিছু কৌশলগত প্রক্রিয়া। দেং জিয়াওপিং (Deng Xiaoping) শক্ত হাতে দলের লাগাম ধরে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির সূচনা করেন। অবশেষে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দল অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি এবং প্রতিরক্ষার উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করল। বিতর্কের অনুমতি মিলল, কিন্তু দল যাতে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হল। এধরনের নতুন এবং মুক্ত পরিবেশে কিছু উৎসাহব্যঞ্জক নতুন চিন্তাধারার উদয় হল। 'পঞ্চম আধুনিকীকরণ' (The Fifth Modernisation) ঘোষণা করল যে, গণতন্ত্র ছাড়া আধুনিকীকরণের কোন মূল্য নেই। দারিদ্র্য, যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি সমস্যার উপযুক্ত সমাধান না

করায় চীন কম্যুনিষ্ট দল (CCP) সমালোচনার সম্মুখীন হতে লাগল। এমন কি, দলের অভ্যন্তরেও এরকম নিপীড়ন চলছে বলে উদাহরণ দেখানো হল।

এই নতুন চিন্তাধারা ও দাবিসমূহকে দমিয়ে রাখা হলে ও ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'চতুর্থ মে আন্দোলন' (May Fourth Movement) -এর সপ্ততিতম (সত্তর) বর্ষপূর্তিতে অনেক বুদ্ধিজীবী একত্রিত হয়ে মৃতবৎ নীতির অবসান ঘটিয়ে আরও বেশি উদারনীতির স্বপক্ষে দাবি উত্থাপন করেন। চীনের তিয়ানানমেন স্কোয়ারে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত আঘাতের ঘটনাকে সমগ্র বিশ্ববাসী তীব্র নিন্দা জানায়। সংস্কার-উত্তর কালে আলোচনা শুরু হয় কীভাবে চীনকে আরও উন্নত করা যায়। দেখা গেল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতির উদারিকরণ এবং বিশ্ববাজারে একীভূত হওয়ার পক্ষেই জনমত গড়ে উঠে এবং দলের সমর্থনও লাভ করে। সমালোচকরা মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী, অঞ্চল এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অসাম্যের বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে এক অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নানা বিতর্কের পর কনফ্যুসিয়াসের তথাকথিত 'পরম্পরাগত' আদর্শের উপর ভিত্তি করে মতামত প্রকাশ করা হল যে, চীন পাশ্চাত্যকে অনুকরণ না করে নিজস্ব পরম্পরার উপর নির্ভর করেই একটি আধুনিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম।

১৯৭৮ এ সংস্কারের পর চীনারা স্বাধীনভাবে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করতে সক্ষম হল

তাইওয়ান (Taiwan) এর কাহিনী

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক (Chiang Kai-Shek) চীনের কম্যুনিষ্ট দল (CCP) এর কাছে পরাজিত হয়ে তিনশ মিলিয়ন আমেরিকান স্বর্ণমুদ্রা এবং ঝুড়িভর্তি বহু মূল্যবান চিত্রকলা সামগ্রী সহ তাইওয়ানে পালিয়ে গিয়ে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪-৯৫ এ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের পর তাইওয়ান চীনের হাতছাড়া হয় এবং তারপর থেকে তাইওয়ান হয়ে যায় জাপানের উপনিবেশ। ১৯৪৩ -এর 'কায়রো ঘোষণা' (Cairo Declaration) এবং ১৯৪৯ -এর 'পট্‌সদাম ঘোষণা' চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বৃহৎ প্রতিবাদী সমাবেশে কৌমিনতাং দল (GMD) সেই প্রজন্মের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল। চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে এই দল দমন নীতি ভিত্তিক সরকার গড়ে মানুষের বাকস্বাধীনতা নিষিদ্ধ করে এবং বিরোধীপক্ষ তথা স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এই দল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং অর্থনীতিতেও আধুনিকতার ছাপ পড়ে। ফলে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র এশিয়ায় তাইওয়ান জাপানের ঠিক পরেই স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতির উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে দূরত্ব অনেক অংশে কমতে শুরু হল। মজার ব্যাপার হল নাটকীয় ভাবে তাইওয়ান গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে চিয়াং কাই শেকের মৃত্যুর পর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শাসনের অবসান এবং বিরোধী দলগুলোর অস্তিত্ব আইন গত ভাবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রথম মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনে স্থানীয় তাইওয়ানবাসীদের ক্ষমতায় আসীন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বেশির ভাগ দেশের তাইওয়ানের সঙ্গে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই ছিল; কিন্তু যেহেতু তাইওয়ানকে চীনের একটি অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাই এদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের

দূতাবাস বা পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পুণর্মিলনের প্রশ্নটি বিতর্কিত বিষয় হয়েই রয়ে গেছে; কিন্তু চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে 'ক্রস্ ট্রেইট' (Cross Trait) সম্পর্কের উন্নতির ফলে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং যোগাযোগ বা যাতায়াত সহজতর হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তাইওয়ান স্বাধীনতার জন্য কোন ভাবে প্রয়াসী হবেনা ততদিন পর্যন্ত চীন হয়ত তাইওয়ানকে একটি আংশিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবেই মেনে নিতে চাইবে।

আধুনিকীকরণের দুটো পথ

শিল্প প্রধান বা শিল্প যোজিত সমাজগুলো আধুনিক হওয়ার পথ পরিক্রমায় পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজস্ব রাস্তা বেছে নিয়েছে। চীন এবং জাপানের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় কীভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সর্ত একটা দেশকে স্বাধীন এবং আধুনিক হওয়ার জন্য একাধিক পথের সন্ধান দিতে পারে। প্রচলিত কৌশলকে নতুন ধারায় ব্যবহার করে জাপান তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত আধুনিকতা উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল। এ থেকে জন্ম নিয়েছিল একটি দমননীতি ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা বা গণতন্ত্রের দাবিকে গলা টিপে ধরা হল। ফলে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং অভ্যন্তরীণ উন্নতির বিকৃতি ঘটে।

জাপানে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। পাশ্চাত্য শক্তিকে অনুকরণ করলেও জাপান নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টাও চালিয়েছে। জাপানীদের জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। জাপানীদের মধ্যে অনেকেই এশিয়াকে পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাইছিল; আবার উক্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে অন্যরা সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তোলাকেই যুক্তি সঙ্গত বলে ভাবতে লাগল।

এটা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর এবং দৈনন্দিন জীবন ধারনের প্রক্রিয়া শুধু প্রচলিত প্রথার পুণরাবৃত্তি বা জোর করে রক্ষা করার ব্যাপার নয়; বরং সৃজনী শক্তির সাহায্যে প্রচলিত প্রথাকে নতুন ভাবে রূপ দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মেইজি (Meiji) দের শিক্ষা পদ্ধতি ইউরোপ ও আমেরিকান ধাঁচে প্রস্তুত করা হলেও তাদের পাঠ্যক্রমের আসল উদ্দেশ্য ছিল অনুগত ও বিশ্বাসী নাগরিক তৈরি করা। উপদেশমূলক পাঠ্যসূচির মাধ্যমে রাজভক্তি শেখা ছিল বাধ্যতামূলক। সেরকম, পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তন ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় কীভাবে বিদেশী এবং দেশীয় চিন্তা ধারার সমন্বয় একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

আবার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় চীন অন্য পথ অবলম্বন করেছিল। পাশ্চাত্য ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত Qing রাজত্বের সংমিশ্রণে সরকার দুর্বল ও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। ফলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বেশির ভাগ জনগণের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধপ্রিয় ক্ষমতাবানদের আধিপত্য, লুঠতরাজ, গৃহযুদ্ধ, জাপানীদের বর্বর আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি জনজীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানল।

প্রচলিত প্রথার প্রত্যাখ্যান এবং নতুন পথের সন্ধানের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও শক্তি গড়ে তোলা — এটাই ছিল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আহ্বান। যে প্রচলিত প্রথাগুলো স্ত্রী জাতিকে অবদমিত করে এবং দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে দেশের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল চীনের কম্যুনিষ্ট দল (CCP) এবং এর সমর্থনকারীরা সেই প্রথার বিলুপ্তি সাধনে ব্রতী হল ও জনতার হাতে ক্ষমতা তুলে

দেবার উদ্দেশ্যে একটা উন্নত কেন্দ্রীভূত সরকার গড়ে তুলল। কম্যুনিষ্টদের কর্মসূচির সাফল্য কিছু আশার আলো জাগিয়েছিল; কিন্তু দমন-মূলক রাজনৈতিক পদ্ধতির জন্য স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছিল। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, চীনের কম্যুনিষ্ট দল শতাব্দী-প্রাচীন অসাম্য দূর করে এবং শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হয়ে জনগণের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল।

ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলোর সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে কম্যুনিষ্ট দল বর্তমানে চীনকে অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নিয়ম-নীতি এখনও বেশি শক্ত করে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে। চীন সমাজ তাই এখন ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য ও দীর্ঘকাল অবদমিত পরম্পরার পুনরুত্থারেনও সম্মুখীন হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষা করে চীন কীভাবে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। মেইজি বংশের পুণর্স্থাপনের পূর্বে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো জাপানকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল?

২। উন্নয়নের সাথে সাথে কেমন করে জাপানের নিত্য দিনের জীবন যাত্রা পরিবর্তিত হয় আলোচনা কর।

৩। পাশ্চাত্য দেশগুলোর দিক থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলো কেমন করে Qing বংশ মোকাবিলা করেছিল?

৪। সান ইয়াত সেন-এর তিনটি নীতির উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ ঃ

৫। দ্রুত শিল্পোন্নতি কি প্রতিবেশীদের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ ও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী ছিল?

৬। চীনের মুক্তি ও তার বর্তমান সাফল্যের জন্য কি মাওসেতুং ও কমিউনিস্ট দলের সদর্থক ভূমিকা ছিল?

উপসংহার

এই বইটিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগব্যাপী দীর্ঘ সময়ের পৃথিবীর ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে মানব সভ্যতার বিবরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গেও। প্রত্যেকটি অধ্যায় নিম্নলিখিত ক্রমহাসমান সময় সীমায় আবদ্ধ রাখার প্রয়াসও লক্ষ্যণীয়।

১. ৬ MYA – ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

২. ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ— ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ

৩. ৮০০ খ্রিস্টাব্দ— ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ

৪. ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ— ২০০০ খিস্টাব্দ।

ঐতিহাসিকেরা নিজেদের গবেষণাকর্ম প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের খণ্ডসীমায় আবদ্ধ রাখলেও তাদের কাজকর্মের ধারার মধ্যে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। এখানে আমরা এই খণ্ডসীমার পার্থক্য ভুলে গিয়ে ইতিহাস রচনা ও পর্যালোচনার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশিভাবে মানব ইতিহাসের একটি সুদৃঢ় শিকড় যে (আধুনিক যুগের গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত) রয়েছে, সে সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

এই বইটির মাধ্যমে তোমরা আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া,উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের ইতিহাসের একটি ধারণা তৈরি করতে পারবে। এখানে তোমাদের 'ঘটনা সমীক্ষা' প্রক্রিয়াটির সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে। উপরি উল্লিখিত জায়গাগুলোর বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করবার চাইতে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাস নানা পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা যায়। সম্ভবত এরমধ্যে সবচাইতে পুরনো পদ্ধতিটি হল মানুষে মানুষে যোগাযোগ বা সম্পর্কের প্রতি আলোকপাত করা। এরফলে একদিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ক ও অন্যদিকে পৃথিবীতে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলোও আলোচিত হয়ে থাকে। অন্য পদ্ধতিটি হল একটি বিশেষ

সভ্যতা ও শক্তিকে ধারন করে থাকা তুলনামূলকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিনিময়ের অঞ্চলগুলোকেই চিহ্নিতকরণ; তবে এই অঞ্চলগুলো ক্রমশই বিস্তার লাভ করছিল। তৃতীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পার্থক্য সূচিত করে তাদের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করা হয়। আালোচ্য বইটিতে এই প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই আভাস তোমরা পেয়েছ। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং সমাজের সাথে সমাজের সাদৃস্য ও বৈসাদৃশ পাশাপাশিভাবে বিরাজ করে। মানব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সম্পর্ক সুদূর অতীত থেকেই চলে আসছে। এই বইটিতে বিশ্বজনীন ও আঞ্চলিক, মূলধারা ও প্রত্যন্ত, সাধারণ ও নির্দিষ্টের মধ্যেকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টিকোণ।

আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা জনবসতিকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা মেসোপটিমিয়ার নগরজীবনের সম্বন্ধে আলোচনা এগিয়ে এনেছি। মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন, পার্লিয়া ও ভারতবর্ষের নগরগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রাচীন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই রোমান, আরব এবং মোঙ্গলের (১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে) মত বিস্তৃততর সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। এ সমস্ত সাম্রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সরকার গঠনের প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত জটিল। এসমস্ত ব্যবস্থা ছিল যথেষ্টভাবে লিখিত ভাষার উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগে পশ্চিম ইউরোপ পরিবর্তিত প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক মেলবন্ধনের সূত্র ধরে মানব ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এর সঙ্গে 'রেনেসা' বা 'সভ্যতার নবজাগরণের' একটি যোগাযোগ ছিল। প্রথমাস্থায় উত্তর ইটালির নগরীগুলোকে অনুভূত হওয়া রেনেসার প্রভাব খুব দ্রুত সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রেনেসা ছিল এ অঞ্চলের নগরজীবনের ধারা এবং বাইজান্টিয়াম ও ভূমধ্যসাগরীয় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে বিস্তৃত আদান প্রদানের ফলশ্রুতি। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অভিযাত্রী ও যুদ্ধজয়ীরা নতুন ধ্যান ধারণাও নতুন আবিষ্কারের ফল আমেরিকাতে বহন করে নিয়ে গেলেন। (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তীতে এই ধারণাগুলো জাপান, ভারতবর্ষ ও অন্য কিছু অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিশ্ব বাণিজ্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয়দের আধিপত্য এ সময়ে কায়েম হয়নি। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় ও পরে তা সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেই প্রতি ক্ষেত্রে ইউরোপের আধিপত্য স্থাপিত হয়। (ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী), আফ্রিকা ও এশিয়ার অংশবিশেষে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থা ছিল পূর্ববর্তী সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থার চাইতে অধিক শক্তিশালী ও ঘননিবদ্ধ। যে প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গঠন প্রথম অবস্থায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী করে তুলেছিল, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও কার্যকরী হয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার ভিত্তি গড়ে তুলল।

তোমরা দেখেছ আলোচ্য বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু উদ্বৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অধিকাংশই ইতিহাসের মৌলিক উপাদান থেকে গৃহীত হয়েছে। এগুলো থেকে 'তথ্য' সংগ্রহ করে পণ্ডিতেরা ইতিহাস রচনা করেন। তারা এই তথ্যগুলোকে সন্তর্পণের সঙ্গে বিশ্লেষণ

করে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে প্রত্যখ্যান করেন। একটি নির্দিষ্ট তথ্য সূত্রকে ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে মূল্যায়ন করে বিভিন্ন মতবাদ তুলে ধরতে পারেন। মানব বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার মত ইতিহাসও আমাদের সামনে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়ে নানারকম ধারণা তুলে ধরে। ঐতিহাসিকের চিন্তাধারাও ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে গভীর যোগাযোগ থাকার ফলেই এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে তোমরা হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের সংবিধান নির্মাণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের (বা দক্ষিণ এশিয়ার) ইতিহাসের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে জানতে পারবে। সেখানেও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি ইতিহাস আলোচনা করা হবেও তোমরা ঘটনা সমীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারবে। আমরা আশা রাখি এই প্রশ্ন সহ অন্যান্য বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে এই বই দুটো তোমাদের সাহায্য করবে। তোমরা কি জান যে প্রখ্যাত মধ্যযুগ বিশারদ মার্ক ব্লক (Mark Block) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন পরিখাতে অবস্থান করে তার বিখ্যাত বই 'The Historian's Craft' রচনা করেছিলেন। বইটি তিনি শুরু করেছেন তার বাবার উদ্দেশ্যে করা একটি ছোট ছেলের উক্তি উদ্ধৃত করে 'বাবা, ইতিহাস পাঠের কার্যকারিতা কি আমায় বল।'

Suggested reading: History Books published by NCERT